গল্প-ভারতী

দুখহরণের সুধাক্ষরণের উদাহরণের মালা

ষষ্ঠ গ্রন্থ

১৩৫২

সম্পাদক

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক—
ভারতী-সাহিত্য ভবন
৩৩-এ, নিমতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—দেড় টাকা

মুদ্রাকর—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
কাইন প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৩-এ, নিমতলা ষ্ট্রীট, কলি

এই গ্রন্থে আছে

জওহরলাল	শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সৎকার	শ্রীনরেশচন্দ্র পাল
মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে	„ রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য
অনার্য্য প্রেমিক	„ বাণী রায়
অশুচি	„ শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
যাদুর রোমান্স	„ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
দুরাশা	„ অজিতকুমার রায়চৌধুরী
পঙ্কু ও মুংলী	„ সরোজকুমার রায়চৌধুরী
নিশীথ নগরী	„ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী
বস্ত্রহরণ	গৌতম সেন
কি যেন !	বিশ্বপতি চৌধুরী
আপনি পড়েছেন কি ?	সম্পাদক
নিতান্ত ছোট গল্প	

শ্রীকল্যাণ তৈল

কেউ ভোলেনা
কেউ ভুলতে পারেনা

জেম কেমিক্যা
কলিকাতা

গল্প-ভারতীর সহায়ক-সমিতি

রায়বাহাদুর শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীনরেন্দ্র দেব
„ সরোজকুমার রায় চৌধুরী
„ বনফুল
„ পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়
ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস
„ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
„ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
অবিনাশ ঘোষাল

বাংলা ভাষায় ছোট গল্পের মধ্য দিয়া সাহিত্যিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গল্প-ভারতী গ্রন্থমালা প্রকাশিত হইতেছে। * * *

বিভিন্ন ধরণের ছোট গল্পের সম্ভার লইয়া এক একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করিবার আয়োজন করা হইয়াছে। * * *

বাংলা দেশের এবং দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের সুনির্ব্বাচিত নূতন গল্প-রচনা দ্বারা গল্প-ভারতী সমৃদ্ধ হইবে। * * *

শিল্প হিসাবে সাহিত্য-জগতে ছোটগল্পের যে-মর্য্যাদা আজ বাংলা-দেশে বিপন্ন হইতে চলিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া এবং কথা-শিল্পীদের উৎসাহ ও প্রেরণার জন্য গল্প-ভারতীতে প্রকাশিত প্রত্যেক রচনার যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া হইবে। * * *

এই ধরণের সাহিত্যিক আয়োজন আমাদের দেশে এই প্রথম।

বাংলা সাহিত্যের সহিত আপনার প্রীতির সম্পর্ক স্মরণ করিয়া, গল্প-ভারতী আপনার সহায় ও সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করে। * * *

অপরূপ রূপলাবণ্যের অধিকারিণী লী
দেশাই মুখাবয়ব নিখুঁত রাখবার
"ওটীনের" বিশেষত্বের প্রশংসা করেছে
তাঁর মতো আজ সকলেই স্বীকার করেন
এদিক দিয়ে "ওটীনের" জোড়া নেই

I always use Oatine Cream before retiring. It is pleasant and soothing and cleanses my skin from anything left by dust or make up. I recommend it to all my friends.

L. A. Desai

Oatine

SNOW for DAY CREAM for NIGHT

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ।

২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

বিলিকৃত মূলধন.....৪ কোটী টাকা

আদায়ীকৃত মূলধন...২ কোটী টাকা

মজুত তহবিল...৫...৭৷৷০ লক্ষ টাকা

ডিরেক্টরবর্গ

মিঃ জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

মিঃ এম, এ, স্পাহানী (ভাইস-চেয়ারম্যান)

মিঃ রণলালজী সরাইয়া (ভাইস-চেয়ারম্যান)

মিঃ অনন্তচরণ লাহা

মিঃ মহাদেওলাল দহমুকার

মিঃ নবীনচন্দ্র মকতলাল

মিঃ মদনমোহন আর রুইয়া

মিঃ মতিলাল তাপুরিয়া

মিঃ বৈজনাথ জালান

মিঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা

স্যার আদমজী হাজি দাউদ

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয় এবং বহির্বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল প্রকার আর্থিক সুবিধা ও ব্যবস্থা তৎপরতার সহিত করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার

মিঃ বি, টি, ঠাকুর

শাখা ও পে অফিস—ভারতের সর্ব্বত্র ও বিদেশে

UC3 4

কলিকাতা মেন আফিস :— মিঃ এইচ, খীওয়ালা, ম্যানেজার।

বড়বাজার : ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট : ভবানীপুর :

জ, পি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজার। এ, পাল, ম্যানেজার। এম, এম, ব্যানার্জ্জি, ম্যানেজার

ফোন :—ক্যাল ১৪৬৪ ও ১৪৬৫ গ্রাম :—"এরিওপ্যাগাস"

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স

সিণ্ডিকেট লিমিটেড

ষ্টক ও শেয়ার ব্যবসায়ে ভারতের বৃহত্তম যৌথ প্রতিষ্ঠান

শাখাসমূহ—

বম্বে, লাহোর, মোরাদাবাদ, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, রাঁচি, ভাগলপুর, মুঙ্গের,

শাখাসমূহ—

কটক, বাঁকুড়া, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, ঠাকুরগাঁও, জলপাইগুড়ি, বরিশাল, মৈমনসিংহ, ঢাকা।

—"শেয়ার ডিলার্স হাউস"—

কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ী

চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূলধন

অনুমোদিত— ২৫,০০,০০০৲ লক্ষ টাকা

বিক্রীত— ১৮,০০,০০০৲

আদায়ীকৃত— ৬০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে

*আমরা সর্ব্বপ্রকার শেয়ারের কাজ করিয়া থাকি।

*টাকা খাটাইবার নিরাপদ ও সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়া থাকি।

*"ছাক্সী আমানত" গ্রহণ করিয়া থাকি।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের "সাপ্তাহিক শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট" নিয়মিত পাঠ করুন, নমুনা সংখ্যা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

—বঙ্গলক্ষ্মীর—

সুগন্ধি আমলা তৈল

আপনার স্নানের আনন্দ

বর্দ্ধনং করুক।

বঙ্গলক্ষ্মী আয়ুর্ব্বেদ

ওয়ার্কস

১২নং, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

ফিলিপস
পাখা
কিনুন!
EWI
LTD.
শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন

ক্রমোন্নতির পথে-

নূতন কাজের পরিমাণ

১৯৪৫ সালে
৩, ২০, ৭৭, ৬৭৫

১৯৪৪ সালে
২, ১৩, ৫২, ৮২৫

১৯৪৩ সালে
১, ৩২, ২৫, ৭৭৫

দি মেট্রোপলিটান

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—কলিকাতা

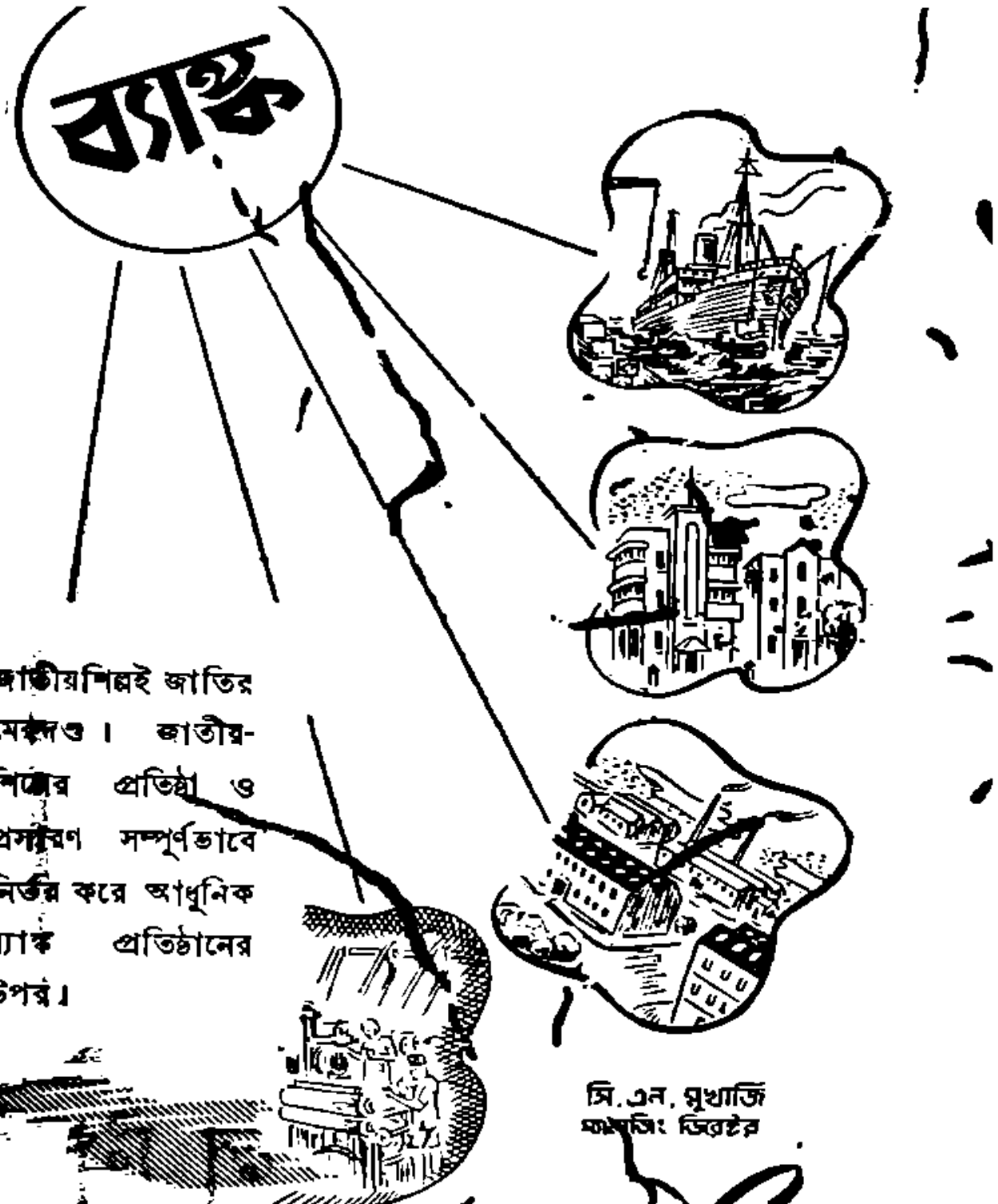
ব্যাঙ্ক
জাতীয়শিল্পই জাতির মেরুদণ্ড। জাতীয়-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের উপর।
সি.এন. মুখার্জি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস - ৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা,
শাখাসমূহ - বড়বাজার, উত্তরপাড়া, বর্দ্ধমান

ভারতীয়
সিল্ক
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ স্ট্রীট : কলিকাতা

সঙ্গীত-জগতে বিপ্লবাত্মক প্রতিষ্ঠান

"গীত-অমৃত-তরে চিত্ত পিপাসিত রে"

এ কথাটা তাঁর বিশ্বকবি যে নিজের অন্তরের গীত-তৃষ্ণার কথা রূপ দিয়েছিলেন, তা নয়, বিশ্বের প্রত্যেক নর-নারীর অন্তর থেকে উঠেছে ঐ অসীম আকুলতা···

নদীর কলোচ্ছ্বাসে সুর, পাতার মর্মরে সুর, মানুষের চলা-ফেরা হাসি-কান্নায় সুর···আকাশে গ্রহ নক্ষত্র যে ঘুরছে, তাও অদৃশ্য সুরে বাঁধা

সেই অ-ধরা সুরকে ধরেছে মানুষের তৈরী যন্ত্র—তার মধ্যে ডোয়ার্কিনের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র আজ যে জগৎ জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে, তার মূল কথা হচ্ছে এ প্রত্যেকটী যন্ত্র সেই সুরকে দিয়েছে নিখুঁত রূপ—

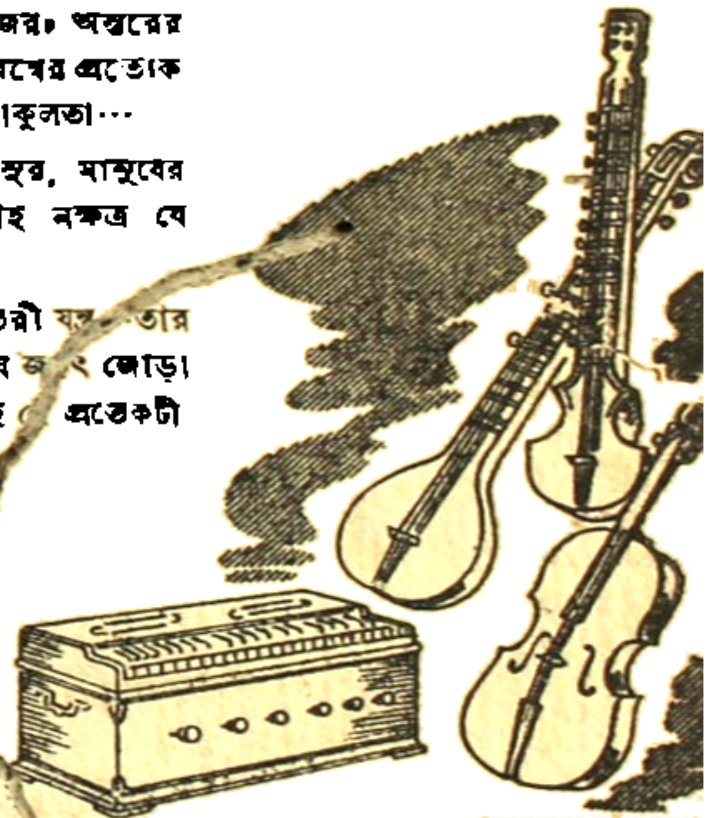

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স লিঃ

১২, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা

সোডাওয়াটার মেসিন

পার্ক ও হোটেলের উপযোগী হাতে চালানো ছোট মসিন এবং কারবার চালাইবার মত বড় মসিন—ক্রাউন কর্ক মেসিন ও আনুসংগিক যাবতীয় উপকরণ অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সোডাওয়াটার মসিন চালাইবার পদ্ধতি জানিবার জন্য পত্র লিখিলে আমাদের সুদক্ষ মেসিনম্যান যাইয়া উপদেশ দেন। বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

একসিলিণ্ডার এক্‌বোত
ব্যাচেলার মেসিন—২২৫৲
কর্কিং মেসিন ১টি—৮০৲
এসেন্স, কর্ক, বোতল
ও অন্যান্য সরঞ্জাম—৫০

মোট—৩৫৫

দি এসেন্স এণ্ড বটল সাপ্লাই এজেন্সী

১৪ ন[illegible] ক লি ক া তা

HIMKALYAN

Unrivalled Hair Oil

ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ
শাস্ত্রীর অনবদ্য অবদান

"হিমকল্যাণ"

কেশতৈল

গুণে ও গন্ধে প্রসাধন শিল্পে
অপরাজেয়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস—কলিকাতা

অনুপম উপহারে

আনন্দের দিনে প্রিয়জনকে কিছু উপহার দিতে না পারলে মন যেন কিছুতেই আনন্দ পায় না, তাই আপনার ও আপনার প্রিয়জনের মনোমত উপহারের বেসাতি যোগাবে

ইন্দ্র মেটাল ওয়ার্কস

নানা রকম ডিজাইনের নানা আকার ও আকৃতির ফটোফ্রেম, সিগারেট কেস, পাউডার কেস, এস-ট্রে, টি-সেট, টাইলাস, পিপার ও সল্ট সেকাক, বিয়ার ট্যাংকার্ড প্রভৃতির অপূর্ব্ব সমাবেশ; প্রত্যেকটি ঝক্‌ঝকে তকতকে সুদৃশ্য অথচ সস্তা। আমাদের প্রত্যেক জিনিষে ডিজাইনের নূতনত্ব, শিল্প-চাতুর্য্য ও সুরুচির ছাপ পরিস্ফুট দেখতে পাবেন।

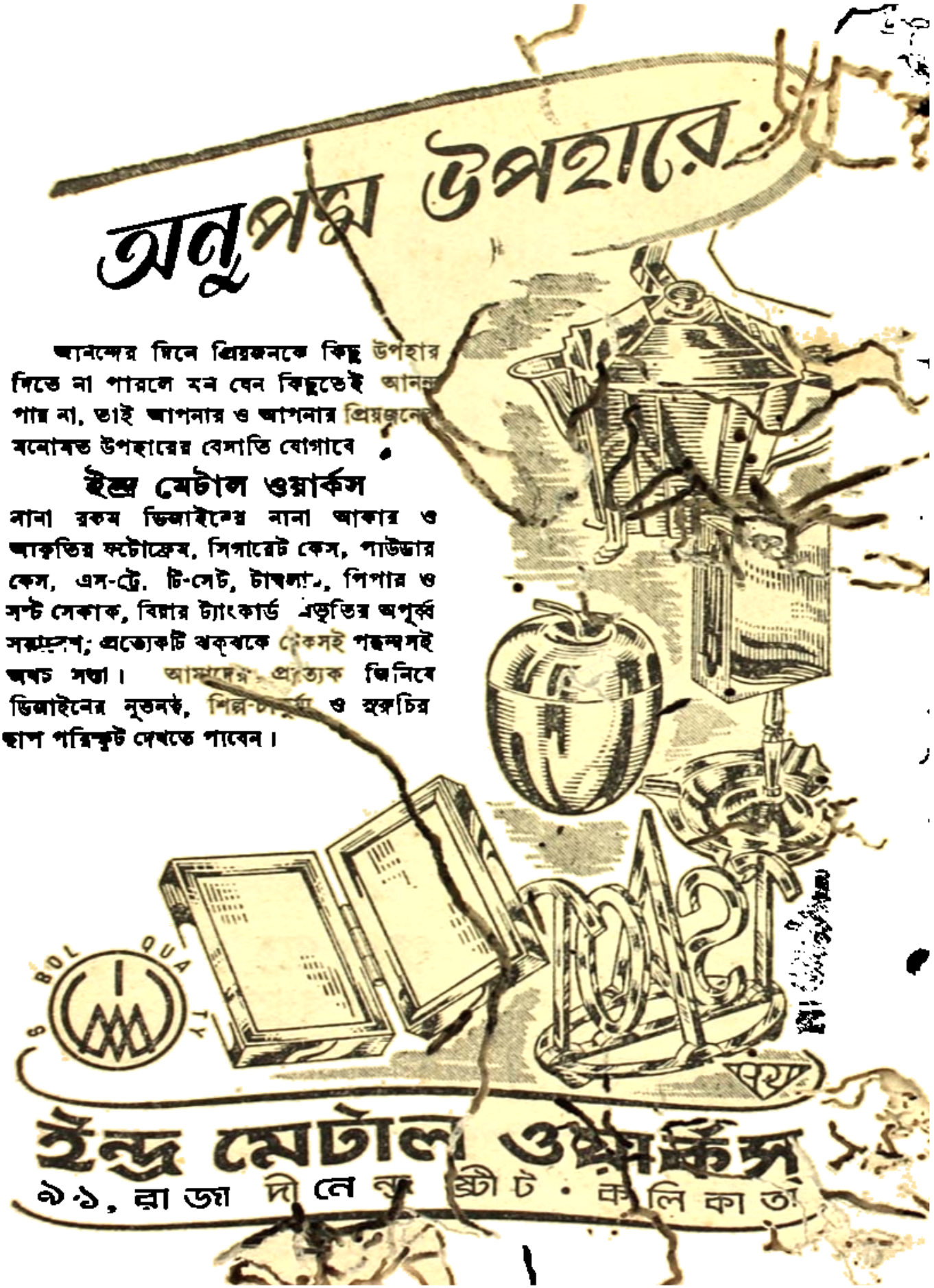

ইন্দ্র মেটাল ওয়ার্কস

৯১, ল্যান্সডাউন রোড • কলিকাতা

ঘরে ও বাহিরে

যেখানেই থাকুন: না কেন; অলঙ্কারই আপনার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবে। আধুনিক রুচি সম্মত অভিনব প্রণালীতে প্রস্তুত, সকল প্রকার ডিজাইনের গহনার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

জুয়েলার্স ও ওয়াচ মেকার্স

কুণ্ডু জুয়েলারী ওয়ার্কস

জে, এল, কুণ্ডু

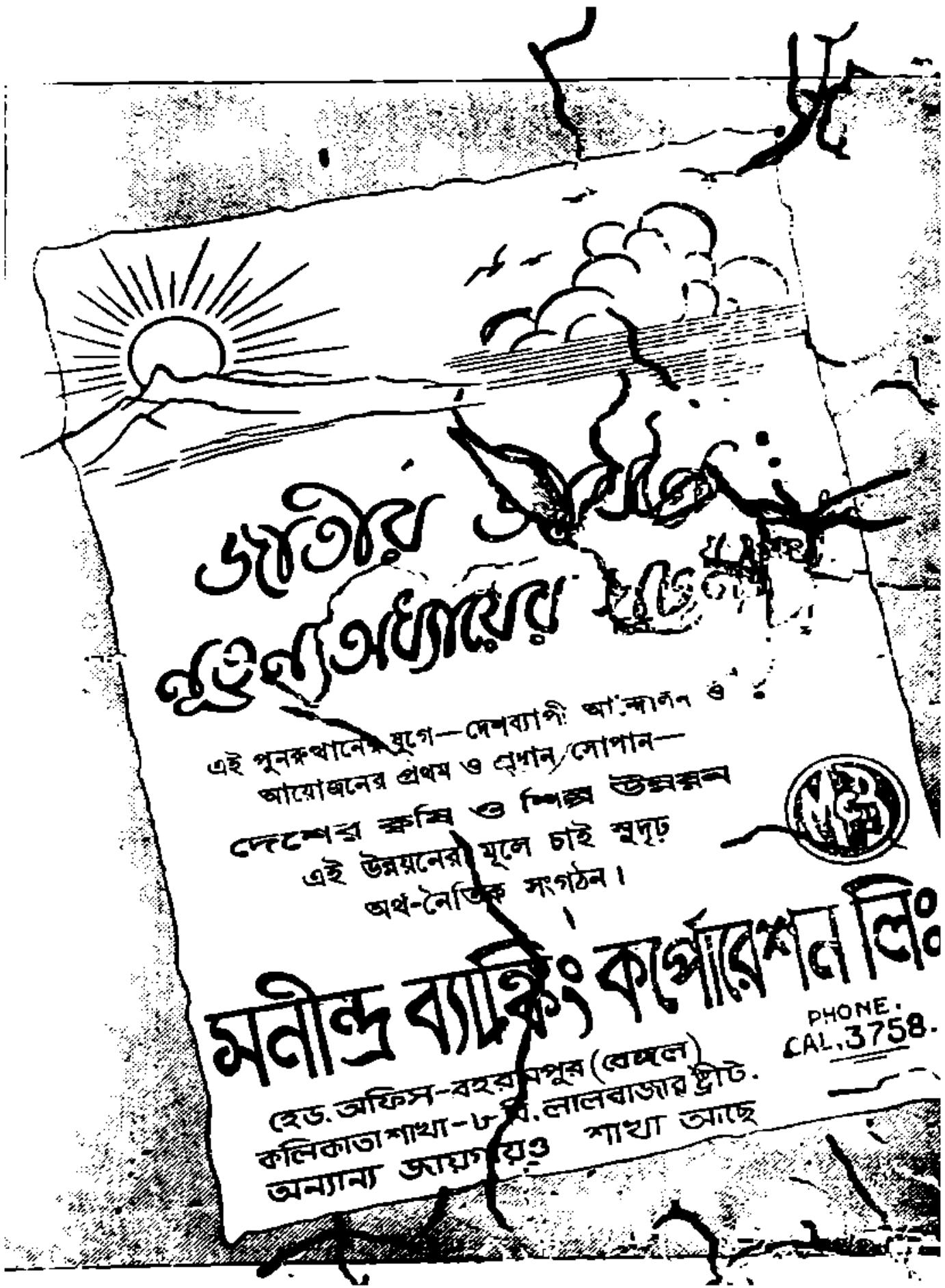
জাতীয়
নূতন অধ্যায়ের সূচনা
এই পুনরুত্থানের যুগে—দেশব্যাপী আন্দোলন ও
আয়োজনের প্রথম ও প্রধান সোপান—
দেশের কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন
এই উন্নয়নের মূলে চাই সুদৃঢ়
অর্থ-নৈতিক সংগঠন।
মণীন্দ্র ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
PHONE:
CAL.3758.
হেড অফিস-বহরমপুর (বেঙ্গল)
কলিকাতা শাখা-৮ বি, লালবাজার ষ্ট্রীট.
অন্যান্য জায়গায়ও শাখা আছে

একটি শিক্ষিত পরিবার

কারণ কুসুম!

হোসিয়ারীর জিনিষ শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য সমভাবে বজায় রেখে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সুন্দর আরামদায়ক ও টেকসই।

কতকগুলি প্রসিদ্ধ ব্রাণ্ড

স্পিটফায়ার, হারিকেন,
ল ভ লাক্সটেক্স,
ইউনিক,
এক্সরটেক্স

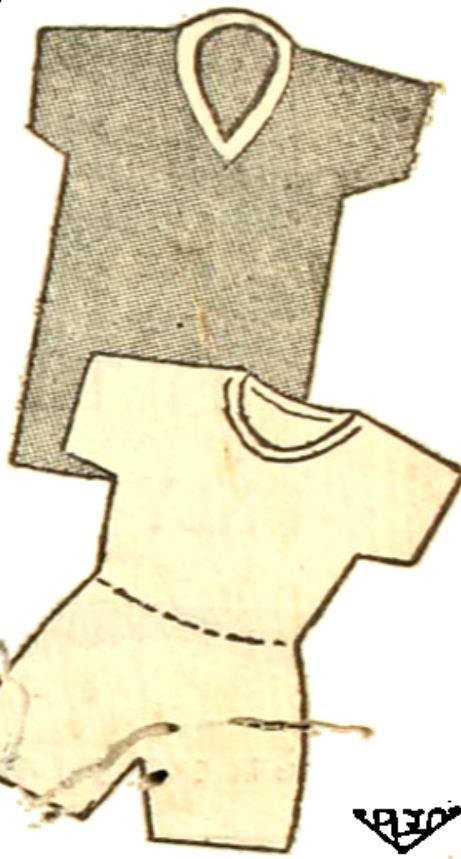

RAM — LUXTEX.
IONE — B.B. 1146

কুসুম হোসিয়ারী মিলস্

৮১, তলপুকুর রোড, বেলিয়াঘাটা :: কলিকাতা।

ডিস্ট্রিবিউটর্স :—

মসিনারিজ এণ্ড ইলেকট্রিক্যালস্ লিঃ

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Phone : Cal. 1092

: EYELETS

. AFTER THAT I'M CONVINCED .

Tussanol

IS THE
ONLY WAY

এটা ওটা ঔষধ খেয়ে বৃথা সময় ও অর্থ নষ্ট করেছেন কেন? **টাসানল** খেয়ে যাঁরা সর্দ্দি কাশির হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়েছেন, তাঁদের উপদেশ গ্রহণ করুন। টাসানল সর্দ্দি কাশির অব্যর্থ ঔষধ,—সুপরীক্ষিত ও সুপরিচিত।

TUSSANOL

for COUGHS

MARTIN & HARRIS LTD., CALCUTTA

দি সিলেট ইনডাসট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—সিলেট

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত

কলিকাতা ব্রাঞ্চ অফিস সমূহ—

মেন অফিস—
৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
ফোন—কলি : ৫৬৭

বড়বাজার ব্রাঞ্চ—
৯নং পগেয়াপটী ষ্ট্রীট,
ফোন—বি, বি, ১৭২৫

—কলেজ ষ্ট্রীট ব্রাঞ্চ—
১২২, হ্যারিসন রোড (হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের জংসন)

আসাম ও বাংলার প্রধান প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রে শাখা আছে

অনুমোদিত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড—

কার্য্যকরী ফণ্ড — প্রায় ছয়লক্ষ টাকা

প্রায় ১৫০০০০০ টাকা

ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী

সিলেট — শিলচর

শিলং — ঢাকা

কলিকাতা ১৯নং মিশন রো এক্সটেনসনে জমি কেনা হইয়াছে

পি, কে, চক্রবর্ত্তী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

জে, এম, দাস
জেনারেল ম্যানেজার

যোগাযোগ

হিম-কল্যাণ

জগতে প্রত্যেক শুভ কার্য্য ও পরিণামে প্রসিদ্ধি লাভ করে সকলই একটা শুভ যোগাযোগেরই পরিণতি, 'হিমকল্যাণ' কেশ তৈল যে এত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে তাহাও একটা শুভ যোগাযোগেরই অবশ্যম্ভাবী ফল. সুজ্ঞ প্রতিভাশালী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রালোচনা ক'রে এক শুভ মুহূর্ত্তে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে করেছিলেন 'হিমকল্যাণ'-এর আবিষ্কার ও নামকরণ; 'হিম' ও 'কল্যাণ' শব্দ দুটীর হয়েছে রাজযোটক, এদের মিলন দেবতারই আশীর্ব্বাদ. এই শব্দ দুটীকে নিয়ে নানা কেশ তৈলের নামের অঙ্গীভূত ক'রে আজকাল বাজারে 'হিমকল্যাণ' এই নামের অনুরূপ নকল হইতেছে, অতএব আদি ও অকৃত্রিম কেশ তৈল 'হিমকল্যাণ' নামই দেখিয়া লইবেন

UPCO

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস কলিকাতা

জওহরলাল

ভারত-পথের পথিক

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

[গীত-সংখ্যার পর]

(২)

একটা ছোট্ট মোটরগাড়ী···জওহরলাল ঠিক করলেন, সেই মোটর নিয়ে তিনি যুক্ত-প্রদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে দেখবেন, কিষাণদের সত্যিই কি অবস্থা !

কিছুদূর অগ্রসর হয়েই বুঝলেন, এ-তীর্থের তো এ-যান নয় !

গেঁয়ো পথ·· চলতে চলতে চলা-পায়ে তৈরী হয়েছে সে-পথ···কেউ কোনদিন ভাবে নি সেই পথ দিয়ে কোন দিন শহর থেকে আসবে মোটর-গাড়ী !

রাতারাতি গাঁয়ের লোকেরা নতুন করে তৈরী করে পথ··কি তাদের উৎসাহ !

কিন্তু কত তারা তৈরী করবে পথ ?

জওহরলাল মোটর থেকে নামলেন পথে···

বাঁশবনের পাশ দিয়ে, পাঠকুয়োর ধার দিয়ে, মাঠের আল বেয়ে চলেন গাঁ থেকে গাঁয়ে···

মাথার ওপর গ্রীষ্মদিনের দুপুরের সূর্য্য··কাশ্মিরী শুভ্র রঙ রোদে পুড়ে হয়ে আসে তামাটে···

জওহরলালের ভাল লাগে···নিজের গায়ের সেই নতুন তামাটে রঙের দিকে চেয়ে বোঝেন, যে-পথে চলতে হবে, সে-পথে মাথার ওপর ঘুরবে না ইলেক্‌ট্রিক পাখা·· ঘুরবে এই শতদিনের তপ্ত আগুনের চাকা।

দূর থেকে মনে হয়েছিল···বুঝি বা তা হবে অসহ্য···লক্ষপতির ছেলের কোমল গা হয়ত তা পারবেনা সইতে···কিন্তু পথে নেমে দেখলেন সে-ভার বইতে দেহ তাঁর নয় অপটু···কিন্তু বিপদ হলো সঙ্গের সহ-যাত্রীর···

সহযাত্রিটি অবশ্য তাঁর নিজের নির্ব্বাচিত নন্···জেলার ডেপুটি কলেক্‌টর সঙ্গে তাঁর ডিটেকটিভের দল···তরুণ জওহরলালকে···বাধ্য হয়ে তাঁকে চলতে হচ্ছে জওহরলালকে অনুসরণ করে.....পায়ে পেটেণ্ট লেদারের পাম্-সু! সূর্য্যের নিষ্করুণ তেজে গলে গিয়েছে মুখের ক্রীম্·· গেরুয়া-পথে হাঁটতে দুমড়ে দুমড়ে যায় হাঁটু!

বিরক্ত হয়ে ভাবেন, হ্যারো-ক্যামব্রিজ-প্রত্যাগত বিলেত-ফিরৎ তরুণ যুবক···এ কি তার দুর্ম্মতি···আর কত দূরেই বা যাবে?

শিকারীর অবস্থা দেখে হাসে শিকার···

শেষকালে শিকারী হতাশ হয়ে যায় ফিরে।

গা থেকে গাঁয়ে নবীন উৎসাহে চলেন জওহরলাল।

মেঠো পথ···মেঠো লোক···মেঠো কথা...

দিনের শেষে খড় পেতে বিছানা করেন··নরম মোটা গরম রুটী কিষাণেরা দেয় এনে···খসে পড়ে যায় শহরের শিক্ষিত সভ্যতার বোঝা·· এত দিন পরে জওহরলাল যেন খুঁজে-পান নিজেকে··যেন খুঁজে পান ভারতবর্ষকে···

সহজ ভাবে তারা কাছে আসে··সহজ ভাবে কথা বলে···তাদের কথার উত্তর দিতে দিতে জওহরলাল···কখন কেটে গিয়েছে

তাঁর ভীরুতা···মনে পড়ে, সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে সেই কণ্ঠরোধ হয়ে আসা···

প্রতাপগড়ের সেই কিষাণরা দেখতে দেখতে কেড়ে নিল তাঁর ভীরুতা···একাকে কথা বলবার ভীরুতা ..প্রতিদিন তাদের সঙ্গে ঘোরা ফেরা ওঠা বসা করতে করতে তিনি দেখতে পেলেন, জনতার অন্তরে পৌঁছনোর সহজ সরল পথ। বক্তৃতা নয়, তারা চায় কেউ শুনুক তাদের বুকের মধ্যে জমানো সব কথা, কেউ বলুক তাদের সঙ্গে দুটো কথা, তাদের অন্তরের কথা···

জওহরলাল সুরু করলেন, তাদের সঙ্গে কথা বলতে...তাঁর মনে যে কথা আরো সহজ, সরল ভাবে তিনি তা বলেন জনতাকে··· জনতা যেন বহু জন নয়, জনতা যেন একজনেরই বহুরূপ···

অবাক হয়ে দেখেন, ভয়ে, সঙ্কোচে যে-জনতা থেকে তিনি ছিলেন দূরে, সেই জনতাই আজ তাঁর কাছে এগিয়ে···

আভিজাত্যের একটিকিত্বের বেড়া ভেঙ্গে হাত ধরে টানে জনতার জগন্নাথ···

(২)

জনতা···

বিংশ-শতাব্দীর রাজনীতি দিয়েছে তাকে দেবতার সম্মান···স্বর্গ-হীন দেবতার আবেদন তার শুষ্ক মুখে, জীর্ণ পরিচ্ছদে···

কিন্তু সে-আবেদন পৌঁছয় না জওহরলালের অন্তরে···যদিও মস্তিষ্কে তা দিয়ে যায় দোলা···

তাই জনতার মধ্যে গিয়েও, কি যেন ভেতর থেকে তাঁকে টেনে নিতে চায় জনতার ঊর্ধ্বে...

যুক্ত-প্রদেশের গ্রামে গ্রামে তখন চলেছে, কিষাণ আর তালুকদারদের মধ্যে বিরোধ···

সে-বিরোধ কোথাও কোথাও আবার ছড়িয়ে পড়েছে তালুকদারদের মধ্যে।

ফৈজাবাদের এক তালুকে গিয়ে শুনলেন, দলে দলে কিষাণরা চলেছে পাশের তালুকে ঘর-বাড়ী সব জ্বালিয়ে দেবার জন্যে।

ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে, লুঠ করে, তারা বিজয়ীর মত ফিরে এলো, মুখে তাদের জয়োল্লাস, মহাত্মা গান্ধী কি জয়!

ব্যাপার অনুসন্ধান করে জানলেন যে, তাদের গ্রামের তালুকদার তাদের বলেছে যে, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী তাদের লুঠ করতে বলেছে, তাই মহাত্মার কথানুযায়ী তারা পাশের গ্রামের তালুকদারকে রীতিমত জব্দ করে এসেছে।

জনতা!

রাগে, ক্ষোভে, জওহরলাল তৎক্ষণাৎ আশে-পাশের গ্রামে সংবাদ ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, কাল সভা হবে, সভায় যেন গাঁয়ের লোক সবাই আসে।

পরের দিন দশ মাইল জুড়ে সব গাঁ থেকে প্রায় ৫।৬ হাজার লোক সভায় এসে জড় হলো। গান্ধীজির নব-সৃষ্ট সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের নৈতিক মাধুর্যে মুগ্ধ জওহরলাল, নবীন নেতার উৎসাহে, সেই জনতাকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেন···বুঝিয়ে দেন যে-লোকের নাম উচ্চারণ করে তারা আনন্দে ও গর্ব্বে লুঠ করে এলো, সে-লোককে এবং যে-আন্দোলন সে-লোক নিয়ে এসেছে তাকে কি ভাবে তারা লাঞ্ছিত করেছে...

নীরবে তারা শোনে···

হঠাৎ উচ্ছাসের আধিক্যে জওহরলাল বলে ওঠেন, তোমাদের মধ্যে যে কে কে অপরাধ করেছ, এই সভায় সকলের সামনে, তারা হাত তোলো—নিজেদের অপরাধ স্বীকার করো!

সভার মধ্যস্থলে পুলিশের লোক সব বসে। তারা এসেছে অপরাধীর সন্ধানে।

শিশুর মত সরল বিশ্বাসে, তারা হাত তোলে...

পুলিশের কথা ভুলে যায়।

জনতা...

স্বর্গহারা দেবতার আবেদন তার শুষ্কমুখে, জীর্ণ পরিচ্ছদে...

মস্তিষ্ক-ভীরু তরুণের রুদ্ধদ্বার-অন্তরে পড়ে করাঘাত।

(৩)

কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন।

অবিস্মরণীয় দিন। কংগ্রেসের নব-জন্মলাভ।

নিখুঁত সাজসজ্জা পোষাকে সামনের আসনে আর নেই রাজনীতি-বিলাসীর দল। তার পরিবর্ত্তে শুভ্র খদ্দর-পরিহিত রাজনৈতিক কর্ম্মীর দল।

ভাষা আজ ইংরেজী নয়...দেশজ...

প্রস্তাব আজ নয়, নিবেদন। প্রস্তাব আজ, কঠোর কর্ম্মের, ত্যাগের, সুনিশ্চিত বেদনার।

মন্ত্র আজ, অসহযোগ। ভয়কে জয় করবার সমর আয়োজন।

অস্ত্র...দিব্যাস্ত্র...রুধির-কলঙ্ক-হীন সুনিয়ন্ত্রিত আত্ম-বর্জ্জন।

যাত্রা আজ কণ্টক-পথে···কারাগারে···

নতুন যাত্রীর ভিড়···মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণ যুবকের দল...

নেতা আজ এক অর্দ্ধনগ্ন ফকীর।

অধিবেশন-অন্তে জওহরলাল মহাত্মাজীর সঙ্গে চল্লেন, বিদায়-পথ-যাত্রী এক মহাপুরুষের দর্শনে।

মতিলাল ঘোষ তখন শেষ-শয্যায়।

শয্যার পাশে গিয়ে বসলেন দুজনে।

অস্তাচল-পথযাত্রী বৃদ্ধ সাংবাদিক মস্তক স্পর্শ করে মহাত্মাজীকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

বল্লেন, আমার আজ একমাত্র আনন্দ, আমি চলেছি এমন এক দেশে, যেখানে নেই বৃটীশ-সাম্রাজ্য।

(৪)

এক অপূর্ব্ব উন্মাদনায় দুলে উঠলো সারা দেশ।

সে-উন্মাদনায় অন্য সব তরুণের মতনই জওহরলাল নিজেকে দিলেন ডুবিয়ে।

তখন তিনি শুধু অসহযোগ আন্দোলনের একজন কর্ম্মী। চলেছে নেতৃত্বের শিক্ষানবিশী।

সেই সময় (১৯২১—মে) হঠাৎ এলো তাঁদের বাড়ীতে উৎসব। তাঁর ভগ্নী স্বরূপরাণীর বিবাহ।

মতিলাল কন্যার বিবাহে গান্ধীজি, মোহম্মদ আলী প্রভৃতি কংগ্রেস-নেতাদের করলেন নিমন্ত্রণ এলাহাবাদে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর প্রত্যেক সভ্যই নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন। সেই সুযোগে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর এক বিশেষ অধিবেশনও সেই সময় নির্দ্দিষ্ট হলো।

এতগুলি নেতা একসঙ্গে এসে পড়ার দরুণ, স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মীরা ঠিক করলেন যে, এই সুযোগে একটা প্রাদেশিক সম্মেলন অনায়াসেই করা যায়। সুতরাং তারও আয়োজন চলতে লাগলো।

এলাহাবাদে পড়ে গেল একটা তুমুল সাড়া।

কিন্তু এক শ্রেণীর লোকের ওপর এই সব ঘটনা এক বিচিত্র প্রভাব বিস্তার করলো। যুক্তপ্রদেশের অধিকাংশ ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারী কোন নিগূঢ় সূত্র থেকে সঠিক সংবাদ পেয়ে গেলেন যে, স্বরূপরাণীর

বিবাহের ব্যাপারটা হলো একটা বিরাট বিপ্লবিক-উত্থানের আয়োজনকে ঢেকে রাখবার একটা সামাজিক ছদ্মবেশ…

যে কোন মুহূর্তে শহরের মধ্যে বিপ্লব রুধিরাক্ত মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করবে…অনেকে সতর্কতা স্বরূপ ভারতীয় ভৃত্যদের হঠাৎ বিনা কৈফিয়তে বাড়ীর কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেন…প্রত্যেক রাজ-কর্ম্মচারী গোপনে পকেটে রিভলভার নিয়ে বাইরে চলা-ফেরা করতে লাগলেন…এমন কি, এরপরও গোপনে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, বিপ্লবের সময় বিপন্ন ইংরাজ নরনারীদের আশ্রয়ের জন্যে এলাহাবাদ দুর্গে সমস্ত বন্দোবস্ত করা হয়েছে…

জওহরলাল যখন এক ইংরাজ ব্যারিষ্টার বন্ধুর মুখে এই রোমাঞ্চকর বিপ্লবের সংবাদ পেলেন, তখন বিস্মিত হয়ে এই অদ্ভুত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনার হেতু অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পেলেন, যেদিন তাঁর ভগ্নীর বিবাহের দিন স্থির করা হয়েছে, সেই দিনই নাকি আঠারো শো সাতান্ন সালে উত্তর-ভারতে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল।

তারপর কতবার সেদিন এসেছে, গিয়েছে…

(৫)

উনিশ শো একুশ…

মেঘ-কেটে ভারতের আকাশে উঠেছে নতুন সূর্য্য…তার আলোয় ঝলমল করে উঠেছে সারা দেশ…

মাটী ফুঁড়ে যেন উঠেছে রব, ফিরে চল…ফিরে চল, পল্লী-পথে, পল্লী-গ্রামে…পেছনে ফেলে এসেছ যাদের, এগিয়ে গিয়ে নিয়ে এসো তাদের…এতদিনের অবহেলা, এতদিনের অবজ্ঞা, একদিনে যেন তার করতে হবে প্রায়শ্চিত্ত…চলে অভিযান…

সে-অভিযানের নেতা আজ তরুণ ভারত···ললাটে তার জাতির আশা, অনুলিপ্ত যেন রক্ত-চন্দনের মত···স্বতন্ত্রী বীণার মত নব-অনুরাগে কাঁপছে তার দেহ···স্বেচ্ছায় সে আজ তুলে নিল নিজের মাথায় কণ্টক-মুকুট···আজ ভারতে যৌবনের রাজ-অভিষেক···

যে-পেরেছে সেদিন জাগ্রত যৌবনের সেই মর্য্যাদা দিতে, জাতি বিলম্ব করেনি, তাকে চিনে নিতে, তার আপনার জন বলে···মহাকাল নিজে পরিয়ে দিয়েছে তার মাথায় বিজয়-মুকুট···ইতিহাস নিজে খুলে দিয়েছে তার বন্ধ লৌহ-অর্গল-দ্বার...

তাই সেদিনকার তরুণেরা মস্তিষ্ক দিয়ে নয়, অন্তর দিয়ে চিনেছিল, তার সুভাষকে, তার জওহরকে।

উনিশ শো একুশের ভারতের আকাশে অশ্বিনীকুমারের মত দুই যৌবন-দেবতা। ভারতের জাগ্রত যৌবনের দুই মূর্ত্ত বিগ্রহ।

এক মহানদীর দুই শাখা।

(৬)

ভেসে গেল আর সব। সঙ্গী, সঙ্গ-সুখ, অবসর, বন্ধু, বান্ধব, জীবনের অন্য আর যা কিছু ছিল আকর্ষণ···

এমন কি বই পড়া, খবরের কাগজ পড়া···আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখাশোনা, কথা বলা, খবর নেওয়া···

বিরামহীন চক্রের মত জওহরলাল চলেছেন এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে, এক সভা থেকে আর এক সভায়, এক বৈঠক থেকে আর এক বৈঠকে···যেন পৌঁছতে হবে প্রত্যেক গ্রামে·····প্রত্যেক মানুষটির কাছে···

কোথায় দিন শেষ হয়, কোথায় রাত্রি আসে, তার নেই ঠিক-ঠিকানা।

ভারতের জনচিত্তের মর্ম্মস্থলে পৌছবার সে এক বিচিত্র উন্মাদ অভিসার।

"বাড়ীর প্রত্যেকটী মানুষের সঙ্গে ছিল আমার অন্তরের নিবিড় যোগ···কিন্তু তখন ভুলে গেলাম তাদের সবাইকে··ভুলে গেলাম আমার স্ত্রীকে···আমার কন্যাকে···রাত্রিতে অফিসে শুই, কখনও বা রাত আসে দূর গ্রামে···আজ বহুদূর থেকে সে-সব দিনের কথা যখন স্মরণে আসে, তখন ভাবি কি যন্ত্রণা, কি দুর্ভাবনাই না নীরবে আমার স্ত্রী সহ্য করেছিলেন, এবং কি মহিমময় ধৈর্য্যে তিনি সেদিন গ্রহণ করেছিলেন আমাকে।" *

(৭)

কিন্তু যৌবন চায় আকর্ষণ···এক আধার ছেড়ে যখন সে ছোটে, তখন নিশ্চয়ই তার সামনে থাকে আর এক আধার···

আধারহীন নিরাবলম্ব সে পাবে না বাঁচিয়ে রাখতে তার প্রাণের আগুনকে।

জওহরলালকে আকর্ষণ করলো, অন্তরের স্বধর্ম্ম যাকে একদিন করেছে অবজ্ঞা···এমন কি ঘৃণা, আকর্ষণ করলো সেই জনতা···সেই বহুমুখী অনন্ত-শির বিংশ-শতাব্দীর স্বর্গলোভী দৈত্য···

যেখানে যান, সেখানেই ঘিরে ধরে জনতা···একটু একটু করে অনুভব করেন, কি করে তাঁর একটী মুখের কথায় দুলে উঠছে সেই জনতা, ফুলে উঠছে সমুদ্রজল···ধীরে ধীরে অন্তরে জেগে ওঠে, তীব্রতম নেশার চেয়ে তীব্রতর এক বিরাট বাসনা, সামনের ঐ সহস্র বিভিন্ন মানুষকে কথায় গলিয়ে গুঁড়িয়ে তাল পাকিয়ে একটী বিদ্যুৎ-শিখার মত জ্বালিয়ে জাগিয়ে তুলতে···

---

* জওহরলালের আত্মচরিত

যতদিন যায়, ততই বাড়ে অভিজ্ঞতা···সৃষ্টির আনন্দ···যা ছিল বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন, উদ্দেশ্যহীন জনতা—এই মুহূর্ত্তে আমারই মুখ-নিঃসৃত বাণী তাকে গড়ে তুল্লো নতুন মূর্ত্তিতে, অবিচ্ছিন্ন অভিন্ন সঙ্ঘবদ্ধ একটী প্রতিজ্ঞা···একটী বাসনা···ঐ সহস্রের জনতা···আর জনতা নয়, মানুষের সঙ্ঘ নয়···অগ্নির স্ফুলিঙ্গ, বারুদ-স্তূপ নই হয়ত ফেটে পড়বে তুমুল গর্জ্জনে···

তীব্র এই অনুভূতি···বিপুল এর আকর্ষণ···

জনতার কাছেও তীব্রতর হয়ে ওঠে তাঁর আকর্ষণ···

যেখানে জওহরলাল যান, চুম্বক-আকৃষ্টের মত জনতা তাঁকে করে অনুসরণ।

রূপকথার রাজকুমারের মত নানা বিচিত্র রঙীন কাহিনী দিয়ে তারা পল্লবিত করে সাজায় তাদের তরুণ বীরের জীবনকে···জীবনের রাজকীয় উৎসব থেকে বঞ্চিত, মানসিক-অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ, ভারতের ক্ষুধার্ত্ত শ্রেণীর যুবকেরা, তাদের অন্তরের সব নিরুদ্ধ কামনা, অতৃপ্ত বাসনা আরোপ করে জওহরলালের ওপর···

ভারতীয় হয়েও যে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্-এর সখা ও সহচর···

প্যারিসের রজকিনীর শুভ্র-হস্ত-পরিমার্জ্জিত বসন ছাড়া যে পরে না বসন···

সেলুন ছাড়া যে স্পর্শ করে না রেলের কামরা···ইত্যাদি···ইত্যাদি···

লোকের মুখ থেকে মুখে এই-সব রঙীন কাহিনী ক্রমশ আরো রঙীন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে···এবং যত রঙীন হয়, তত পড়ে ছড়িয়ে, এবং যত পড়ে ছড়িয়ে ততই লোকে তাকে সত্য বলে মেনে নেয় এবং সেই অনুপাতে বাড়তে থাকে বিস্ময় আর শ্রদ্ধার মাত্রা।

তাই বঞ্চিত যৌবনের মানসিক সার্থকতার প্রতীক স্বরূপ ফুটে ওঠে, জওহরলাল···

জনতার এই বিস্মিত শ্রদ্ধার আবেদনে আছে একটা মারাত্মক মাদকতা, যা দিয়ে জনতা গ্রাস করে নিয়েছে বহু প্রতিভাকে···অকালে হারিয়েছে তারা তাদের ভার-কেন্দ্র...

জওহরলালের জাগ্রত মস্তিষ্ক সে আত্ম-বিলাসে, সৌভাগ্যবশত, তাঁকে দেয় নি ডুবতে...

তাই যখনি জনতা নিয়ে এসেছে পুষ্পাঞ্জলি, হাত বাড়িয়ে নিতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে, এ অর্ঘ্য তারা যাকে দিচ্ছে, সে তো তিনি নন্...এ অর্ঘ্য তাঁরি নামাশ্রিত আর এক কল্পিত মূর্ত্তির...

চেষ্টা করেছেন ভাঙতে জনতার সে-সম্মোহন...অকারণ রূঢ় হয়েছেন... তীব্র করেছেন ভৎর্সনা...

কিন্তু হায়...

মুগ্ধা নারীর মত, মুগ্ধ জনতা, যাকে ভালবাসে, যত তার কাছে পায় আঘাত, ততই তার দিকে হয় আকৃষ্ট...

(৮)

ওঠে ঝড়...সমুদ্রের স্থির জলে জাগে তরঙ্গ···

মহম্মদ আলী কারারুদ্ধ হলেন···তাঁর অপরাধ, তিনি নাকি রাজার সৈন্যদের বলেছিলেন, রাজার সঙ্গে দেশের কথাও ভাবতে···

তরঙ্গ হয়ে ওঠে উত্তাল···

মহাত্মা ঘোষণা করেন, সমবেত আইন-অমান্য-আন্দোলন···

দুলে ওঠে নিদ্রা থেকে বাসুকীর অনন্ত শির···

এমন সময় এলেন ভারতের যুবরাজ ভারত-পরিভ্রমণে···

সর্বত্রই থেকে চলো তার উৎসব-আয়োজন···কংগ্রেস বলো, সে-উৎসবে আমরা দেবো না যোগ···

জনহীন শূন্যরাজপথের রিক্ত অভ্যর্থনার মধ্যে যুবরাজ দেখে যান, ভারতের রিক্ত অন্তর...

প্রদেশে প্রদেশে তখন চলেছে স্বেচ্ছাসেবক-গঠন···রক্তহীন সংগ্রামের সৈন্য-সংগ্রহ···

সরকার ঘোষণা করলো, বে-আইনী এই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী।

যুক্ত-প্রদেশে পণ্ডিত মতিলাল সে-বাহিনীর প্রথমে নিজের নাম স্বাক্ষর করলেন···

বাংলায় দেশবন্ধুর কণ্ঠে বেজে উঠলো সে-আইনের প্রতিবাদ। দলে দলে তরুণেরা চল্লো কারাপথে···

দেশবন্ধুও হলেন কারারুদ্ধ।

কারাদ্বারে দাঁড়িয়ে বল্লেন, আমার দুই হাতের মণি-বন্ধে পড়েছে লৌহ-বলয়···সারা অঙ্গে শৃঙ্খলের অসহ্য ভার···বন্ধনে কাঁদে আত্মা··· সারা ভারত আজ এক সুবিশাল কারাগার···কি যায় আসে আমি রইলুম তার ভেতরে, কি বাইরে! কি যায় আসে আমার একলার জীবনে কিংবা মরণে?

সে-সিংহ-গর্জ্জনে কেঁপে উঠলো ভারতের জনারণ্য···

যুক্ত-প্রদেশে জওহরলাল সমগ্র মন দিলেন, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে গড়ে তুলতে···তালিকা তৈরী হলো···কার পরে, কে যাবে···

একদিন বিকেল বেলায় কংগ্রেস অফিসে বসে কাজ করছেন, এমন সময় ছুটতে ছুটতে একজন কর্ম্মচারী এসে খবর দিল, এসেছে! পুলিস এসেছে!

জওহরলাল যেন শুনতে পেলেন না, আদেশ দিলেন, যে যার কাজ করে যাও·····

পুলিশ সামনে এসে দাঁড়ালো।

—আমরা খানাতল্লাসী করতে এসেছি।

কাগজ থেকে একবার শুধু মাথা তুলে একজন কর্ম্মীকে ডেকে বলে দিলেন, এঁদের অফিসটা দেখিয়ে দাও!

তারপর আবার ঘাড় হেঁট করে কাজ করে যেতে লাগলেন, যেন অস্বাভাবিক কোথাও কিছু ঘটছে না।

উত্তেজনাকে ঢাকবার উত্তেজিত চেষ্টা···

সামনে গিয়ে পুলিস একজন সহকর্ম্মী বন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

যাবার মুখে বন্ধু এসে দাঁড়ায়, বিদায়-সম্ভাষণের জন্যে!

নিজেকে অবিচলিত দেখাবার চেষ্টাকৃত উদাসীনতায় তিনি বল্লেন, দাঁড়াও, কাজটা সেরে নি।

পুলিস বন্দীকে নিয়ে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারেন, হাস্যকর এই নির্লিপ্ততার চেষ্টা কতখানি হয়েছে অন্যায়··লজ্জিত হয়ে ওঠেন···কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় নেই তখন···

তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বাড়ী ফিরে-আসেন···বাড়ীর দরজাতেই দেখেন, সেখানেও পৌঁছে গিয়েছে তখন পুলিশের লোক···

সারা বাড়ীতে চলেছে খানাতল্লাসী···

দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে কালো মোটর-গাড়ী···

পিতা-পুত্রের একসঙ্গে এসেছে আহ্বান···

পুরনারীরা শঙ্খ বাজায়···

হুলুধ্বনি দেয়···কপালে পরিয়ে দেয় রক্ত-চন্দন-তিলক···

কারাগার আজ জাতির শ্রেষ্ঠ তীর্থ···

কারাযাত্রী আজ তীর্থ-যাত্রী···

(৯)

মতিলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী নামক বে-আইনী দলের সভ্য···

পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি হরতাল ঘোষণা করে ইস্তাহার বিলি করেছেন···

প্রকাশ্য বিচারালয়ে বিচার হলো।

আসামীরা অবশ্য বিচারের কোন অংশই গ্রহণ করলেন না।

মতিলাল যে সেই বে-আইনী দলের সভ্য তা প্রমাণ করবার জন্যে সরকার থেকে একটা ছাপানো কাগজ কোর্টে উপস্থিত করা হলো। তার তলায় নাকি হিন্দীতে মতিলালের স্বাক্ষর আছে।

এর-আগে পর্য্যন্ত মতিলাল কখনো হিন্দীতে স্বাক্ষর করেন নি এবং সে-স্বাক্ষর যে তাঁর এ-কথা বলতে পারে তখন খুব কমই লোক ছিল।

ভারতের শ্রেষ্ঠ উকীল নীরবে দেখছিলেন সেই বিচারের প্রহসন।

কোথা থেকে একজন বৃদ্ধ লোককে সংগ্রহ করা হয়েছে, সে নাকি চেনে হিন্দীতে মতিলালের স্বাক্ষর।

মতিলাল দেখলেন, লোকটী যে তাঁর স্বাক্ষর চেনে তাতে কোন সন্দেহই নেই, কারণ কাগজখানি সে আগাগোড়া উল্টোই ধরে রইলো··· এত অশিক্ষিত যে অক্ষরের উল্টো-সোজা জ্ঞান তার নেই···

বিচার হয়ে গেল···

অপরাধীর শাস্তি, ছ'মাস কারাদণ্ড···

পিতা এবং পুত্র, উভয়ের।

কিন্তু হঠাৎ দু'দিন পরে, সরকার মহলের বড় উকীলেরা বল্লে পুত্রের বিচারে ভুল হয়ে গিয়েছে···তাঁকে শাস্তি দেওয়া চলে না···

তাই জওহরলাল শুনলেন, তাঁর খেয়া শেষ হয়ে গিয়েছে···ফিরে যেতে হবে···

পিতাকে কারাগারে রেখে দুঃখিত অন্তরে জওহরলাল বাইরে এলেন···

কিন্তু মাত্র তিনদিনের জন্যে।

তিনদিন পরে, এলাহাবাদের বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের নিয়ে তিনি যখন বিদেশী-বস্ত্র-বর্জ্জনের আয়োজনকে দৃঢ়তর করবার জন্যে আলোচনা করছেন, এসে দাঁড়ালো আবার সেই কালো মোটর-গাড়ী···

এবার আর ভুল নয়···

—বিচারে—এক বছর ন'মাস কারাদণ্ড হলো।

(১০)

কারাগার···

অজানা বিভীষিকার মত ছিল·· দূরে···

সহসা সেই কারাগার ভরে গেল লোকে···হাজার হাজার লোকে··· সারা ভারতের বৃটীশ কারাগারে আর হয় না স্থান-সংস্থান···

জেলের অধ্যক্ষ স্বভাবতই চেয়ে থাকেন যে, একটীও কারাবাসী যেন না বেরুতে পারে: আজ হঠাৎ হাওয়া গেল বদলে···জেলারদের ওপর হুকুম হলো, চেষ্টা করো, যাতে পালিয়ে যায় কারাবাসীরা···

শুধু একটা সই···ভবিষ্যতে আর এ-কাজ করবো না···একটা অপমানজনক স্বীকারোক্তি···

যে-জেলার যত পারবে এই ভাবে বন্দীদের ছাড়িয়ে দিতে, তত হবে তার সম্মান···

তাদের উপাধি নেই, সে হবে খাঁ সাহেব কি রায় সাহেব···যিনি

আছেন রায় সাহেব কি খাঁ সাহেব তিনি হবেন খাঁ বাহাদুর কিম্বা রায় বাহাদুর…

কারাগার !

মহাত্মা গান্ধী এই ভয়-বিমূঢ় জনতাকে দেখালেন, রাত্রির অন্ধকারে দূরে দাঁড়িয়ে যে-দেখায় ভয়…ভয়, [illegible] নেই…… ভয় আছে, আমাদের মনে…সেখান থেকে যদি ফেলে দিতে পারি ভয়, ভয় নেই ত্রিভুবনে…

তিল তিল করে পুঞ্জীভূত ভয়..মনকে করেছে আচ্ছন্ন…অন্ধ করেছে দৃষ্টি, রুদ্ধ করেছে প্রসার…আজ দূর হোক্ তার আধিপত্য… নির্ভীক নির্ভয় জাগুক মন…জীর্ণ-পত্রের মত খসে পড়ে যাবে সব শৃঙ্খল…

(১১)

লক্ষ্ণৌ জেলের একটা ছোট্ট 'শেডে', তাঁরা থাকেন,—পণ্ডিত মতিলাল, পুত্র এবং দুজন ভ্রাতুষ্পুত্র…

কারাজীবন…নতুন তার অভিজ্ঞতা…

পাছে দেহ ও মনের ওপর কোন বিষ-প্রভাব ফেলে, তাই গোড়া থেকেই জওহরলাল কারাবাসকে সহজভাবে স্বীকার করে নিলেন…

হয়ত এমনি বারে বারে এখানে আসতে হবে ফিরে…হয়ত জীবনের বহু দিন কাটবে এই কারা-প্রাচীরের ভেতর…

কিন্তু তাই বলে, এ-র কাছে মানতে হবে হার ? দেহ যাবে ভেঙে, মন যাবে অলস নীরস হয়ে ? সমস্ত দৃষ্টি-ভঙ্গী হারিয়ে ফেলবে তা স্বচ্ছতা ?

জওহরলালের প্রবুদ্ধ মন সে-পরাজয় মেনে নিতে করলেন অস্বীকার· তিনি স্থিরচিত্তে কারাজীবনের একটা রুটীন্ তৈরী করে ফেল্লেন…

অধিকাংশ লোক কারাগারে এসে দেহ ও মনকে দেয় এলিয়ে। জওহরলাল বিচার করে দেখলেন, সেইখানেই তাঁরা ভুল করেন।

যেখানে বাধ্য হয়ে বদ্ধ জীবন যাপন করতে হয়, সেখানে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন কাজের, দেহ ও মনের সঞ্চালনের। যেখানে স্বাভাবিক উপায়ে এই দৈহিক ও মানসিক সঞ্চালনের কোন ব্যবস্থা না থাকে, সেখানে উদ্ভাবন করে নিতে হয়, নতুন নতুন কর্ম্ম-ব্যবস্থার।

তাই জওহরলাল কারাগারে এসে উদয়াস্ত নিজের জীবনকে একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থায় বেঁধে ফেল্লেন। ভোর বেলা উঠে, সমস্ত শেড্ নিজের হাতে পরিষ্কার করা, তারপর .....নিজের কাপড় চোপড় কাচা, বিছানা তোলা, পরিষ্কার করা...তারপর দাড়ি কামানো...

লোকে কারাগারে এসে দাড়ি কামানো ছেড়ে দেয়...সেটা মানসিক আলস্যেরই একটা নিদর্শন...জওহরলাল ইচ্ছা করেই রোজ দাড়ি কামাতেন—তাতে খানিকটা কর্ম্ম-অভ্যাস বজায় থাকে...মন আলস্য-বিলাসিতার অবকাশ পায় না...

(১২)

কারাগারের ভেতরে গিয়ে, কারাবাস করে এসে, লোকে কারা-কাহিনী লেখে।

সে কারা-কাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রে একান্ত ব্যক্তিগত কাহিনী।

কিন্তু জওহরলালের আত্মজীবনী যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, তার মধ্যে এমন একটা নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে, যা হলো বিংশ-শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক তার একটা প্রধান অঙ্গ... তার ফলে তাঁর দৃষ্টি, নিজেকে ছাড়িয়ে গিয়ে পড়লো কারাগার-দের বাস্তবতার ওপর, কারাসংস্কারের ওপর।

কারাগারের ভেতরে গিয়ে সেই প্রথম দেখলেন, বৃটীশ-শাসনে কারাগারের সেই ভয়াবহ বিভীষিকা···

নিজের দুঃখকষ্ট বেদনা নয়, প্রতিষ্ঠান হিসাবে কারাগারের কি ভয়াবহ দৈন্য...আজও তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত প্রতিহিংসামূলক শাস্তি-বিধানের ওপর...

জাগ্রত দৃষ্টি নিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন...লক্ষ্য করেন, কারাগারে সভ্যতার লাঞ্ছনা...মানবতার লাঞ্ছনা

দেখলেন, এ কারাগার শুধু দোষীকে শাস্তি দেবার জায়গা··· দোষীর দোষকে দূর-করবার সাধনা নেই এর পেছনে...তাই একই লোক, একই অপরাধে বারে বারে ঘুরে আসে, তার আতিথ্য লাভ করবার জন্যে...

যখন চলে যায়, তখন সর্ব-অঙ্গে রেখে নিয়ে যায় কারাগারের লাঞ্ছনার মসী-রঙ···

জওহরলাল স্থির করলেন, অশিক্ষিত কারাবাসীদের নিয়ে তিনি স্কুল খুলবেন, তাদের বর্ণ-পরিচয় করাবেন···বিশেষ করে যে-সব অশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক এই আন্দোলনে কারাগারে এসেছে...

তখনও অন্য কারাবাসীদের সঙ্গে মেশবার নিষেধ-আজ্ঞা জারী হয় নি···

নিজেদের শেড থেকে যেটুকু সময় ছুটি পান, জওহরলাল তাদের মধ্যে গিয়ে, পড়াতে বসেন···

কিন্তু বেশীদিন সে সদিচ্ছাকে রূপ দেওয়া চলো না···

ক্রমশ এক এক করে নতুন সব কারা-আইন সৃষ্টি হতে লাগলো···নতুন নতুন সব নিষেধ···

বন্ধ হয়ে গেল শেডের বাইরে যাওয়া, বন্ধ হয়ে গেল স্কুল-করার, বাইরের অন্য কয়েদীর সঙ্গে মেলামেশা...

বাইরে তখন জনতা এই আনন্দেই মেতে আছে যে, পণ্ডিত মতিলালকে স্যার হার্কট বাট্‌লার বাধ্য হয়ে কারারুদ্ধ করে রেখেছেন বটে কিন্তু এমনি মতিলালের প্রতিপত্তি যে জেলার গভর্ণর স্যার হার্কট স্বয়ং মতিলালের কাছে নিয়মিত পাঠিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর পানের জন্যে··· "শ্যাম্‌পেন্"···

এ খবর যে সত্যি···তার প্রমাণ···

যে-যেমন-ভাবে পারে দেয়···

হায় রে জনতা!

(১৩)

হঠাৎ কারাবাসের মাঝামাঝি জওহরলাল মুক্ত হয়ে গেলেন। মার্চ্চ মাসের গোড়ায়।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আবার ফিরে এলেন···

দীর্ঘ হয়ে আসে কারাগারের ছায়া···

ঘনকৃষ্ণ ছায়া···হয় কৃষ্ণতর···

দেখেন কয়েক মাস আগেও যা ছিল, এখন আর তাও নেই।

পণ্ডিত মতিলালকে আলাদা কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

একটা ব্যারাকে তাঁরা এক সঙ্গে পঞ্চাশ জন কয়েদী।

হাঁফিয়ে ওঠে নির্জ্জনতা-লোভী মন।

একটী মুহূর্ত্ত নেই, যা একান্ত নিজের, নিজস্ব।

বাধ্য হয়ে বন্দী বাইরে সরু বারাণ্ডায় এসে বসে থাকে।

গায়ের ওপর দিয়ে চলে যায় বৃষ্টির ঝাপ্‌টা···

পুড়িয়ে দিয়ে যায় দুপুরের রোদ···

বন্দী চেয়ে থাকে আকাশের দিকে···

আজ মনে হয়, এমন করে বুঝি আর কখনো আকাশে আসেনি

মেঘ, এমন করে বুঝি আর কখনো হয় নি আকাশে সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্ত···

চোখ খুঁজে মরে কোথায় দিগন্ত-রেখা···

কারা-প্রাচীরে আহত হয়ে ফিরে আসে দৃষ্টি।

দেহের বন্ধনে কাঁদে বন্ধন-অসহ মন।

রাত্রিতে আসে আকাশ-ভরা তারা। এক কোণে বসে, মনে চেষ্টা করেন, তাদের চিনতে···

ঐ রোহিণী···ঐ সপ্তর্ষি-মণ্ডল···ঐ দূরে মৃগশিরা···

বন্দী জীবনে তারাই অন্তরের সাথী···রোজ রাত্রির মন অপেক্ষা করে থাকে তাদের জন্যে···কখন আকাশে দেবে তারা দেখা···

আকাশময় ঘুরে বেড়ায় বন্ধনহীন বন্দী মন···

(১৪)

কারাগারের বাইরে আছে মানুষের শ্রেণী-বিভাগ। কারাগারের ভেতরে, বৃটীশ-কারাগারের ভেতর নেই কোন শ্রেণী-বিভাগ···অন্তত তখন ছিল না···

জওহরলাল দেখলেন, যে-আদর্শ বৃটীশ ভারতে নেই, বৃটিশ-কারাগারে তা পূরামাত্রায় আছে—সকলেই সমান···কোন শ্রেণী-গত স্বাতন্ত্র্য নেই···রাজনৈতিক বন্দী আর পকেটমার, সবই সমান।

কোন কোন উদ্ধত রাজনৈতিক বন্দী তা মানতে চাইতো না। ব্যতিক্রমে হতো শাস্তি।

পনেরো বছরের ছেলে আজাদ। ছিল একজন স্বেচ্ছাসেবক। একদিন কি একটা কথায় সে বেঁকে দাঁড়ালো।

খবর গেল জেলারের কাছে। শাস্তি হলো, বেত।

গা থেকে তার জামা খুলে নেওয়া হলো। বেত্রাঘাতে দণ্ড যাদের

দেওয়া হয়, তাদের বেঁধে রাখবার জন্যে একরকম কাঠের ত্রিকোণ বস্তু তৈরী থাকে। সেখানে বাঁধা হলো আজাদকে।

গুণে গুণে খালি পিঠে পড়তে লাগলো চাবুক।

এক একবার চাবুক পড়ে, পিঠের চামড়া ছিঁড়ে যায়, আর সেই সঙ্গে আজাদ চীৎকার করে ওঠে, মহাত্মা গান্ধী কি জয়!

চলো চাবুক···সঙ্গে জয়নাদ···যতক্ষণ না বালক পড়লো অচেতন হয়ে···*

বেল্‌শনের কথা তখনও জগৎ জানে না···

(১৫)

চলে যায় মাসের পর মাস···

হঠাৎ বন্দীর মনে পড়ে কতদিন শুনিনি নারীর কণ্ঠস্বর, দেখিনি শিশুর হাসি···

ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে কারা-বিচ্ছিন্নতা···

কই, কতমাস হয়ে গেল, শুনিনি তো, একটীও পথ-কুক্কুরের চীৎকার...

সামান্য জিনিস...সচরাচর শুনি বলে, মনেই পড়ে না তাদের··· আজ সেই সামান্য জিনিসটুকু স্মরণ করিয়ে দেয়, কি নিদারুণ এই শাস্তি...জীবনের সঙ্গে যেন ছিঁড়ে গিয়েছে নাড়ির টান...

উনিশ শো তেইশ সালের জানুয়ারী মাসে...খুলে গেল কারাগার...

আবার এসে দাঁড়ালেন জীবনের মধ্যে...কর্ম্মের মধ্যে...

---

* এই আজাদই একদিন সেই চাবুকের দাগ পিঠে নিয়ে জেল থেকে বেরোয়। এবং সেই চাবুকের দাগই তাকে উত্তর ভারতের একজন রক্ত-লোভী বিপ্লবী করে তোলে।

কিন্তু এই ক'মাসের বিচ্ছিন্নতায় মনের মধ্যে যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে কত বিশ্ব···হঠাৎ যেন মনে হয়, একসঙ্গে যেন গিয়েছে জীবনের বহু বৎসর...বহুযুগ...

সেই মন নিয়ে বাইরে এসে দেখেন, কংগ্রেসের মধ্যে সুরু হয়েছে দলাদলি...নেই সেই একমুখিনতা, একাগ্রতা...

একদল বলে, চল শাসন-পরিষদে...

আর একদল বলে, না, দরকার নেই কোন পরিবর্ত্তনের, পুরাণো কর্ম্মপন্থাই ভালো—

ফলে, রথ চলে না পথে...

চলে শুধু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে কথার ঢাকা।

কারাগার থেকে বাড়ীতে পা দিয়েই দেখেন, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে দামী খামে, একখানা চিঠি।

চিঠি খুলে দেখেন, চিঠি লিখেছেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার গ্রীম্‌উড্ মীয়ার্স।

একান্ত আন্তরিক ভাষায় স্যার গ্রীম্‌উড্ চেয়েছেন তাঁর সঙ্গে পরিচয়কে নিবিড় করতে। যে ভুল বৃটীশ রাজকর্ম্মচারীরা করেছেন, ভারতীয়দের সঙ্গে আন্তরিক ভাবে না মিশে, তা সংশোধন করতে চান তিনি। ইংলণ্ড আর ভারতবর্ষের মধ্যে বেড়ে উঠেছে যে তিক্ততা, তা দূর হতে পারে, যদি উচ্চ ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারীরা প্রকৃত বন্ধুর মত মেশেন সমপর্য্যায়ের ভারতীয়দের সঙ্গে। তাই তিনি উপযাচক হয়ে বন্ধুর কর প্রসারণ করেছেন জওহরলালের দিকে।

জওহরলাল গ্রহণ করলেন সে-বন্ধুত্ব।

কাজের অবকাশে মাঝে মাঝে যান স্যার গ্রীম্‌উডের সঙ্গে গল্প করতে।

আন্তরিক ভাবে হয় কথাবার্ত্তা।

একদিন হঠাৎ স্যার গ্রীমউড বলেন, এই ধর, তোমার মত যদি কোন উপযুক্ত লোককে এই প্রদেশের শিক্ষা-মন্ত্রী করা হয়, এবং তোমাকে তোমার ইচ্ছামত শিক্ষা-সংস্কারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তুমি কি মনে কর না, তাতে দেশের প্রভূত কল্যাণ হতে পারে?

মনে পড়ে জওহরলালের কারাগার থেকে ফিরে আসার প্রথম সেই চিঠি···

স্যার গ্রীমউড বলেন, সম্প্রতি গভর্নরের সঙ্গে আমার এই নিয়ে কথা হয় এবং আমি তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি যে, তুমি যদি ভার নাও, তাহলে এ-ব্যাপারে নিশ্চয়ই কেউ আর হস্তক্ষেপ করবে না!

শ্রোতার দিক থেকে দেখা যায় না কোন আগ্রহ···কোন উত্তাপের লক্ষণ।

কথাটা খুবই স্পষ্ট হয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে স্যার গ্রীমউড তাড়াতাড়ি সংশোধন করে নিয়ে বলেন, অবশ্য, এসব কথা যে তোমাকে বলছি, এ আমার একান্ত ব্যক্তিগত অভিমত!

জওহরলালের বুঝতে বাকি থাকে না, কথাটা কতখানি ব্যক্তিগত আর কতখানিই বা সরকারের অভিপ্রেত···

স্যার মিয়ার্স হয়ত তখন জানতেন না যে, যে-মন্ত্রীত্বের প্রলোভন তিনি তখন জওহরলালের সামনে তুলে ধরেছিলেন, দেশে তখন তার খুব বেশী মূল্য ছিল না।

একবার, লোকে বলে, একজন অতি সাধারণ লোককে যুক্ত-প্রদেশে মন্ত্রী করবার কথা হয়।

লোকটা সে কথা শুনে চটে গিয়ে বলেছিল, আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি কম, তা আমি জানি কিন্তু তা বলে মন্ত্রী হয়ে আমি সকলের সামনে জাহির করতে চাই না সে-কথা!

(১৬)

যদি বলি, অর্থের চিন্তায় সেই সময় জওহরলালকে রীতিমত বিব্রত হতে হয়েছিল, তা হলে রূপকথার রাজকুমারের যে কল্পচিত্র কৌতুকের মনে গড়ে উঠেছিল, তাতে হয়ত দাগ পড়বে…

তা পড়ুক…যে-রঙ দুদিন পরে উবে যাবে, তা যতই ঘোরালো হোক্ না কেন, তার কোন দাম নেই…

মতিলাল তখন আদালত ছেড়ে দিয়েছেন। মাসিক দে-বিরাশি আর আর নেই…

ঐশ্বর্য্যের শত সামগ্রীতে ভরা আনন্দ-ভবন…শোভা ছাড়া আর কি প্রয়োজন আছে তাদের…?

মতিলাল একে একে সে সব বিক্রি করতে লাগলেন…সংসার-খরচের টাকার প্রয়োজন…

গাড়ী-ঘোড়া বিক্রি হয়ে গেলে…সেই সঙ্গে চলে গেল, ঐশ্বর্য্যের নানা বিচিত্র সব আসবাব…

আনন্দ-ভবনের জীবনের ধারাও গেল বদলে।

অযত্নে বুনো হয়ে উঠলো বাড়ীর চারদিকের অত-যত্নে-তৈরী-করা ফুলের বাগান, টেনিস্ কোর্ট…লন্…বাথ্

আদালত থেকে জওহরলাল নিজেও সামান্য যা কিছু উপার্জ্জন করতেন, তা-ও বন্ধ হয়ে গিয়েছে অসহযোগ আন্দোলনে…

অথচ নিজের খরচ আছে…স্ত্রীর খরচ আছে…

হিসেব করতে বসলেন…নিজের খরচের মধ্যে দেখলেন, খদ্দরের পোষাক আর তৃতীয় শ্রেণীর রেলের ভাড়া…এমন কিছু নয়…

কিন্তু তারও জন্যে পিতার স্কন্ধে ভর করে থাকতে জওহরলালের অন্তরে পীড়া দিতে লাগলো…

এই সময় দলে দলে জিওয়াজীরা সব এসে জওহরলালের দ্বারস্থ হলো।

—আমাদের ব্যবসায়ে আপনি একজন ডিরেকটর হন। শুধু আপনার নামটা।

অর্থকরী প্রস্তাব কিন্তু জওহরলাল ঘৃণায় তা করেন প্রত্যাখ্যান। ব্যবসা বা বাণিজ্যের সঙ্গে যদি নিজের নাম রাখতে হয় সংযুক্ত, তবে ও-ভাবে অলস অংশীদার হয়ে নয়..

নামকে এইভাবে ভাঙা খাটানো—ব্যক্তিত্বের লাঞ্ছনা...ধন-তান্ত্রিক অর্থ-গৃধ্নু তার নির্লজ্জ সংক্রামক ব্যাধি···

তখন তিনি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী···যুক্ত-প্রদেশের মিউনিসিপ্যালিটী পরিচালনের ভারও তাঁর ওপর।

কিন্তু দুটিই অবৈতনিক পদ।

মনে মনে স্থির করলেন, যদিও সময় কম, তবুও যতটুকু সময় পাওয়া যায়, তার মধ্যে তিনি নিজের জীবিকা নিজে অর্জ্জন করবেন···

কিন্তু বিপদ হলো, এ কথা শুনলে স্নেহময় পিতা মনে নিদারুণ ব্যথা পাবেন।

তবুও একদিন, একান্ত সংযত এবং নম্রভাবে পিতাকে জানালেন, এ ধরণের আর্থিক পরনির্ভরতা তাঁর পীড়াদায়ক মনে হচ্ছে।

মতিলাল বোঝেন, পুত্রের অন্তরের দ্বন্দ্বের কথা। কিন্তু তবুও তিনি যূথপতি···রক্তে তাঁর ঐশ্বর্য্যের রাজকীয়তা···

শত্রুকে তুমি ভর্ৎসনা করেন, বুঝিয়ে বলেন, এ নিজের ক্ষমতার অপব্যয়···সামান্য ক'টা টাকার জন্যে যে-সময় তুমি বাজে কাজে নষ্ট করছো, দেশের কাজে সে-সময়টুকুর মূল্য তার চেয়ে ঢের বেশী।

জওহরলাল তখন প্রস্তাব করেন, কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর

পর্দাকে অর্থকরী করা হোক্! আমি পরি[illegible]
যা যুক্তিসঙ্গত পারিশ্রমিক, তা নিতে আমার মর্য্যাদায় [illegible] বিব্রত
কিন্তু মতিলালের মর্য্যাদায় তা বাধে না।

পুত্রকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, আমি একদিন আদালতে গিয়ে, [illegible] টাকা নিয়ে আসবো, তাতে সারা বছর চলে যাবে…

(১৭)

এই সময় হঠাৎ একটা [illegible]পারে [illegible]লালের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো নেটীভ ষ্টেট্‌স্-এর ওপর…

ভারতবর্ষের ভেতরে আর একটা ভারতবর্ষ : ঢাকার ভেতরে ঢাকা : বিংশ শতাব্দীর মধ্যে মধ্য-যুগের একটা কঙ্কাল : অথচ চলেছে পাশাপাশি : মাঝখানে পলিটিক্যাল্ ডিপার্টমেণ্টের নিশ্ছিদ্র বিরাট পাঁচিল। পাঁচিলের এ-ধারে যখন মহাকালের আকাশে হচ্ছে সূর্য্যোদয়, পাঁচিলের ও-পারে তখন জমাট বেঁধে আছে মধ্য-রাত্রির অন্ধকার : সে-অন্ধকারে আছে ঢাকা কত যে শবের গলিত দেহ…নির্লজ্জ নগ্নতার নিশীথ-অভিসার…পাঁচিলের এ-পারে ক্বচিৎ আসে তার সংবাদ।

পাঁচিলের ও-পারে এমনি অন্ধকারের দেশে, দুটী রাজ্য, নাভা আর পাতিয়ালা : শিখদের দেশ।

নানা কারণে নাভার সঙ্গে চলে আসছে পাতিয়ালার সংঘর্ষ : সংঘর্ষ ক্রমশ হয়ে ওঠে মারাত্মক।

তখন ভারত-সরকারের পলিটিক্যাল্ ডিপার্টমেণ্ট মীমাংসা করে দিলেন এ-সংঘর্ষের, নাভার মহারাজকে রাজ্যচ্যুত করে। তাঁর পরিবর্ত্তে বৃটীশ-সরকার নিযুক্ত করলেন, রাজ্যের শাসন-কাজ চালাবার জন্যে একজন বৃটীশ রাজকর্ম্মচারী।

এই ব্যাপারে শিখেরা হলো অসন্তুষ্ট।

এই সময় দলে দলে শিখের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা করতে লাগলো হলো। আন্দোলন···

—আ সময় নাভা রাজ্যে জাইটো গ্রামে এলো এক উৎসবের দিন, শিখ-ধর্ম্মের এক বিশেষ উৎসবের দিন।

নব-নিযুক্ত বৃটীশ শাসক বন্ধ করে দিলেন সে-উৎসব। শিখেরা যখন সে-কথা শুনলো, তারা বল্লো, আমরা করবো সত্যাগ্রহ।

মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহের রক্তহীন আদর্শ গ্রহণ করলো তারা: বীরের হাতে সত্যাগ্রহ হলের অশনি-সম্মত উঠলো জ্বলে।

দলে দলে অস্ত্রহীন, উপদ্রবহীন, শিখ-বীরের দল পায়ে হেঁটে চলতে লাগলো জাইটোর দিকে...একদল অবরুদ্ধ হয়, আর একদল আসে:

পাঞ্জাবের নানা দিক থেকে বিরাম-বিহীন আসতে আরম্ভ করলো এই জাঠা···সব পথ, আজ জেইটোর দিকে:

জেইটো প্রবেশ করবার আগেই কিন্তু সশস্ত্র পুলিশের লোক তাদের বাধা: সত্যাগ্রহীর কাছে সত্যের বাধা ছাড়া নেই আর দ্বিতীয় বাধা তাই বাধা অগ্রাহ্য করে তারা চলতে যায়:

রুদ্রমূর্ত্তিতে পুলিশ আক্রমণ করে তাদের: নির্দ্দয় প্রহারে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় তাদের দেহ: সত্যাগ্রহের নিরুপদ্রবতায় পণ-বদ্ধ তারা: যে-দেহ পারে পাহাড়কে টলাতে, পাথরের আঘাতে সে দেহ রইলো পথে পড়ে: পুলিশ "ভ্যানে" তুলে গভীর জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে তাদের:

এক দল যায়, আর একদল আসে। অবিরাম অবিচ্ছেদ চলেছে জাঠা:

সারা-দেশের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো, নাভার সেই নগণ্য জায়টো গ্রামের ওপর:

জওহরলাল ঠিক করলেন, সঠিক ব্যাপার অবগত হবার জন্যে

তিনি যাবেন জায়টোতে, চাক্ষুষ দেখবেন, পণ্য...বহু জিজ্ঞাসাবাদ করে সংগ্রাম : সঙ্গে সহযাত্রী হলো, দুই সহকর্মী বন্ধু, এ, সিংগতে তাঁদের এবং মাদাজের কে, সান্তানুম্। অনুমতিত্রে

ষ্টেশন থেকে নেমে পায়ে-হেঁটে যখন তাঁরা জায়টোর সীমানায় এসে পৌছলেন, তখন দেখেন একদল জাঠাও চলেছে সেই পথে : তিনজনে অনুসরণ করে চলেন সেই জাঠাকে।

জায়টোর সীমানায় এসে পৌছতেই এলো পুলিশের বাধা।

ইংরেজ-শাসকের স্বাক্ষর সংযুক্ত এক হুকুমনামা তাঁদের তিনজনের ওপর জাহির করা হলো, যেন তাঁরা নাভা রাজ্যে প্রবেশ না করেন এবং যদি প্রবেশ করে থাকেন, তাহলে, এই হুকুম পাওয়া মাত্রই যেন নাভা ত্যাগ করে চলে যান।

জওহরলাল বল্লেন, দুর্ভাগ্যবশত আমরা নাভাতে প্রবেশ করে ফেলেছি, সুতরাং প্রবেশ না করার কথাই ওঠে না : আর ফিরে যাওয়া সম্পর্কে কথা হচ্ছে, ফিরবার ট্রেণের বহু দেরী এবং ষ্টেশনও বহু দূরে : সুতরাং বাধ্য হয়েই তাঁদের নাভা রাজ্যের মাটিতে কিছুক্ষণ থাকতে হবে, কারণ, মানুষ তো আর ইচ্ছে করলে উবে যেতে পারে না!

পুলিস কর্ম্মচারী প্রত্যুত্তরে তাঁদের তিনজনকেই গ্রেফতার করলো এবং সোজা হাজতে নিয়ে গিয়ে তুল্লো।

সারাদিন কাটলো অন্ধকার হাজতে।

পাঁচিলের ও-পার...

সন্ধ্যাবেলা জওহরলাল আর সান্তানুম্, দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে, দুজনের হাতে হাণ্ড-ক্যাপ্ দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা হলো,—দুজনের হাণ্ড-ক্যাপ্ থেকে দুটো লোহার চেন, পুলিশের হাতে...

পেছনে সাদ্ওয়ানীর হাতেও সেই রকম লৌহ-বলয় চেনে বাঁধা—

লোকটা বল্লো, ইংরেজ এ... দিয়ে, জওহরলাল আত্মচরিতে লিখেছেন, মুলতুবী রেখেছে... যেন চেনে-বাঁধা কুকুরদের পথে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া কিছুক্ষ...

সেই-ভাবে হাঁটিয়ে তাঁদের ষ্টেশনে নিয়ে আসা হলো···সেখান থেকে ...বলে মধ্যরাত্রিতে নাভা জেলে···

সারারাত্রি সেই ভাবে সান্তানুমের সঙ্গে লৌহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রইলেন। ছোট্ট···অন্ধকার ঘর...ঘর কি গর্ত্ত বোঝা যায় না...দাঁড়াতে গেলেই মাথা ছাদ লাগে...পায়ের তলায় মাটী ভিজে...অবসন্ন দেহে বাধ্য হয়ে সেখানেই শুতে চেষ্টা করলেন...কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বুঝলেন, মধ্যরাত্রিতে এই ঘরে তাঁদের এই শুভাগমন, মোটেই পছন্দ করে নি, ঘরের আদিম অধিবাসীরা...তারা সদল বলে, তাঁর মুখের ওপর দিয়ে, দেহের ওপর দিয়ে, চলে যেতে লাগলো...

অগত্যা উঠে বসতে হয়...

তিনদিন সেই ভাবে সেই ঘরে বাস করার পর, তাঁদের নিয়ে-যাওয়া হলো বিচারালয়ে...

মধ্য-যুগের ভারতবর্ষ :

বিচার-আসনে যিনি বসে আছেন, তিনি এক বর্ণও ইংরেজী জানেন না এবং কোর্টের যা ভাষা, উর্দ্দু, তা-ও জানেন না লিখতে...পুলিশের লোক ধমক দিয়ে ওঠে...বিচারকের কাগজ-পত্র ভয়ে গোলমাল হয়ে যায়...

জওহরলাল প্রাণ-পণে বুঝতে চেষ্টা করেন, কোন্ নীতি অনুসারে বিচার হচ্ছে কিন্তু তাঁর ব্যারিষ্টারী-পড়া বিদ্যাতে কুলোয় না : কিছুই বুঝতে পারেন না : বিচারককে যা প্রশ্ন করেন, ... নিবেদন করেন, বিচারক শুধু নীরবে তা শোনেন :

এই ভাবে ছ'সাত দিন চলে যাওয়ার পর, তাঁদের ... একজনকে

আর এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসালো ছাঁ...বহু জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলেন, এ হলো আর একটা আদালত। আগের আদালতে তাঁদের ছ'মাস কারাবাসের শাস্তি হয়ে গিয়েছে, কারণ, তাঁরা বিনা অনুমতিতে নাভাতে প্রবেশ করেছিলেন। এবার বিচার হচ্ছে, ষড়যন্ত্রের!

ষড়যন্ত্র? জওহরলাল অবাক হয়ে ভাবেন, কিসের ষড়যন্ত্র? কার সঙ্গে ষড়যন্ত্র?

কিন্তু তা-ও জানবার কোন উপায় নেই।

জওহরলাল বল্লেন, সভ্য দেশের আইন অনুসারে, আমার অধিকার আছে আমার স্বপক্ষে উকিল দেবার···

বিচারক জানালেন, না, তা হবে না, বাইরে থেকে কোন উকীলই আসবে না···বিচার যা করবার আমরাই করবো..মানেটা দাঁড়ায়, বিচার করবার ক্ষমতা কি আমাদের নেই?

হতাশ হয়ে জওহরলাল ভাবেন, এ উপভোগ করা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই···তাঁর মনে হলো যেন তিনি মধ্য-যুগের কোন অপেরায় বা নাটকে অংশ গ্রহণ করে অভিনয় করছেন···

দ্বিতীয় দিন দেখেন, কোথা থেকে এক বৃদ্ধ শিখকে ধরে আনা হয়েছে···ষড়যন্ত্রের সেই নাকি প্রধান আসামী···এবং তার কথামত কখন যে ষড়যন্ত্র প্রমাণিতও হয়ে গেল, তা-ও জানতে পারলেন না। শুনলেন, শাস্তি দেওয়া হয়েছে, মাত্র দেড় বৎসর কারাদণ্ড···

আগে হলো, ছ'মাস, তারপর হলো, দেড় বৎসর···এবং একটার পর আর একটা ভোগ করতে হবে···মোট মাত্র দু'বছর!

বিস্মিত বন্দীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করে···দু'বছর থাকতে হবে ঐ বুনো ইঁদুরদের সঙ্গে!

পরের দিন হঠাৎ একজন লোক এসে তাঁদের তিনজনকে একটা গাড়িতে তুলে রেল-ষ্টেশনে নিয়ে এলো···সেখানে তাঁদের ছেড়ে দিয়ে

লোকটী বল্লো, ইংরেজ এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটর আপাততঃ তাঁদের শাস্তি মুলতুবী রেখেছেন...এই অবকাশে তাঁরা চলে যেতে পারেন···

কিছুক্ষণ পরে রেল-গাড়ী তাঁদের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিয়ে এলো পাঁচশ' মাইল ওপারে, আবার বিংশ-শতাব্দীতে···

সেদিন সে ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের এই সব নেটিভ-ষ্টেটের সঙ্গে তাঁর যে প্রথম পরিচয় ঘটে, সে-পরিচয় তাঁর অন্তরে চিরকালের মত দাগ রেখে যায়···তাই আজও তিনি নেটিভ-ষ্টেটের গণ-আন্দোলনের পতাকা বহন করে চলেছেন···

একই আকাশে সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্ত···

একই চৌহদ্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে বাস করেছে, মধ্য-যুগ আর বিংশ-শতাব্দী···

(২৮)

১৯২৩ সালের কংগ্রেস...সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আলী

জওহরলাল চান, কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর পদ থেকে মুক্তি···

নিজের ব্যক্তিত্বকে দলের কাছ থেকে রাখতে স্বতন্ত্র

কিন্তু কোন ওজর শুনলেন না মওলানা সাহেব, যতদিন আমি থাকবো সভাপতি, তোমাকে থাকতে হবে সেক্রেটারী...

দুজনে ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরিত চরিত্রের লোক কিন্তু এক অপূর্ব্ব মমতা গড়ে উঠেছিল দুজনের মধ্যে...

বাইরের বিচ্ছিন্নতার আবরণ ভেদ করে, অন্তরলোকে কোথায় তাঁদের দুজনের ছিল গভীর মিল...

বাইরে কিন্তু হাজার ব্যাপারে, দুজনের হাজার মতভেদ।

নতুন করে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর, জওহরলাল স্থির করলেন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অফিসকে তিনি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক নিয়মতান্ত্রিকতায় গড়ে তুলবেন, আদর্শ দফতর-খানা রূপে...ধীরে ধীরে

পুরাতন সব গতানুগতিকতা, ভ্রান্ততা দূরে পরিহার করে জওহরলাল আনলেন, নতুন সব নিয়ম...নতুন সব ব্যবস্থা...বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রিতান্ত্রিকতা...

ঠিক করলেন, কংগ্রেসের সভ্যদের আর উপাধি ধরে সম্বোধন করা হবে না, অফিস্-সংক্রান্ত চিঠির আদান-প্রদানে প্রত্যেক মানুষকেই সোজা তাঁর নামেই সম্বোধন করা হবে—তা সে যিনিই হন্—

অর্থাৎ মওলানা সাহেব, মৌলভী সাহেব, পণ্ডিত, মুন্সী, শেঠ, শেখ, শ্রীযুক্ত, শ্রীযুক্তা...এই ধরণের সামাজিক সম্বোধনের জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে, শুধু নামের পর সাধারণ ভব্যতা-সূচক একটা কিছু প্রয়োগ করলেই চলবে...অর্থাৎ মহাত্মাজী না বলে, বলতে হবে সোজা গান্ধিজী...

মওলানা সাহেব তখন এলাহাবাদে ছিলেন না। তাঁর কাছে এই সংবাদ যখন পৌছল তখন তিনি তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাম করে জওহরলালকে একরকম আদেশ করে পাঠালেন, এ হতে পারে না...মহাত্মাজীকে শুধুই বলা চলবে না গান্ধীজি...

সামান্য ব্যাপার, কিন্তু এ থেকে বোঝা যায়, দুজনের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী—

আর একটী ব্যাপারে তাঁদের দুজনের মধ্যে প্রায়ই লাগতো বাদানুবাদ : সে হলো ধর্ম্ম :

সে-সম্বন্ধেও এই দুটী মানুষের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল দৃষ্টি-ভঙ্গী :

মওলানা সাহেব কংগ্রেসের সাধারণ প্রস্তাবেও, ঈশ্বরের অনুগ্রহে বা ঈশ্বরের দয়ায়, এই রকম কোন না কোন একটা ঈশ্বরৎ-কৃপা সূচক উপ-বাক্য রাখবেনই, জওহরলাল তা দেখবার মাত্র দেবেন তুলে।

চীৎকার করে উঠবেন মওলানা সাহেব,

—তুমি নাস্তিক!

দুজনে সুরু হবে তুমুল তর্ক।

শেষকালে জওহরলাল হয়ত বলেন, থাক্, এনিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই, এ-সম্বন্ধে আমরা দুজনে একমত হতে পারবো না।

কিন্তু তা শুনবেন কেন মওলানা সাহেব?

শিশুর মত সারল্যে, তিনি তাঁর বিরাট দেহ নিয়ে জওহরলালকে জড়িয়ে ধরেন, বলেন, আমি ছাড়বোনা তোমাকে···মানতেই হবে তোমাকে···শোন আমার কথা...

কিন্তু শেষপর্যন্ত হয়না কোন মীমাংসা।

মনে মনে ক্ষুব্ধ হন মওলানা সাহেব। কিছুক্ষণ কি ভাবেন, তারপর বলেন, আমি জানি, তুমি মুখে যাই বলো না কেন, অন্তরে অন্তরে তুমি ষোলো আনা বিশ্বাস করো ধর্ম্মে!

কিন্তু জওহরলালের কাছে ধর্ম্মের সংজ্ঞা স্বতন্ত্র...অন্তত রাজনীতির সঙ্গে তিনি কোনভাবেই চান না কোন ধর্ম্মকে জড়াতে···

রাজনীতির এই ধর্ম্ম-গত ব্যাখ্যার জন্যেই, তাই মহাত্মাজীর প্রিয়তম অনুচর হয়েও, তিনি মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতিকে আজও সমগ্র অন্তর দিয়ে পারেন নি গ্রহণ করতে।

(২৯)

নাভা জেল থেকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, সেই পূতিগন্ধময় অন্ধকারের দান, টাইফাস্ জীবাণু···

শুধু তিনি নন্, তাঁরা তিনজনেই...

গর্ব্ব করবার মত স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ছিল বলেই, তিনি সেই ভয়াবহ জীবাণুর আক্রমণ থেকে সে-যাত্রা আত্মরক্ষা করতে পারলেন, কিন্তু কয়দিন সব কাজ থেকে দূরে সরে, বিছানায় তাঁকে পড়ে থাকতে হলো...

সারতেও বহুদিন গেল...

রোগের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে এতদিন যা সম্ভব হয়নি, এখন সেই সুযোগ তিনি পেলেন, দূরে থেকে নিস্পৃহভাবে সমস্ত জিনিসকে দেখা... সংগ্রাম থেকে নিজেকে দূরে রেখে সংগ্রামকে অনুশীলন করা···এবং এই অনুশীলনের ফলে, তাঁর মনে জেগে ওঠে এক বিচিত্র বেদনা...কর্ম্ম ও আদর্শের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে মন...

কংগ্রেস যেখানে রাজ-তন্ত্রের সঙ্গে করছে সংগ্রাম, সেখানে সম্পূর্ণভাবে আছেন জওহরলাল···কিন্তু কংগ্রেসের আদর্শের মধ্যে, তার রাজনীতির ব্যাখ্যার মধ্যে, তার সামাজিক দর্শনের মধ্যে, জওহরলালের বিপ্লবী মন পায় না সম্পূর্ণ সাড়া···অথচ কংগ্রেস থেকে নিজেকেও পারেন না করতে বিচ্ছিন্ন...

কংগ্রেস চায়, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান করতে, যা আছে তারি মধ্যে একটু অদল-বদল করে, আপোষ-নিষ্পত্তি করতে···

জওহরলাল মনে করেন, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাই আগা-গোড়া গিয়েছে পচে, জীর্ণ পুরাতন হয়ে···তাকে শেকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে আনতে হবে নতুন সমাজ, নতুন ব্যবস্থা,—সেই নতুন জীবনের পট-ভূমিকায় আপনা থেকে এই সব সমস্যার ধূসর মলিন রঙ যাবে মিলিয়ে—

নতুবা যে-দেহ গিয়েছে মরে, যাতে আর নেই প্রাণ, কি হবে তাকে প্রসাধন করে? কি হবে ভেবে, তার পরণে থাকবে লুঙ্গি, না ধুতি? তার মাথায় থাকবে টুপি না টিকি?

কংগ্রেসের ধীরপন্থী সংস্কার-বাদের মধ্যে জওহরলাল জাগিয়ে তুলতে চান বিপ্লবের সুর...

এই ক্রমিক সংস্কার-বাদের আড়ালে লুকিয়ে আছে নানান্ সব পরস্পর বিরোধী স্বার্থ...জওহরলালের মনে হয়, এক বিরাট নীতি-বোধের আবরণে তাদের সব রাখা হয়েছে ধামা চাপা দিয়ে...

সেই আবরণ ছিন্ন করে, তাঁর প্রবুদ্ধ মন দেখতে চায়, সহজ স্পষ্টরূপে, সেই সব সমস্যার রূঢ় বাস্তব মূর্ত্তি...ভেবে পান না, একসঙ্গে কি করে, কৃষক আর জমিদারদের স্বার্থ সমানভাবে হতে পারে সংরক্ষিত—বিশ্ব-সম্পর্ক-রহিত এবং অর্থ-নীতি-বর্জ্জিত পুরাতন ধর্ম্মমূলক জাতিয়তা-বাদের বদলে আজ চাই নতুন জীবন—সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী—

সে-জীবনের ধাক্কায় হয়ত ভেঙ্গে যাবে, বহুদিনের বহু-স্মৃতিতে-মণ্ডিত অতি-প্রিয় সনাতন সব রীতি-নীতি···হয়ত ছিঁড়ে যাবে যুগ-যুগান্তের তাঁতে-বোনা সনাতন ধর্ম্মের আর নীতিবোধের জরির নানান সূক্ষ্ম কাজ···

মনে-কল্লোল জাগে তরুণ বিপ্লবীর মনে...

জগতের বৃহৎ পটভূমিকায় আজ দেখতে হবে নিজের দেশকে... আমার দেশ আজ আর তার নিজস্ব সীমা-রেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়—তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য আর দারিদ্র্য, একান্ত বাস্তবভাবে বিশ্ব-বীণার তারে ঝংকৃত হচ্ছে...দেশ-প্রেমের সংজ্ঞাই আজ তাই গিয়েছে বদলিয়ে...জগতের বৃহৎ-জীবন-ধারার সঙ্গে তার হয়ে গিয়েছে আত্মিক যোগ—আজ তাই তার সমস্যার সত্যিকারের সমাধান নির্ভর করবে, বাইরের সেই বৃহৎ জীবন-ধারার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বজায় রেখে...

কংগ্রেসের লৌকিক রাজনীতির মধ্যে জওহরলাল জাগিয়ে তোলেন, এই বিশ্ব-সংযোগের নতুন চেতনা—

ভারতবর্ষকে দেখতে হবে, ভারতবর্ষের বাইরে থেকে...

(২০)

চরম দুর্ভাগ্য নিয়ে এলো সেই সুযোগ...

বহুদিন থেকে প্রিয়তমা পত্নী রোগে ভুগছিলেন...বাড়ী ছেড়ে তাঁকে যেতে হয় হাসপাতালে—মাসের পর মাস তাঁকে কাটাতে হয় সেখানে...

শেষকালে ডাক্তাররা বল্লেন, এ-ভাবে রোগিণীকে হাসপাতালে রাখা আর চলবে না...তাঁকে নিয়ে যেতে হবে, এমন কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায়, যেখানে প্রকৃতি, তার জল-হাওয়া আর আকাশের মধ্যে আজও রেখেছে বাঁচিয়ে সঞ্জীবন-সুধা...

সুইজারল্যাণ্ড...আল্‌পের শুভ্র-তুষার-স্বচ্ছ আকাশে বাতাস যেখানে পাইনের প্রাণ-দায়ী সুবাসে ভরপুর...

কমলা এবং প্রিয় দুহিতা ইন্দিরাকে সঙ্গে নিয়ে বহুদিন পরে আবার জওহরলাল যাত্রা করলেন য়ুরোপের দিকে...

ভারতের রাজনৈতিক আবর্ত্ত থেকে ক্ষণকালের জন্যে নিজেকে এই ভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারায়, তাঁর অন্তরের সংগোপন লোকে লুকিয়ে আছে নির্জনতা-লোভী যে আর একটী মানুষ, সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো...

এতদিন পরে মন পেলো ছুটি...

(২১)

ভারতবর্ষ থেকে দূরে গিয়ে, নতুন করে তিনি দেখতে পেলেন ভারতবর্ষকে...

কংগ্রেসের ভারতবর্ষ নয়, লীগের ভারতবর্ষ নয়, হিন্দুমহা-সভার ভারতবর্ষ নয়...

দেখলেন, বিশ্বের মানচিত্রে, অনাগত দিনের ভারতবর্ষকে...নতুন আদর্শের প্রেরণায় সবুজ হয়ে উঠলো আবার কাশ্মিরী যৌবন...

তেরো বছর পরে ফিরে গিয়ে দেখলেন, আর এক নতুন য়ুরোপ...বিপ্লবের বহ্নি-জ্বালায় দ্রব-মান প্রাণ-ধারা···ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছে সযত্নে-গড়া সীমান্ত-রেখার সব বেড়া...ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ, স্বর্ণ-সিংহাসন...বাইরের এই বেড়া ভাঙ্গার সঙ্গে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছে মনের সব বেড়া ..হাজার দিনের পুরোণো অভ্যাস যাকে ভেবেছিল মানুষ তার অপরিবর্তনীয় স্বধর্ম্ম, নিমেষে নিঃশেষে কোথায় গেল হারিয়ে, নিশ্চিহ্ন হয়ে জ্বলৎ-বহ্নি-শিখায়...যাকে মনে হয়েছিল, সুদূর অসম্ভব, দিব্য সহজ মূর্ত্তিতে সে নিয়েছে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে...

আজ দেবতা রুদ্র, বহ্নি তার বাহন ..দিকে দিকে ওড়ে তার পাবক-শিখা···

(২২)

এক বৎসর ন'মাস জওহরলাল ঘুরলেন য়ুরোপের এক দেশ থেকে আর এক দেশে...

দেখলেন, জেনেভায় লীগ অফ্ নেশন্স্-এর ঐতিহাসিক গ্যালারীতে বসে, শক্তিমানের সাম্রাজ্য-বণ্টন খেলা···

বার্লিনে শুনলেন বল-দৃপ্ত, নব্য-জার্ম্মাণীর জাতিয়তার নব দর্শন, ইংলণ্ডে দেখলেন, তার দেশব্যাপী ধর্ম্মঘটের মধ্যে তার যুদ্ধ-জয়ের অসারতা,···

মস্কোতে গিয়ে দেখলেন, সোভিয়েটের দশমবার্ষিক উৎসব···বৈজ্ঞানকি গণ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ এক সম্পূর্ণ নতুন জাতি বিংশ-শতাব্দীর সর্ব-শ্রেষ্ঠ মানবিক পরীক্ষার জীবন্ত ল্যাবরেটরী ..

ব্রসেল্স্-এ গিয়ে যোগদান করলেন, জগতের নিপীড়িত জাতির কংগ্রেসে—নিপীড়িত ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ···

পরিচিত হলেন, জাভা, ইন্দোচীন, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মিশর, আরব, নিগ্রো আর চীন প্রতিনিধিদের সঙ্গে, সকলেই আজ পণবদ্ধ, উচ্ছেদ করতে সাম্রাজ্যবাদ...

দেখলেন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লীগে ইংরাজ শ্রমিক-নেতা জর্জ ল্যান্‌সব্যারীর অপূর্ব্ব প্রহসন···আন্তর্জাতিক উচ্ছ্বাসের বশে জর্জ ল্যান্‌সব্যারী এই সাম্রাজ্যবাদ নিধন-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করেন কিন্তু হঠাৎ তাঁর স্বদেশ থেকে সংবাদ এলো যে, তাঁর দল অর্থাৎ ইংলণ্ডের লেবার পার্টি, তাঁরা চলেছেন ইংলণ্ডের শাসন-ভার গ্রহণ করতে, এখন সেই দলের একজন নেতার আর চলে না আন্তর্জাতিক মুক্তির ধ্বজা তুলে ধরে সন্দিগ্ধ-চরিত্রের লোকের সঙ্গে মিশে মাতামাতি করা...সুতরাং লীগের অধিবেশনের মুখেই হঠাৎ শোনা গেল, সভাপতি জর্জ ল্যান্‌সব্যারী শারীরিক অসুস্থতার দরুণ অতি দুঃখিত অন্তরে এই দায়িত্ব-গ্রহণে অসম্মতি জানাতে বাধ্য হচ্ছেন...

ভিলেনুভের বিখ্যাত ভিলা ওল্‌গায় অতিথি হলেন জগৎ-বরেণ্য রমাঁ রোলাঁর.. সেখানে পরিচিত হলেন জগৎ-খ্যাত তরুণ জার্ম্মাণ কবি আর্ণেষ্ট টোলারের সঙ্গে···সৌভাগ্যবশত দেখা পেলেন প্রবাসী বঙ্গ-সন্তান ধনগোপালের...ক্ষণিকের পরিচয় পরিণত হয় বন্ধুত্বে···

সেই সঙ্গে তাঁদের খুঁজে বার করে দেখা করলেন, একদিন যাঁরা ভারতবর্ষকে ভালবেসে আজ ভারতবর্ষের বাইরে পলাতক জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছেন, তৈলহীন প্রদীপের মত যাঁরা নীরবে নিঃশেষে যাচ্ছেন মিলিয়ে···

—শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম্মা...বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন কিন্তু আজও নতুন লোক দেখলে, প্রথমেই তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন, তাঁর ধারণা, নতুন লোক মাত্রেই বুঝি বৃটীশের স্পাই...বৃহৎ কোটের পকেট থেকে মলিন জীর্ণ তাড়া তাড়া কাগজ বার করেন, বারো বৎসর আগে যে কাগজ

তিনি সম্পাদন করতেন···Indian Sociologist...তার জীর্ণ মলিন পাতা উলটিয়ে জওহরলালকে পড়িয়ে শোনান, বারো বৎসর আগে তিনি কি লিখেছিলেন... অর্ধ-অন্ধকার বদ্ধ ঘরের এক কোণে এক মলিন শয্যায় শুয়ে এক রুগ্ন বৃদ্ধা গুজরাটী নারী...শ্যামাজীর স্ত্রী...প্রবাসী পলাতক স্বামীর সঙ্গে হাসিমুখে যে-নারী সয়েছে সব যন্ত্রণা, সব লাঞ্ছনা, বন্ধুহীন, আত্মীয় হীন, পুত্র-কন্যাহীন দূর বিদেশে...

—রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ...দেখা হলো মস্কোর পথে...অদ্ভুত বেশ-ভূষা, অর্ধেক তিব্বতীয়ান...পায়ে ভারী রাশিয়ান্ বুট...বৃহৎ এক ওভারকোট... তাতে কত যে পকেট তার নেই ঠিক-ঠিকানা...আর সব পকেটগুলোই নানা জাতীয় কাগজে ফুলে ফেঁপে আছে...না আছে এমন জিনিস নেই সেই সব পকেটে। একদিন তিনি যে সারা জগৎ বেড়িয়েছেন ঘুরে, তার নানা নিদর্শন সব রয়েছে পকেটে পকেটে—কাইজারের নিজের স্বাক্ষরযুক্ত ফটো, জার্মাণ চ্যান্সেলারের চিঠি, তিব্বতের দালাই লামার কাছ থেকে পাওয়া একটা তুলোট-কাগজের বাণ্ডিল... নকল পাসপোর্ট...পুরোনো খবরের কাগজ...দলিল...সব...

বিস্মিত হয়ে জওহরলাল জিজ্ঞাসা করেন, এত সব কাগজ সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন কেন?

হেসে বলে ওঠেন, তা জান না বুঝি? তখন চীনে ছিলাম...রেলে যাচ্ছিলাম, সঙ্গে ছিল এক বাক্স দরকারী কাগজ-পত্র দলীল...বাস্... কি করে হারিয়ে গেল বাক্সটা...সেই সঙ্গে চিরকালের মত হারিয়ে গেল সেই সব দামী দলিল-পত্র...সেই থেকে সাবধান হয়ে গিয়েছি... দরকারি কাগজ-পত্র যা কিছু সব সঙ্গে সঙ্গেই রাখি...সেই জন্যেই তো অর্ডার দিয়ে জামায় এত গুলো পকেট করিয়েছি!

আজও তাঁর মাথায় ঘুরছে তাঁর নিজস্ব সব রাজনৈতিক মতলব... এবং সেগুলো যেসব অভ্রান্ত তা তিনি একান্ত ভাবে বিশ্বাস করেন...

মৌলভী ওবায়দুল্লাহ্...ইতালীতে দেখা তাঁর সঙ্গে। বহুদিনের চেষ্টায় তিনি একটা স্কীম তৈরী করেছেন, কি করে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন হতে পারে...জওহরলালকে পড়িয়ে শোনান্... স্কীমের নাম্ United Republics of India...গল্প করেন ইতালুলে বসে বসে তিনি কি করে চেষ্টা করেছিলেন, ভারতবর্ষকে সাহায্য করতে...

চম্পকরমণ পিল্লাই...দেখা হয় বার্লিনে, যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড থেকে পালিয়ে জার্ম্মাণীতে চলে যান...এবং সেইখানেই বসবাস [illegible] জার্ম্মাণ জাতীয়-আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে দিয়েছেন মিশিয়ে...তাই নাৎসীমহলে তাঁর আছে কিছু প্রতিপত্তি

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—এঁর সঙ্গেও বার্লিনে দেখা ;—স্বনামধন্য অঘোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র...সরোজিনী নাইডুর [illegible]... বার্লিনের এক হোটেলে পড়ে আছেন.. জামা-কাপড় ময়লা, ছেঁড়া... কোনদিন দুবেলা আহার জোটে ..কোনদিন একবেলা...কিন্তু হাসি লেগে আছে মুখে...মাঝে মাঝে মন কেঁদে ওঠে ফিরে যেতে ভারতবর্ষে... কিন্তু তারপরই মনে হয়...সে যেন বহুদূরে...যেন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে তার মাতৃ-আকর্ষণ...কিন্তু তবু অন্তর থেকে যায়নি হাহাকার...

য়ুরোপের আন্তর্জাতিক তপ্ত হাওয়ায় জওহরলাল যেন নতুন জীবনের মেয়াদ নিয়ে ফিরলেন ভারতবর্ষে।

(২৩)

ভারতবর্ষে ফিরে এসেই, তিনি ঠিক করলেন, কংগ্রেসের মূল আদর্শের প্রস্তাবকে আর কথার গোলক-ধাঁধার মধ্যে না রেখে, স্পষ্ট সহজ মূর্ত্তি দিতে হবে। সহজ ভাষায় বলতে হবে, কংগ্রেসের আদর্শ হলো, বৃটীশ সম্পর্ক-রহিত পূর্ণ স্বাধীনতা...

ইংলণ্ড তখন পাঠিয়েছে, সাইমন কমিশনকে, উত্তেজিত ভারতকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে···

কমিশন যেখানেই যান, কৃষ্ণ-পতাকা করে তাকে অভিনন্দন···

পাঞ্জাবে লালা লজপৎ রায় সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা বার করলেন···শান্ত নিরুপদ্রব জনতা···

পুলিশ উদ্যত বেয়নেট নিয়ে করলো আক্রমণ···

লালাজীর বুকে সোজা করলো বেয়নেটের আঘাত একজন তরুণ ইংরেজ পুলিস অফিসার···

সে-আঘাত বুকে নিয়ে লালাজী পৃথিবী থেকে নিলেন বিদায়...

কাণপুরে বেরুলো শোভাযাত্রা···

তার সামনে, জওহরলাল...আর গোবিন্দ বল্লভ পন্থ...

সেদিন পুলিশ দেখালো তাদের বিক্রম...সেই পুলিশের লাঠীর সঙ্গে জওহরলালের প্রথম পরিচয় :

দল বেঁধে রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা চলেছে.. এমন সময় দেখেন, শোভাযাত্রাকে দুভাগে ভাগ করে দিয়ে, তিন দল অশ্বারোহী পুলিশ ছুটে আসছে...

দেখতে দেখতে নিরীহ জনতাকে মাড়িয়ে চলে যেন অশ্বারোহীর দল ..

জওহরলাল দেখেন, রাস্তার মাঝখানে তিনি দাঁড়িয়ে একা··· আশে-পাশে পুলিশের লোক নির্দয় ভাবে তখন প্রহার করছে স্বেচ্ছা-সেবকদের···

এক মুহূর্ত্তের জন্যে মনে হলো...আত্মরক্ষার কথা···

পরমুহূর্ত্তেই দেখেন, তাঁর দুপাশে দুজন অশ্বারোহী···তাঁর দিকে ব্যাটন তুলে তাঁকে শাসাচ্ছে···

তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেল্লেন, কি করবেন···

গম্ভীর ভাবে তাদের সম্বোধন করে বল্লেন, Go ahead !

উত্তরে তাঁর মাথায় আর পিঠে সজোরে এসে পড়লো আঘাত···

সমস্ত দেহ যেন অবশ হয়ে পড়ে যাবার মতো হলো···কিন্তু তবু তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন···দেখলেন, কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র...আর নেই সে-চেতনা...

কিন্তু আসল অভিনয় ছিল পরের দিন···কারণ সেই-দিনই সাইমন কমিশনের আসবার কথা...

শোভাযাত্রা ষ্টেশনের পথ ধরতেই সুরু হলো আক্রমণ...

—তারপর সুরু হলো প্রহার···একদিকে অশ্বারোহী ইংরেজ পুলিস ব্যাটন নিয়ে···আর একদিকে পদাতিক দেশী পুলিশ লাঠি নিয়ে...

প্রহারে প্রহারে জওহরলাল জর্জ্জরিত হয়ে পড়লেন, সারা অঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে...

শুধু একমাত্র চিন্তা, যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে···মৃত্যু ছাড়া সেখান থেকে কেউ পারবে না সরাতে···

অবিরাম চলে লাঠি আর ব্যাটন···

একবার মনে করলেন, এই মুহূর্ত্তে, ভুলে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর আদেশ, কংগ্রেস-ক্রীড্, লাফিয়ে পড়ি ঘোড়-সওয়ারের ওপর, ছিনিয়ে নিই তার কাছ থেকে ঘোড়া···তারপর···

কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে মনে হলো, এই ক্ষণিক রাগেরও ওপরে উঠতে হবে···দেহের আঘাত কেন উত্তেজিত করবে মনকে···সত্যাগ্রহী, তুমি যে সর্ব-আঘাত-সহ!

ক্ষত-বিক্ষত-দেহে সেদিন রাত্রিতে শয্যায় শুয়ে জওহরলাল ভাবেন, কিন্তু...ততঃ কিম্? এতেই বা কি হবে?

সৎকার

(সুবিখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক প্রেমচন্দের মূল হিন্দী হইতে)

অনুবাদক—শ্রীনরেশচন্দ্র পাল

[সৌভাগ্যের বিষয়, অনুবাদ-সাহিত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি রহিয়াছে। কিন্তু বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে আজ প্রয়োজন, সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্য হইতে বঙ্গানুবাদ। আমরা নরওয়ের সাহিত্যের খবর যতখানি জানি, তাহার অপেক্ষা বিরল জানি আমাদের প্রতিবেশী ভারতীয় সাহিত্যের সংবাদ। ইহা বর্ত্তমান বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে লজ্জার কারণ। বাংলা ভাষায় উর্দ্দু, হিন্দী বা হিন্দুস্থানী, গুজরাটী প্রভৃতি সমসাময়িক সাহিত্য হইতে অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয়। ভাষার মধ্য দিয়া পরস্পরের যেটুকু পরিচয় আজকের যুগে করা সম্ভব এবং কর্ত্তব্য, তাহাও আমরা করি নাই। সেইজন্য গল্পভারতী বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছে, সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্যের পরিচয়, অনুবাদের মধ্য দিয়া, বাঙালী পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে।]

(১)

নিস্তব্ধ শীতের রাত্রি। জীবন-মুখর গ্রামখানি যেন অন্ধকারের অতলে নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কুঁড়েঘরের সামনে পিতাপুত্র মুখোমুখি বসিয়া আগুন পোহাইতেছিল। খড়কুটা লতাপাতার আগুন কতক্ষণ থাকে। পাতা ফুরাইয়া আসিল, আগুনও নিভিয়া গেল। আবার সেই হাড়-কাঁপানো শীত। কিন্তু শীতের কাঁপুনি অপেক্ষা অধিক মর্ম্মভেদী, বুধিয়ার কাতরানি। প্রসব-বেদনায় বুধিয়া ভিতরে আছাড়ি-

পিছাড়ি খাইতেছে। এক-একবার এমন চীৎকার করিয়া উঠে যে শ্রোতা দুইজনের হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হইয়া যায়।

যীশু বলিল: মনে হচ্ছে বাঁচবেনা। কালও সারাদিন বেচারী আমাদেরই জন্য দৌড়াদৌড়ি করেছে। যা যা, একবার ভেতরে গিয়ে দেখে আয়!

মাধব দাঁতমুখ খিঁচাইয়া জবাব দিল: মরবি ত তাড়াতাড়ি মর! চেঁচামেচির হাট বসিয়েছে! দেখে করব কি?

যীশু: তুই দেখছি একেবারে জানোয়ারের অধম হয়ে গেছিস, পাষণ্ড কোথাকার, পুরো একটি বছর মেহনত-মজুরী করে তোর পিণ্ডি জুটিয়েছে বেচারী—এখন চোখের দেখা দেখতেও নবাব-পুত্তুরের কষ্ট হচ্ছে। একেবারে ডাহা নিমকহারাম!

মাধব কাতর হইয়া বলিল: ওর ছটফটানি চোখে দেখতে পারিনে বাবা! এর চেয়ে যে মরে গেলে শান্তি।

জাতিতে চামার। সমস্ত গ্রামে ইহাদের বদনাম। মাধব এমন কাজচোর যে আধঘণ্টা কোথাও যদি খাটে তো তারপর একঘণ্টা ঠায় বসিয়া তামাক টানিতে থাকে। গ্রামে কাজের অভাব নাই কিন্তু এমন জন্ম-কুড়েকে কাজ দিবে কে? আর কাজের জন্য ইহারও যে বিশেষ চেষ্টা আছে তাহা বলা যায় না। কেহ কোথাও যদি কোন কারণে অন্য মজুর না পাইয়া দায়ে পড়িয়া মাধবকে একদিন কাজে লাগাইত, তারপর তিনদিন কেহ তাহাকে ঘর হইতে নড়াইতে পারিতনা। দুএকদিন উপবাস করিলে তবে টনক নড়িত। যীশু এদিক-ওদিক হইতে একবোঝা কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিত; মাধব বাজারে লইয়া গিয়া বেচিয়া আসিত। তারপর আবার বাপ-বেটা হাত-পা গুটাইয়া, ঠায় বসিয়া থাকিত। ধৈর্য্যে উভয়ে একেবারে যেন পরমহংস হইয়াই জন্মিয়াছে; বহু জন্ম সাধনা না করিলে এমন নিশ্চল নির্লিপ্ত

ভাব জন্মায় না। ঘরে দুচারটি মাটীর হাঁড়িকুঁড়ি ছাড়া কোন বাসন-বর্তন নাই। পরণে শতছিন্ন মলিন গাঁট দেওয়া কাপড়। কাকুতিমিনতি করিয়া গ্রামের সকলের কাছ হইতেই সুবিধা মত দু বার টাকা কর্জ লইয়াছে। উত্তমর্ণগণকে হস্ত ও বচন প্রহারে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। ইহজন্মে ইহাদের চিৎহস্ত আর উপুড় হইবার সম্ভাবনা নাই। গাল খাইয়া মার খাইয়া ইহাদের মনে কোন বিকার উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। মুখে রা নাই, চোখ-মুখে দীনতা ঝরিয়া পড়িতেছে, সর্বদাই জোড় হস্ত। দেখিয়া লোকদের দয়া হইত। প্রাপ্তির আশা না থাকিলেও কালে-ভদ্রে দুচার পয়সা উহাদের দিত। গ্রামের কৃষকদের মটর, আলু প্রভৃতির চাষ হইলে ইহারা ফসলের সময় না বলিয়াই কিছু কিছু উঠাইয়া আনিত—কখন আখ, কখন আনিয়া তৃপ্তমুখে চিবাইতে থাকিত। ফসলের সময় এইভাবে পাঁচ সাত দশদিন মহানন্দে কাটিয়া যায়। কিন্তু ফসল ত সারা বৎসর ক্ষেতে লাগিয়া থাকেনা। তখন আবার একটু-আধটু চেষ্টাচরিত্র না করিলে অনাহারে মারা পড়িতে হয়। সুতরাং কষ্টে-সৃষ্টে মাঝে মাঝে হাত পা নাড়িতে হয় বই কি।

যীশুর এইরকম উঞ্ছবৃত্তি করিয়াই ষাট বৎসর পার হইয়াছে, সুপুত্র মাধব বাপের পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে আরও এককাঠি উপরে পৌঁছাইয়া বাপের নাম আরও বেশী উজ্জ্বল করিতেছে। এই মুহূর্তে বাপবেটা দুজনে আগুন পোহাইতেছিল ও সঙ্গে সঙ্গে না-বলিয়া-আনা আলু পোড়াইতেছিল। মাধবের মার দেহান্ত অনেক কাল হইয়াছে। গত বৎসর বিবাহ করিয়া সে বউ আনিয়াছে। বউ ঘরে পা দিয়াই চালচুলাহীন গৃহস্থালীতে কিঞ্চিৎ সুব্যবস্থা আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রতিবেশীর গম পিষিয়া, ঘাস কাটিয়া, বাসন মাজিয়া বুধিয়া দিনান্তে সেও খানেক আটা সংগ্রহ করিয়া আনিত। আর নিত্য পরমনিষ্কর্মা

স্বামী-শ্বশুরের শূন্য উদরে পিণ্ড যোগাইত। বুধিয়ার অভ্যুদয় কাল হইতে তাহারা আরও বেশী কুঁড়ে হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মেজাজের পারাও দুএক ডিগ্রী চড়িয়া গেল। দায়ে ঠেকিয়া কেহ কাজের জন্য ডাকিতে আসিলে দ্বিগুণ মজুরী হাঁকিয়া বসে।···

সেই অন্নদায়িনী উদয়াস্ত পরিশ্রমশীলা বুধিয়া এখন প্রসব-বেদনায় মরণোন্মুখ। ঘরের বাহিরে পিতা-পুত্রে বসিয়া বচসা করিতেছে। তাহাদের মুখ দেখিয়া মনে হয় বুধিয়ার যন্ত্রণা অপেক্ষা সাহেবের ঘুমের ব্যাঘাতই অধিক কষ্টদায়ক হইতেছে। এস্‌পার উস্‌পার একটা কিছু হইয়া গেলে আরামে ঘুমানো যায়।

বীসু ছাইয়ের নিচে হইতে আলু বাহির করিতে করিতে বলিল: ভেতরে গিয়ে একটু দেখেই আয়না বাপু। কোন অপদেবতা ভর করছে বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা গেরো! ওঝা ডাকলেই তো একটাকা চেয়ে বসবে। বলিয়া মুখ বিকৃত করিল।

মাধবের আশঙ্কা—কুঁড়ের মধ্যে গেলেই বাবা আলুর বেশীর ভাগ অমনি উদরে চালান করিবে। জবাব দিল: আমার ত ওখানে যেতে ভয় করে।

—ভয় কিসের? আমি ত এখানে রয়েছি।

—তুমি নিজেই যাও না কেন?

—তোর মা যখন মারা গেল, তিনদিন আমি তার পাশ থেকে নড়িনি! আর তোর এই ব্যাভার। আমি যে যাব, আমাকে দেখে লজ্জা পাবে, কি পাবেনা? আজ পর্য্যন্ত যার মুখ দেখলুম না, এখন তার এ অবস্থায় যাই কি করে? তবু যা হোক্ হাত পা ছড়ে যে আরামটুকু পাচ্ছে, আমাকে দেখলে তাও আর পাবেনা।

—আমি ভাবছি ছেলেপিলে কিছু যদি হয়ে থাকে, তবে তো আর

নতুন ফ্যাসাদে পড়তে হবে। শুঁট চাই, গুড় চাই, তেল চাই। ঘরে ত যাকে বলে লবডঙ্কা—ঠনঠন হাড়ির অবস্থা।

—ভাবিসনি মেধো, সব এসে পড়বে। ভগবান দেবে। যারা আজ এক পয়সা দিচ্ছেনা, তারা কাল ডেকে যেচে টাকা দেবে। আমার ন' নটি ছেলে হয়েছে। ঘরে চিরকালই এমনি হাঁড়ি কাটতো কিন্তু প্রতিবারই ঐ উপরিওয়ালা কোন না কোন উপায়ে দায় উদ্ধার করেছে।

যে সমাজ-ব্যবস্থায় রাত্রিদিন পরিশ্রমকারীর অবস্থাও মাধব-বীসুর দৈন্যদশা হইতে খুব বেশী ভাল নয়, যেখানে চতুর ফাঁকিবাজ গাঁতিদার কৃষকের পরিশ্রমলব্ধ ধনের বারআনা বিনা মেহনতে আত্মসাৎ করিয়া লয়, সেখানে এই নিরুপায় অদৃষ্টনির্ভরতা যে নিরাশ লোকের মনে আধিপত্য করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি। বীসু বরং ভালই আছে, পরিশ্রমও করেনা, বঞ্চিতও হয়না। কিছুমাত্র না খাটিয়া যাহারা পরস্ব ভোগ করে সে তাহাদেরই একজন। তবে পার্থক্য এই যে, বুদ্ধি বিদ্যা গায়ের জোর নাই; চালাক চতুর নহে; তাই বলিয়াই মাথা উঁচু করিয়া চোখ রাঙাইয়া চুরি করিতে পারেনা। ফলে পরগাছাদের মধ্যে সে দীনতম। যেখানে তাহার সহধর্মীরা গ্রামের মুখিয়া, জমিদার পত্তনিদার হইয়া আছে, সেখানে সে উপহাস ও করুণার পাত্র। তবু ভাব যে প্রাণান্ত পরিশ্রম ত করিতে হয়না, কেহ তাহার পরিশ্রম-ফল কাড়িয়াও লইতে পারে না। সেই সান্ত্বনা।

আলু বাহির করিয়া ছাই ছাড়াইয়া উভয়ে আহারে প্রবৃত্ত হইল। বুধিয়া সকাল হইতে অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে। পিতাপুত্রের পিণ্ড ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। ক্ষুধার তাড়না এমন যে বিলম্ব সহেনা। গরম আলু চিবাইতে গিয়া জিহ্বা জ্বলিয়া গেল। খোসা ছাঁড়াইলে আলুর বাইরের দিকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসে কিন্তু ভিতরে

তখনও খুব গরম। তাড়াতাড়ি মুখে পুরিলে মুখের দুর্দশা অনিবার্য। সুতরাং উভয়ে আলু মুখে পুরিয়াই না চিবাইয়া গিলিতে লাগিল। একবার জঠরে পৌঁছিয়া গেলেই হয়—সেখানে অগ্নিসমান তপ্ত বস্তুকেও ক্ষণমাত্র ঠাণ্ডা করিবার কলকব্জার অভাব নাই। গোটা গোটা আলু গিলিতে গিয়া চক্ষে জল আসিয়া পড়িল।

ধারা-চিহ্নিত মুখে আলু গিলিতে গিলিতে যীশুর বিশবৎসরের আগের-কথা স্মরণ হইতে লাগিল। ঠাকুরদের বাড়ীর বিবাহে কি খাওয়ানটাই খাওয়াইয়াছিল! বলিল: সেবারকার কথা সারা জীবনে ভুলিনি! এর পর আর ভরপেট খাওয়াই কোথাও জুটলনা। কন্যাপক্ষেরা সকলকে পেট ভরে হালুয়া পুরী খাওয়ালে। কেউ বাদ যায়নি। ছোটবড় সকলে পুরী, কচুরী খেল, আর সেসব একেবারে খাঁটী ঘিয়ের। চাটনী, রায়তা, চার রকমের তরকারী, দই মিঠাই, আরো এমনি কত! ঢালা হুকুম—যত পার খাও। যা চাও পাবে। সকলে যা খেলে, তার আর কি বলব। কেউ আর জল খায়না, পাছে পেটে জায়গা জুড়ে যায়। পরিবেশনকারীরা কেবল দিয়েই যাচ্ছে, মানা করলেও শোনেনা। খাওয়ার পর আবার পান এলাচীও দিলে। কিন্তু পান খাবে কে! গলা পর্যন্ত এসে ঠেকেছে, দাঁড়াতে পারছিনে। বাড়ী এসেই শুয়ে পড়লুম, এমন আরামের ঘুম এলো যে কি বলব। এখন আধপেটা খেয়ে শুই; ক্ষিধেয় ঘুম ভেঙ্গে যায়।

মাধব বর্ণনা শুনিতে শুনিতে জিভ চাটিয়া বিষণ্ণকণ্ঠে বলিল: এখন আর কি তেমন লোক আছে যে খাওয়াবে।

যীশু উদাসস্বরে জবাব দিল: সেই যুগ কি আর আছে বাবা। সে সব সোনার মানুষ আর হয়না। এখন সব ব্যাটাদের টাকা জমাবার নেশায় ধরেছে। হাড়কেপন সব, একপয়সা ফালতু খরচ করবে না। 'কিরিয়া করম' পালপার্বন সব উঠেই গেল।

—তুমি বোধহয় কুড়িখানেক পুরী উড়িয়েছিলে?

—বলিসকি মেধো? মোটে কুড়িখানা? অনেক বেশী—অনেকের উপর বেশ একটু মুখটান দিয়া আধিক্য বুঝাইতে হইল।

—আমি পঞ্চাশ খানা খেয়ে তবে উঠতাম।

—তুই কি ভাবছিস্ আমি তার কম খেয়েছিলাম? জোয়ান বয়সে কামি দেহে তোর দুগুণো ছিলাম। তুই আমার সমান কি খাবি মেধো। আমার অর্দ্ধেক শরীরও নয় তোর।

আলু খাইয়া দুজনে সেই নির্বাপিত-প্রায় ধূনির পাশে ময়লা কাপড়ের একাংশ পাতিয়া শুইয়া পড়িল। বুধিয়ার কাতরানি তখন একটু ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। বাপ-বেটার এবার আরামে ঘুমাইয়া পড়িবার বাধা নাই।

(২)

সকালে উঠিতে একটু বেলা হইয়া গেল। মাধব ভিতরে গিয়া দেখিল, বুধিয়ার শরীর ঠাণ্ডা। মুখে মাছি ভনভন করিতেছে। চোখ কপালে। সারা শরীর ধূলায় আচ্ছন্ন। ছটফট করিতে করিতে অনবরত মাটিতে গড়াইয়াছে—মাটীতে তাহারই চিহ্ন। প্রসব হয় নাই। ছেলে পেটেই মরিয়া গিয়াছে।

মাধব দৌড়িয়া ঘীসুর নিকট আসিল। দুজনে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে নিয়মমাফিক শোক প্রচারের জন্য মড়া-কান্না জুড়িয়া দিল। প্রতিবেশীরা একেএকে জুটিতে লাগিল এবং প্রাচীন প্রথানুসারে শোকে সান্ত্বনা দিতে সুরু করিল।

ইনাইয়া-বিনাইয়া কাঁদিবার জুতসই ফুর্সৎ নাই। এখনি শবের আচ্ছাদন-বস্ত্র ও সৎকারের জন্য কাঠ জোগাড় করিতে হইবে। বলাবাহুল্য ঘরে এক কাণাকড়িও নাই।

পিতাপুত্র হায়হায় করিতে করিতে গ্রামের জমিদারের নিকট পৌঁছিল। জমিদার ইহাদিগকে দুচোখে দেখিতে পারিত না। জমিদার কেন, ইহারা অনেকেরই চক্ষুশূল ছিল। ছিঁচকে চুরির অপরাধে, কথা দিয়া ও আগাম লইয়া মজুরি করিতে না আসার অপরাধে, জমিদারের হাতে উভয়ে একাধিকবার প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে। চেঁচামেচিতে বিরক্ত হইয়া জমিদার জিজ্ঞাসা করিলেন—হল কি তোদের? দুবছর পরে এলেন ত বাড়ী মাথায় করে তুলছেন! আমি ত ভাবছিলাম, তোরা আর এখানে নেই, আপদ গেছে।

ঘীস্থ ভূমিতে মাথা নোয়াইয়া স্বভাবসিদ্ধ দীনতার সঙ্গে বলিল, "সরকার, বড় বিপদে পড়ে এসেছি। মাধবের বৌটা কাল রাতে মারা গেল। রাতভর ছটফট করছিল হুজুর। আমরা বাপবেটা দুজন রাতভোর দুচোখের পাতা এক করিনি; ঠায় জেগে-বসেছিলাম ওর পাশে। ওষুদপত্তর যা পেরেছি করেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না, মালিক। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল, ঘর উজাড় হয়ে গেল। এখন কাঠ চাই, কাপড় চাই। আমাদের যা কিছু ছিল, চিকিচ্ছে করাতে সব গিয়েছে হুজুর। এখন আপনি দয়া না করলে আর গতি নেই। আর কার দরজায় যাব! ইত্যাদি···

জমিদার দয়ালু-প্রকৃতির লোক ছিলেন। বারবার প্রতারিত হইবার ফলে যদিচ তাহাদের প্রতি বিশ্বাস একেবারে নষ্ট হইয়াছিল, তবুও মৃত্যুর কথা যে বানাইয়া বলিবে এমন হইতে পারে না। আর এদের অবস্থা তাঁহার অজানা ছিল না—যদিও ঐ দারিদ্র্যের জন্য তাহাদিগকেই দোষী করিতেন। একবার ইচ্ছা হইল, তাড়াইয়া দেন। প্রয়োজনের সময় কোনকালে এদের ডাকিয়া পাওয়া যায় না। আজ নিজের গরজ পড়িয়াছে, ত আসিয়া কান্নাকাটির হাট বসাইয়াছে। কিন্তু একি দণ্ড দিবার

সময়! ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে দুটীটাকা তাহাদের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

জমিদার দিয়াছেন, সুতরাং আর কেহ প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস করিল না,—কেহ দুআনা কেহ চার আনা দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে পুরা পাচটাকা নগদ-নারায়ণ ট্যাকস্থ হইয়া গেল। কেহ কেহ ধান, গম দিল; আবার কিছু কাঠও যোগাড় হইল। দুপুরে পিতাপুত্র শবাচ্ছাদন বস্ত্র কিনিতে বাজারে বাহির হইল। প্রতিবেশী আত্মীয়, কুটুম্বগণ কাঠ ও বাঁশ কাটিতে ব্যাপৃত হইল। মেয়েরা আসিয়া বুধিয়ার শবদেহ ঘিরিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল।

(৩)

বাজারে পৌছিয়া বীরু বলিল: কাঠ তো অনেক হয়েই গিয়েছে। কি বলিস্ মঙ্গুয়া?

—হাঁ, কাঠ তো মিলেছে। এবার কাপড় হলেই হয়।

—তাহলে চল, হালকা দেখে সস্তায় একখানা কিনে নিই।

—তা নাত কি! চিন্তা তুলতে তুলতে রাত হয়ে যাবে। রাতে কে আর দেখতে আসবে কাপড় ভাল কি মন্দ?

—ভেবে দেখ, কি বিচ্ছিরী রেওয়াজ। বেঁচে যতদিন ছিল, তখন ঢাকবার মতন ছেঁড়া ন্যাকড়াও জোটেনি। এখন অক্কা পেল ত নতুন বস্তর চাই।

—কাপড় ত লাসের সঙ্গে সঙ্গে জলেই যাবে।

—তা নাত কি আর থেকে যাবে? এই পাঁচটি টাকা যদি আগে পেতাম দুফোঁটা ওষুধ পেটে পড়তে পারত।

এইভাবে একে অন্যের মনোভাব আঁচ করিতেছিল। উভয়ের

মৌন যুগ্ম-সম্মতি অনুসারেই যেন বাজারে ঘোরাফেরা আরম্ভ হইয়া গেল। একদোকান হইতে অন্য দোকান, এক গলি হইতে অন্য গলি। সূতী, রেশমী কতরকমের কাপড় উহারা দরদস্তুর করিল কিন্তু পছন্দ হয়না। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন দুজনেই এক দৈবপ্রেরণাবশে মদের দোকানের সামনে পৌছিয়া গেল। কোনকিছু জিজ্ঞাসাবাদ নাই, যেন সব আগে হইতেই স্থির ছিল। এইভাবে বাপবেটা দুজনে ভিতরে পৌছিয়া, কিছুক্ষণ অব্যবস্থিত চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ঘীসু আড্ডাধারীর গদীর সামনে গিয়া বলিল—সাউজী, আমাদেরও এক বোতল দিতে আজ্ঞা হোক।

তারপর চাট আসিল,—চাল ভাজা, মাছ ভাজা। দুজনে নীরবে পান ও চর্বণ করিয়া খাইতে লাগিল। বারুণীদেবী কিছুক্ষণ পরে ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। তখন দুজনেরই মুখ খুলিয়া গেল।

ঘীসু আরম্ভ করিল: কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলে কি আর স্বর্গ লাভ হত? একমিনিটে জ্বলে ছাই! বউয়ের সঙ্গে ত যেতনা।

মাধব ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া যেন ইষ্টসাক্ষী করিতে করিতে বলিল: দুনিয়ার এই নিয়ম। না হলে লোক ব্রাহ্মণদের হাজার হাজার টাকা কেন দেয়? কেউ কি আর দেখছে, দানপুণ্যের ফলে পরলোকে কিছু মিলে কি না?

—বড়লোকের টাকা আছে—তারা যত খুশী উড়াক না। আমাদের··· আমাদের আছে কী!

তখনও চেতনা আছে। মাধব বলে:

—কিন্তু লোকের কাছে কি জবাবদিহী করবে? সকলে যে জিজ্ঞেস করবে, কাপড় কি হল?

ঘীসুর সুরা-বিকশিত অধরে মৃদুহাসি খেলিয়া গেল: বোলে দেব টাকা হারিয়ে গেছে, টাক থেকে, সুড়ৎ করে কোথায় পড়ে গেছে।

অনেক খুঁজলুম, পাওয়া গেলনা। তাইতো এতো দেরী হলো···কেউ বিশ্বাস করবেনা—এটা ঠিক। কিন্তু দেখিস্, টাকা ওরাই আবার দেবে। গ্রামে কি লাশ পড়ে থাকবে মনে করিস ?

মাধবের মন এবার সুরায় ভিজিয়া উঠিতে লাগিল। বলিল: বুধিয়া ছিল বড় ভাল মেয়ে। খেটেখুটে এতদিন খাওয়ালে, মরলো ত, আমাদের আর একবার ভাল করে খাবার পথ করে মরল।

বোতলের অর্দ্ধেক ততক্ষণে কাবার হইয়াছে। যীশু দু'সের পুরী আনিল। তার সঙ্গে সামনের দোকান হইতে চাটনি আচার ও মিঠার মেটুলি। তদ্গতচিত্তে দুজনে পানভোজনে ব্যাপৃত হইল—যেন কোন ভাবনা-চিন্তা, ভয়-অনুতাপ নাই।

সহসা যীশুর মধ্যে সাধু বাবাজী জাগিয়া উঠিল। বলিল: ভেবে দেখ্, আমাদের মন যদি খুসী হয়, বুধিয়ার কি তাতে সদ্গতি হবে না ?

মাধব শ্রদ্ধাভরে শির ঝুকাইয়া তৎক্ষণাৎ সায় দিল: নিশ্চয়, নিশ্চয়, তা আর বলতে। ভগবান, তুমি ত অন্তর্যামী। বেচারীকে বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দিয়ো। আমরা দুজন অন্তর থেকে আশীর্বাদ দিচ্ছি: বুধিয়ার কল্যাণ হোক। মরে আমাদের যা খাইয়ে গেল, বেঁচে থাকলে তা পারতনা। জীবনে তারি এমন খাইনি।

বলিয়া একসঙ্গে তিন খানা মেটুলি মুখে পুরিল। যীশু রুষ্ট শঙ্কিত নেত্রে, নিজের প্লেট একটু তফাতে সরাইল। কিছুক্ষণ পরে মাধবের মনে এক সংশয় উপস্থিত হইল।

: বাবা, আমরাও ত একদিন ওখানে যাবো ?

যীশু অতসব ভাবিতে চায়না। বেশী ভাবিলে নেশা ছুটিয়া যায়। কিন্তু মাধব দমিবার পাত্র নয়।

বাবা, ওখানে দেখা হলে যদি বুধিয়া জিজ্ঞেস করে, আমাকে কাপড় কেন দাওনি, তবে কি জবাব দেবে?

যীশু ঝাঁকাইয়া উঠিল: জবাব তোর মাথা। বকবক বকবক করেই যাচ্ছে। দুশ্‌মন কোথাকার!

মাধব কিন্তু নাছোড়বান্দা। জিজ্ঞেস করবেই! বা ও মা···

যীশু এবার সান্ত্বনা দিবার ভঙ্গিতে কহিল: কি করে জানলি যে ও কাপড় পাবেনা? আমাকে কি এমনি গাধা পেয়েছিস? ষাট বছর কি ঘাস কেটেই এলুম? তোকে বলছি, ওর কাপড় হবেই; আর, ভাল কাপড়ই হবে।

কিন্তু মাধবের বিশ্বাস হয়না। জেদ ধরিয়া বসিল: কে দেবে শুনি? টাকা ত সব তুমি উড়িয়েই দিলে···বলিয়া একসঙ্গে তুড়ি দিবার ও পাখী উড়িবার মুদ্রা দেখাইল। তারপর বলিল—আর জিজ্ঞেস করবে ত আমাকে। আমিই ত ওর মাথায় সিঁদুর পরিয়েছিলাম। তুমি ত অমনি খালাস। তোমার কি। বলিয়া মাধব চিন্তার ভারে মাথা নোয়াইল।

যীশুর মেজাজ আবার বিগড়াইয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া বলিল: হারামজাদা, আমি বলছি কাপড় ও পাবেই, ফের তুই বলিস পাবেনা?

ক্রোধ শান্ত করিবার জন্য একমুঠা চানা চিবাইতে হইল। মেটুলি আর ছিলনা। আঁধার ঘনাইতেছে; ক্রমে আড্ডা উন্মাদের মেলায় পরিণত হইতেছে। কেহ কাঠ-ফাটা গলায় গান ধরিয়াছে, কেহ দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত মুখ নাড়িয়া বক্তৃতা দিতেছে। কেহ সঙ্গীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে প্রেমনিবেদন করিতেছে এবং প্রেমের প্রমাণস্বরূপ মদের গেলাস প্রেমাস্পদের মুখে তুলিয়া ধরিতেছে।

সেখানকার হাওয়ায় নেশা-ধরা সেই সব অপ্রকৃতিস্থ মানুষ দেখিতে দেখিতে যেন সুস্থ লোকেরও মাথার মধ্যে ঊনপঞ্চাশ পবন নৃত্য করিতে থাকে। কেহ কেহ দুই এক চুমুক পান করিয়াই পুরাদস্তর মাতাল। মধুশালা—জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি এক বিচিত্র জায়গা··· অবস্থা—জীবন-মৃত্যুর মিশ্রণ।

ঘাসুর চীৎকারে সকলের দৃষ্টি উহাদের উপর আকৃষ্ট হইয়াছিল। শতচক্ষুর সম্মিলিত দৃষ্টিতে যেন যাদু আছে। পিতাপুত্র আবার শান্ত হইয়া বারুণী পান করিতে লাগিল। বোতলবাহিনী ক্ষীণধারা হইয়া আসিতে আসিতে শেষকালে উভয়ের উদর-সাগর-সঙ্গমে বিলুপ্ত হইয়া গেলেন।

পেট ভরিয়া খাইবার পরে পুরীর যা কিছু অবশিষ্ট রহিল, মাধব পাতা সমেত তাহা উঠাইয়া, রাস্তার ধারে সতৃষ্ণনয়নে-অপেক্ষমান এক ভিখারীকে দিয়া দিল। আজ তাহারা শুধু নিজেই তৃপ্ত হয় নাই, অন্যকে আনন্দের ভাগ দিয়া প্রথমবার দানের পুণ্য অর্জ্জন করিল।

ঘাসু পুরী দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বক্তৃতাও দিল। "খুব খা বাওয়া, আর পেট ভরে আশীর্ব্বাদ কর। টাকা যে কামালে, সেতো আর নেই কিন্তু তোর আশীর্ব্বাদ একেবারে মোক্ষস্থানে ওখানে পৌঁছে যাবে—বলিয়া উপরের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিল। তারপরে এক 'পুনশ্চ' জুড়িয়া দিল—ভারী মেহনতের কামাই বাওয়া।

মাধব অনেকক্ষণ হইতেই আকাশের দিকে তাকাইবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু মাথা ঝুকিয়া পড়িয়া যায়। অবাধ্য শিরকে জোর ঝাঁকুনি দিয়া ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া কহিল: 'ও নিশ্চয় বৈকুণ্ঠে যাবে, এ নির্ঘাৎ বলে দিলাম। বৈকুণ্ঠে রাণী হবে।

এবার মাধবের সঙ্গে যীশুর পুরামতো মিল হইল। সোল্লাসে বলিতে লাগিল: হাঁ বেটা, বৈকুণ্ঠে ত যাবেই। তার আর কথা কি। কাউকে কষ্ট দেয়নি, কাউকে ঠকায়নি। মরণের পরেও আমাদের এতদিনের অতৃপ্ত ইচ্ছা পুরো করে গেল। ও বৈকুণ্ঠে যাবেনা ত কি বিশমুনে লালারা যাবে, যারা বসে বসে পরের পয়সায় [illegible] বাগাচ্ছে। পাপ ধোবার জন্য ওরা গঙ্গা নায়; মন্দিরে মন্দিরে ভেট চড়ায় কিন্তু ওতে কি আর পাপ যায়?

পিতা-পুত্রে সহসা মিল হইয়া গেল। দুইজনে দুইজনকে জড়াইয়া শিশুর মতন কাঁদিয়া উঠিল।

মাধবের কান্না আর থামে না।

যীশু নিজের অশ্রু সম্বরণ করিয়া মাধবকে সান্ত্বনা দেয়। আরে, সে তো মরে বেঁচে গেল!

মাধব চকিতে বুঝিতে পারে, সেই যুক্তির পরম সার্থকতা। কান্না থামিয়া যায়। পরিবর্তে সে গান গাহিয়া ওঠে, ঠগিণী কি উ নয়না···

গান গাহিতে গাহিতে সে উঠিয়া দাঁড়ায়···গানের ভাষা আর নাই··শুধু সুর···সেই সুরে সুরে সে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। যীশু তাহার সহিত যোগদান করিল। কিছুক্ষণ পরে মাটি তাহাদের দুই জনকেই একসঙ্গে আকর্ষণ করিয়া লইল।

আর কোন শব্দ নাই।

আড্ডাধারীরা শোকার্ত্ত পিতা-পুত্রকে টানিয়া একধারে শোয়াইয়া দিল। বারুণী-প্রসাদ-পুষ্ট নিদ্রার অতল গভীরে তাহারা ভুলিয়া গেল, হতভাগিনী বুধিয়ার মৃতদেহ তাহাদের জন্য অপেক্ষায় রহিয়াছে।

———

মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

গঙ্গা বলেন এপারও আছে আবার ওপারও আছে। জীবন-নদীরও তেমনি আছে এপার এবং ওপার। নদী বলিলাম, সিন্ধুও বলিতে পার কারণ আকাশ অসীম।* সেই আকাশের একটুখানি মাত্রই পৃথিবী হইতে দেখিতে পাই। সেই মহাসিন্ধুর ওপার হইতে সঙ্গীত ভাসিয়া আসে। সে গান কানে শুনি, কখনও বা করধৃত লেখনি তাহার চিত্রটি কাগজের উপর অঙ্কিত করে। ইহারই নাম স্বৈর-লিপি বা ইংরাজিতে Automatic writing। আমার নিজের গত ৫ই সপ্টেম্বর দিবসের একটি ঘটনার পরিচয় দিতেছি। সেদিন যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম তাহার প্রত্যেকটি বিবরণই সত্য।

আমার পিতামহীর নাম ব্রহ্মময়ী দেবী। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তিনি কলিকাতায় নিমতলা ঘাটের 'মরিবণ্ড হাউসে' দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। আমার পিতামহের নাম বিশ্বেশ্বর আচার্য্য। এই স্বৈরলিপিতে "কর্ত্তা" নামে অভিহিত। আমার পিতার নাম কেদারেশ্বর আচার্য্য, কালীপ্রসন্ন এবং তারা প্রসন্ন আমার খুল্লতাত। ইঁহারা সকলেই স্বর্গে গিয়াছেন। এইটুকু পরিচয় দিয়া স্বৈরলিপিটি অবিকল নিম্নে লিখিতেছি।

কাল—অপরাহ্ন। তারিখ—৫।৯।৪৫

স্থান—বারাকপুরে গির্জ্জার।

(উত্তর হইতেই প্রশ্নগুলি বুঝা যাইবে বলিয়া
প্রশ্নগুলি লিখিলাম না।)

—আমি ব্রহ্মময়ী দেবী।

আমার বড় ছেলের নাম কেদার, মেজ ছেলের নাম কালী, ছোট ছেলের নাম তারাপ্রসন্ন। তোমার নাম রাজেন্দ্র। তুমি আমার নাতি (পৌত্র)। আমার বাড়ী ছিল রাজসাহীতে। তোমার মা বেঁচে নাই। তোমার তিন বছর বয়সে তোমার মার মৃত্যু হয় বালীগঞ্জে মৃত্যু হয়। আমি তোমাকে মানুষ করেছি।

—আমি দেহত্যাগ করি কলিকাতায় নিমতলা ঘাটে। সেসময় তুমি, কেদার, কালী, তারাপ্রসন্ন আরও অনেকলোক ছিলে। দেহ ত্যাগ হয়েছিল রাত্রে।

—'কর্ত্তা' তখন ছিলেন কলিকাতার বাসায়। ছোট বৌমা (তারা-প্রসন্নের পত্নী) তখন কলিকাতার বাসায়। তোমার স্ত্রী তখন ছিল ভারাঙ্গায় (পাবনা জেলার গ্রাম)। তোমার স্ত্রীকে আমি 'বুলবুলি' বলে ডাকতাম।

(পরিচয় জানিবার জন্য উক্ত প্রশ্নগুলি করা হয়।)

হাঁ, আমিই এসেছি। সন্দেহ কোরো না। এতদিন তুমি ডাকনি (তাই আসিনি)। আমি সকল সময় তোমার কাছে কাছে থাকি।

—তোমার প্রণাম নিলাম। আসনে বসলাম।

—আমি এখন সত্যলোকের ধ্রুবলোকে আছি। তোমার মা কোথায় আছে জানি না। 'কর্ত্তার' সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কেদার, কালী, তারাপ্রসন্ন এদের সঙ্গেও দেখা হয়না।

—তুমি আমাকে 'দিদি' ব'লে ডাকতে।

—না, আমি বিরক্ত হবনা। জিজ্ঞাসা কর।

—আমি পৃথিবীতে লেখা-পড়া জানতাম না। পরেও আমি শিখিনি। আমি তোমার হাতে ভর ক'রে লেখাচ্ছি। তাতে আমার কোন কষ্ট হচ্ছেনা।

—কলিকাতার বাসায় আমার কলেরা হয়েছিল। কে আমার চিকিৎসা করেছিল তা মনে নাই। ব্যারামের সময় তুমি আমার কাছে থাকতে।

—কলিকাতার বাসায় থেকে তোমরা আমাকে গঙ্গার ঘাটে এনেছিলে। পথে আমার খাট তোমরা নামিয়েছিলে। সেখান থেকে গঙ্গানদী ছিল কাছে। আমি তখন গঙ্গার স্তব বলেছিলাম। (সে স্তব) তা মনে আছে। কেদার আমার সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল। আমার মনে আছে। একটু লেখাচ্ছি—

ওঁ দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে।
ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে॥

—রাজসাহী থেকে (আমি) তোমার সঙ্গে কলিকাতায় আসি নাটোরের পথে (তখনও রাজসাহী রেলপথ হয় নাই। ঘোড়ার গাড়ীতে যাতায়াত চলিত।)

—কলিকাতায় এসেছিলাম গঙ্গাস্নান করতে। আমি যখন এসেছিলাম তখন 'কর্ত্তা' (তিনি তখন প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন) বলেছিলেন—'দেখ, যেওনা। আমাকে একলা ফেলে যেওনা।' আমি বলেছিলাম—'আমি যাব আর গঙ্গাস্নান করেই ফিরে আস্‌ব।'

—আমার ব্যারামের খবর পেয়ে 'কর্ত্তা' কলিকাতায় এসেছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তিনি এসে আমার কাছে বসেছিলেন। আমি তাঁর দুই পা হাত দিয়ে ধ'রে বলেছিলাম—'আমি যাচ্ছি। আমার জন্য দুঃখ কোরোনা।'

—তিনি বল্লেন—'দেখ, তোমাকে ত' আগেই বলেছিলাম এসোনা। তুমি তা শুন্‌লেনা।'

—আমি বলেছিলাম—'আমাকে ক্ষমা কর।'

—হাঁ তোমাকে (আমাকে) বলেছিলাম নারায়ণের চক্র এনে দেখাতে, তুমি এনেছিলে। আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করেছিলাম।

—তোমার জন্ত খুব কষ্ট হয়। বুল্‌বুলির জন্তও খুব কষ্ট হয়।

—তোমার বড় ছেলে ষষ্ঠীকে আমি দেখেছি। সে এখন এই বাড়ীতে নাই। সে তার আফিসে গেছে।

—(আরও) লেখাতে পারব। কতকাল পর তোমার কাছে এসেছি। কতকাল পর কথা কচ্ছি। সেদিনের ছেলে তুমি—তুমিই এখন বুড়ো হয়েছ। আমার কত আনন্দ হচ্ছে।

—তোমার সঙ্গে আমি শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলাম। কর্ত্তা কেও সঙ্গে নিয়েছিলাম। আমাদের বেশ ভালই দর্শন হয়েছিল।

—এখন সত্যলোকে আমি পূজা আরাধনা করি। সেখানে কত ঠাকুর আছেন। আমি ঠাকুর দেখে দেখে বেড়াই। সে জায়গাটা খুবই ভাল। সেখানে বেশ আলো (আছে) অন্ধকার নাই।

—সেখানে আছে বাড়ী, মন্দির, পথ, বাগান, পাখী, ফুল, নদী, পাহাড় আরও কত কি।

—সেখানে আমি দুধ খাই আর ফল খাই। দুধ খাই একটা গাছ থেকে। গরু-বাছুর সেখানে দেখিনে। অমৃত গাছের ফল খাই।

—না আমাকে (সে সব) যোগাড় ক'রে আনতে হয়না। এমনি মনে করলেই পাই। কাপড় পরি গাছের ছালের। সে কাপড় ইচ্ছা করলেই আসে।

—থাকি একটা বাড়ীতে। বাড়ীটা পাথরের। আমি সে বাড়ীতে একাই থাকি।

—আমি শিব-পূজা করি। হাঁ, বেলপাতা ফুল পাই, বেলের গাছ আছে।

—আমি যেখানে আছি সেখানে রোগ-ব্যাধি নাই।

—বুলবুলিকে দেখতে পাচ্ছি। বুলবুলি বাতাস দিচ্ছে। আমার বেটার বৌদের দেখতে পাইনা। কে কোথায় আছে জানিনা।

—সত্যলোক থেকে এখানে আসতে আমার কষ্ট হয়নি। ব'সে থাকতেও কষ্ট হচ্ছেনা।

—হাঁ, আরও কিছুক্ষণ থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে।

—যখনই (আমার) প্রাণটা গেল, তখনই আমি দেহের কাছে দাঁড়ালাম। দেখলাম যে দেহ থেকে একটা ধূমা বার হচ্ছে। সেই ধূমাটা আমার কাছে এলো। আমি তার মধ্যে ঢুকলাম।

—তারপর একটা কুয়াসার ভিতর দিয়ে হাটতে লাগলাম। অনেকক্ষণ ধরে হাটলাম। কুয়াসার শেষে এসেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কতদিন যে ঘুমালাম তা জানিনা।

—যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন দেখলাম যে আমার শ্বশুর দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বল্লেন—'বৌমা তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

—আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চল্লাম। সঙ্গে সঙ্গে এলাম চন্দ্রলোকে। তিনি আমাকে সেখানে রেখে চলে গেলেন।

—আমি সেখানে একজন মেয়েছেলের সঙ্গ পেয়ে সেখানেই থাকলাম। সে যায়গা খুব ভাল নয়। সেখানে বাড়ী আছে কাঠের। পাখী আছে, ফুল আছে, নদী আছে। চন্দ্রলোকে ছিলাম অনেকদিন। চন্দ্রলোকে আমি শিবপূজো করতাম আর গঙ্গাস্নান করতাম। মহাপুরুষরা এসে পূজা-অর্চ্চনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। সেখানে আমাদের যায়গায় খালি মেয়েছেলেই থাকতো। পুরুষদের যায়গা আলাদা। সত্যলোকেও মেয়েদের যায়গা একদিকে, পুরুষদের যায়গা একদিকে। পুরুষেরা মেয়েদের যায়গায় আসতে পায় না। কোন পুরুষকে যদি কোন মেয়েকে ডাকতে হয় তা' হলে সে মেয়ে-প্রহরীদের

কাছে যায়। সেই প্রহরী তখন মেয়েকে ডেকে আনে। হাঁ। ভূ-লোকেও এই নিয়ম।

—চন্দ্রলোক থেকে গেলাম স্বর্গলোকে। স্বর্গলোক খুব ভাল যায়গা। সেখানে অনেকদিন ছিলাম। স্বর্গলোক থেকে সত্যলোকে এসেছি, সত্যলোকে অনেকদিন হ'ল এসেছি। এখানে আরও কিছুকাল থাকতে হবে। এখান থেকে গোলকে যাব।

—মরার পরও (কাহারও কাহারও) জন্ম হয়। আবার অনেক বিলম্বেও হয়। যে যেমন কাজ করে সে তেমন ফল পায়। যে খারাপ কাজ করে সে অল্পদিনেই পৃথিবীতে আসে। ভাল কাজ যারা করে তারা সবাই উর্দ্ধলোকে যায়।

—গোলকে লক্ষ্মী নারায়ণ আছেন। যারা গোলকে যায় তাদের আর জন্ম হয় না।

—আমি পুরুষদের কোন খবর বলতে পারি না। চন্দ্রলোকে বা সত্যলোকেও দুষ্ট মেয়েছেলে দুষ্টামীর কাজ করে। দুষ্টামীর কাজ করলে সেখানে শাস্তি পায়। শাস্তি খুব ভয়ানক। তাদের অন্ধকার যায়গায় ফেলে রাখে। কখনও বা মার-ধোরও করে।

—চন্দ্রলোক আর সত্যলোকের মাঝখানে আছে জল। সেসব লোকে কেউ থাকে না। সেসব যায়গা বড় গরম। সেখানে আছে সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি। আমি চন্দ্রলোক থেকে সত্যলোকে এলাম সেই গরম যায়গার ভিতর দিয়ে। আসতে গরমে খুব কষ্ট হয়েছিল। একজন মহাপুরুষ আমাদের সঙ্গে করে এনেছিলেন।

—হাঁ নরক সম্বন্ধে কিছু জানা আছে। সে বড় ভয়ানক যায়গা। অন্ধকার যায়গা। সেখানে পাপীরা থাকে। তারা সেখানে কেবলই চেঁচাচ্ছে, খুব কষ্ট পায় বলে চেঁচায়। না, মার-ধর করা দেখিনি, হাঁ, সেখান থেকেও মুক্তি পায়। সেজন্য তারা ভগবানের নাম

করে। হাঁ, অনেকদিন ধ'রে ভগবানের নাম করলেই লোকে মুক্তি পায়।

—চন্দ্রলোকে, সত্যলোকে এক ধর্ম্ম আছে। এক ভগবানেরই সকলে পূজা করে। আমি যেমন শিবপূজা করি, তেমনি অন্য লোকে যার যে ঠাকুর তারই পূজা করে। শিব, দুর্গা, কালী, বিষ্ণু সবই এক। মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতিরা সবাই আমাদের সঙ্গে পূজা করে। এখানে জাতিভেদ নাই।

—না, আমার কষ্ট হচ্ছে না। আমি আরও লেখাতে চাই। লেখাতে চাই যে মানুষ মরেনা। সে বেঁচেই থাকে। হাঁ, আত্মীয় স্বজনদের কথা সবই মনে থাকে। সে তাদের দেখতেও আসে। বিপদ হওয়ার মত দেখলে অনেক সময় তারা এসে বাঁচিয়ে দেয়।

আমি জানি তুমি বগুড়ায় হাকিম ছিলে। সেসময় আমার 'বুলবুলি' তোমার কাছে ছিল। ষষ্টীও (আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র) তোমার কাছে ছিল। সেখানে ষষ্টীর যে খুব কঠিন জ্বর হয় তা আমি জানি। একদিন রাত্রে আমি দেখলাম যে ষষ্টীকে মাঝে রেখে একদিকে তুমি আর অন্যদিকে 'বুলবুলি' ঘুমুচ্ছে। ছেলের তখন নাড়ী ছেড়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে আমি ব্যঙ্গ করে হেসে ফেল্লাম। তখন তুমি তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে ছেলের হাত ধরলে। আমি তখন ছায়ার মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। তারপর ছেলে ভাল হয়ে উঠলো।

—তার যে নাড়ী ছেড়ে যাচ্ছিল তা' আমি কাছে গিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম। আমি ওখানে এসেছিলাম রোগা ছেলেকে দেখতে। আমি শুধু বিকট একটা হাসি হেসেছিলাম। তাতেই তোমার ঘুম ভেঙেছিল। সেই রাত্রে ও বাড়ীতে তুমি আর 'বুলবুলি' ছাড়াও ছিল তারাপ্রসন্ন আর তিনকড়ি (তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র) তারা অন্য ঘরে ছিল।

—(সব) তুমি নিজে কেন লিখবে? আমি যে তোমার হাত ধ'রে সব লেখাচ্ছি। (আমার মনের ভুল) না, সে সন্দেহ করোনা। তোমার মনের কথা কলমে আসছে না। আমি যা লেখাচ্ছি তুমি তাই লিখছ।

—লেখার ক্ষমতা তোমার দশ বার দিন হলো হয়েছে। তুমি যদি সর্ব্বদাই লেখ আর ভগবানকে ডাকো তা'লে তোমার ক্ষমতা খুবই বাড়বে।

—'বুল্‌বুলি' লিখতে পারবে না। তার মন স্থির নয়। যার মন স্থির নয় সে লিখতে পারবে না।...আমার আশীর্ব্বাদে তোমার শক্তি নিশ্চয়ই বাড়বে।

—হাঁ, এখন যাই। এরকম ক'রে খাটতে একটু কষ্ট হয় বৈ কি? তবে তোমার কাছে অনেকদিন পর এসেছি। তাই সে কষ্ট কষ্টই জ্ঞান হচ্ছে না।

—আমি তবে এখন যাই।

(আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম)

—তোমার প্রণাম নিলাম।

ওপারের সঙ্গীত থামিয়া গেল। আমার মনে হইতে লাগিল যেন এতক্ষণ স্বপ্নলোকে ছিলাম। সহসা স্মরণ হইল ক্যাথারাইন বেইস্-এর একটি সারগর্ভ কথা—It is the living who return. It is the living who depart, for that matter: How can a dead man depart or return?

—সত্যই ত আমরা অমর ও মৃত্যুহীন।

অনার্য্য প্রেমিক

শ্রীবাণী রায়

বৃক্ষ···শাল, আম, দেবদারু।

পুষ্প···গুঞ্জ, কুর্চ্চি।

দৃশ্য···পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত সাঁওতালী প্রদেশ।

এই পটভূমিকায় এক দ্বিতলবাটীর সম্মুখে রেণুকা বিচরণ করিতেছে। ক্ষীণাঙ্গী, অনুজ্জ্বল-গৌর তাহার গাত্রবর্ণ। বামহস্তে কাব্যপুস্তক। কালোঁচুলে ঈষৎ অযত্নে ও অনেকখানি যত্নে স্থাপিত রক্তপুষ্পগুচ্ছ। কৈশোর বহুদিন গত হইয়াছে। আজ তাহার যৌবনের অবসান, নি···সঙ্গ···একক।

রেণুকা দেবী পদযুগল শালে আবৃত করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়, পার্শ্বস্থ ত্রিপদীতে 'টেবল্ ল্যাম্প্' জ্বলিয়া উঠিল। অস্পষ্ট, ম্লান আলোকে গৃহখানি স্বপ্নতন্দ্রাজড়িত রহস্যাগারের রূপ ধারণ করিয়াছে। উন্মুক্ত বাতায়ন পথে দক্ষিণাবাতাসে উগ্র চম্পকসুবাস ভাসিয়া আসিতেছে।

বহুদিন, বহুদিন এ কাহিনী শুনিতেছি; জানি আরও আমাকে শুনিতে হইবে, যতদিন রেণুকা দেবী জীবিত থাকেন। এইরূপ কত আমার কর্ম্মক্লান্ত অবসর-সন্ধ্যা রেণুকা দেবীর রৌপ্যখচিত অলকে বিজলি বাতির মুমূর্ষু-দীপ্তি দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গিয়াছে। দূর উদ্যানের সৌরভ ভাসিয়া আসিয়াছে বৃথা। বৃথা আমার প্রিয়া প্রদীপ্ত আঁখির নীরব ইঙ্গিত পাঠাইয়াছে। রেণুকা দেবীর সহস্রখ্যাত উপাখ্যান আমার

বহুবার শুনিতে হইয়াছে। উপায়ন্তর নাই। রেণুকা দেবী আমার প্রিয়ার অভিভাবিকা। আমি তাঁহাকে সারাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছি নিজের চিকিৎসায়।

তাঁহার দৃশ্যতঃ ব্যাধি বাত। অন্তরালব্যাধি অত্যধিক কাব্যচর্চ্চা এবং তাহার সহিত সেই অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত চিকিৎসা।

"বড় যন্ত্রণা হচ্ছে, ইন্দ্র, আর সহ্য হয়না।"—রেণুকা দেবী দক্ষিণপদ আকুঞ্চিত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মধ্যবয়স্কসুলভ মলিন মুখমণ্ডল মলিনতর হইল,—"মনে হয় কে যেন চিবিয়ে খাচ্ছে! কেন সারছেনা ইন্দ্র? একটা অন্যায় করেছিলাম জীবনে, এ তার-ই শাস্তি।"

ঔষধের ব্যবস্থা আমার করিতে হইল না, রেণুকা দেবী নিজেই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আবার সু-অভিনীত আগ্রহে চেয়ারখানি সরাইয়া আনিলাম; বলিলাম, "না না, অন্যায় করেননি আপনি, ভুল করেছিলেন মাত্র। ভুলের অধিকার মানুষমাত্রেরি আছে।"

"ভুল করবার বয়েস আমার তখন ছিলনা। আমি তখন বড়ো।"

* * * *

সাঁওতালী প্রদেশের হাটের দিন। কতলোক রেণুকাদের বাটীর সম্মুখ দিয়া চলিতে লাগিল ক্রীত দ্রব্যের বোঝা লইয়া। দূর পাহাড়ের উপর তাহাদের গ্রাম। সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, আকাশের অন্যপার্শ্বে সহসাগত চন্দ্র। সূর্য্যের খরপ্রভায় সে চন্দ্র নিষ্প্রভ হইলেও স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান। কি আশ্চর্য্য, একই আকাশে সূর্য্য ও চন্দ্র!

সাঁওতালী দাসী সুকী চায়ের পাত্র হাতে রেণুকে দিতে আসিল। একদল সাঁওতালী মেয়ে একঘেয়ে সুরে কি একটা দুর্ব্বোধ্য গান করিতে করিতে ফিরিয়া চলিয়াছে। তাহাদের দিকে ইঙ্গিত করিয়া রেণুকা সুকীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওইরকম গান তুমি করতে পারো? কি বলছে ওরা"?

'শুনদিদি' রেণুকার হাতে চায়ের পাত্র দিয়া সুকী একটু কৃতিত্বের হাসি হাসিয়া জানাইল, সে সমস্ত গীতই জানে, প্রয়োজন হইলে এখনই গাহিতে পারে।

প্রয়োজন হইল। বারান্দার সিঁড়িতে বসিয়া সুকী ভাঙা-ভাঙা গলায় একটানা সুরে গান ধরিয়া ফেলিল—

"শালবন রাজদ বাহা বাগাওয়ান,
বারটি পাচিলী বাহা বাগাওয়ান,
তারে মা লিক্ লিক্
বাহা মা লাক্ লাক্
চেকা তিন তিউগা হেকা কারাম ডোর।"

রেণুকা হাসিয়া উঠিল,—"এ আবার কি রকম সব কথা? এর মানে কি?"

বাঙালীবাবুদের বাড়ী কাজ করিয়া সুকী নানা বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং রৌপ্যবলয় আন্দোলিত করিয়া সে রেণুকাকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইল,—"শালবনে রাজাদের ফুলের বাগান আছে। বারটি পাঁচিল দিয়ে বাগান ঘেরা। একজন মেয়েমানুষ সেই ফুল নিতে চাইলো। মরদমানুষ বল্লো নিওনা, নিওনা। কিন্তু ফুল দেখলেই নিতে সাধ হয় কি না, তাই মেয়েমানুষ ফুল তুলে নিল।" বক্তব্য শেষ করিয়া সুকী তুলনামূলক সমালোচনা করিল বেপরোয়া ভাবে—"আমরা মেয়েমানুষ হচ্ছি মরদমানুষের কাছে ফুলের সমান।"

কিন্তু প্রাচীর তোমাদের নাই। সাঁওতালী-প্রেমে শ্রীক্ষেত্র নিত্য বিরাজমান। বাছবিচার নাই, বন্ধনের অবকাশ নাই। সমস্ত দিন কাজ, সন্ধ্যার পর হাড়িয়া, মাদল আর প্রেম। জীবনের পরম সত্য তোমরা জানিয়াছ—রেণুকা মনে মনে বলিল। যাহা হাতে পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করো—

"Stretch forth your open hands and while ye live
Take away all the gifts that death and life may give."

'মরিসের' কবিতার দুইটি পংক্তি অজানিতে কে যেন রেণুকার কাণে কাণে বলিয়া দিল।

"বোনদিদি বাংলা গীত শুনবে? উ আমি জানি।

আসবে বলে দূত পাঠালে,
শুধু শুধু রাত জাগালে,
এবার বঁধু ঠিক সময়ে আস্‌বে তুমি, ফুলকুমারী।"

"এ গান কোথা থেকে শিখ্‌লে সুকী?"

সুকী সগর্ব্বে উত্তর দিল পাহাড়ের উপর তাহাদের গ্রামের 'মাষ্টর' এই গীত বাঁধিয়াছে। সে 'মেট্‌রিক্' পাশ এবং বড় কবি।

সাঁওতাল বাংলা গান লেখে এবং মেট্রিক্ পাশ স্কুলমাষ্টার শুনিয়া রেণুকা কৌতূহলী-চিত্তে সুকীকে সাগ্রহ প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইল যে মাষ্টার জাতিতে সাঁওতাল হইলেও সে যে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার আত্মীয়স্বজন কেহ নাই। নিকটবর্ত্তী ইস্কুলে সে শিক্ষকতা করে এবং গান বাঁধে। এই পথ দিয়া সে প্রতি হাটবারে হাটে যায়। আজও যখন বোনদিদি এখানে বেড়াইতেছিল সে গিয়াছে।

"আরও একটি গীত শুনবে বোনদিদি? মাষ্টর বেঁধেছে।" উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সুকী উচ্চকণ্ঠে গাহিল—

"শালের বনে হাওয়া লাগে—

দ্বিতল হইতে রুক্ষ, ভারী গলায় আদেশের ভাবে আহ্বান আসিল—"রেণু!" রেণুর অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরিয়া জবরদস্ত রায়সাহেব পিতার কণ্ঠস্বর। সারাজীবন তিনি রেণুকাকে শাসন করিয়া আসিতেছেন। ভদ্রবাটীর মানসম্ভ্রম ও কুমারী কন্যার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা আশ্চর্য্যভাবে সীমানিবদ্ধ।

মুকী জিভ কাটিয়া চুপ হইল। রেণুকা বিষণ্ণ, সঙ্কুচিতচিত্তে উপরে উঠিয়া গেল।

"ঝি-চাকরের সঙ্গে সখীত্ব না করলে কি তোমাদের চলে না? ভদ্রঘরের মেয়েরা কেউ করে নাকি?" বাতদুষ্ট পদদ্বয়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে রায়সাহেব কন্যাকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করিলেন,—"যাও, গরমজলের বোতলটা নিয়ে এসো।"

বাতব্যাধি রেণুদের বংশগত রোগ।

* * *

"ইন্দ্র, এই অসুখটা যে এত কষ্ট দেয় কে জান্‌তো আগে? বংশের ভাল কিছু পেলাম না, মন্দটাই পাচ্ছি। রেখা গেল কোথায়? ফ্ল্যানেলটা দিয়ে যাক্।"—রেণুকা দেবী বিরক্তিজড়িতকণ্ঠে বলিলেন।

ফ্ল্যানেল খণ্ড আমি পাতিয়া বসিয়াছিলাম। কিন্তু রেখাকে একবার দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে ডাকিলাম।

সে আসিল, যেমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমার অন্তরের অন্তস্তলে সে প্রবেশ করিয়াছে, তেমনি করিয়া আসিল।

"দিদি, ডাকছো?"

"রেখা, ফ্ল্যানেলটা—" ফ্লানেল পাওয়া গেল। রেণুকা দেবী বলিলেন, "চা-টা এনে ইন্দ্রকে দাও রেখা। ডাক্তার মানুষ, সারাদিন পরিশ্রম করে।"

রেখা চলিয়া গেলে আমার দিকে চিন্তিত দৃষ্টি হানিয়া রেণুকা দেবী বলিলেন, "ইন্দ্র, তুমি বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছ বুঝেছি। রেখারো বয়েস হয়েছে। কিন্তু, আমার অসুখ একটু ভাল না হলে তোমাদের কি করে বিয়ে দেব বলো? মা তো ওর জন্মের সঙ্গে মারা যান, আমিই ওকে মানুষ করি। অবশ্য বিধবা হবার পর থেকে পিসীমাও

আমাদের বাড়ী আছেন। বাবা মরবার সময় আমারি হাতে তুলে দিয়েছেন ওকে। আরতো আমাদের ভাই বোন নেই, সর্ব্বদা একসঙ্গে থেকে একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। ও চলে গেলে আমার মুখে জল দেবার লোক থাকবে না। টাকায় কি সেবাযত্ন মেলে? আমার অসুখ ভাল না হ'লে রেখাও বিয়ে করতে চাচ্ছে না।"

চমৎকার! যেমন তুমি, রেণুকা দেবী, তোমার পিতার সেবা-শুশ্রূষার ভার লইয়াছিলে, তেমনি আজ রেখাও আত্মত্যাগ করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু এ-আত্মত্যাগ স্বেচ্ছায় নহে, বাধ্য হইয়া—উভয় ক্ষেত্রেই।

রেণুকা দেবী, আজো দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে, আজো চন্দ্রের প্রভা তোমার অলক স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু, আজ তোমার দেহে প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্ত্র-আবরণ, তোমার কেশে রৌপ্যঝলক। সময়কে বহিয়া যাইতে দিতে নাই। নিজে যাহা উপভোগ করিতে পারিতেছ না, কেন রেখাকে তাহা করিতে দিতেছ না? প্রেমের আবির্ভাব সুস্পষ্ট দেখিতেছি। মৃত রায়সাহেবের আত্মা তোমার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে।

রেখা তোমারি ভগিনী। সবলের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শিক্ষা তুমি ও তোমার পিতা তাহাকে দাও নাই। তাহাকে তোমার পিতা উপদেশ ও তুমি উদাহরণ দিয়া শিখাইয়াছ লতার মত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির পদদলিত হইয়া থাকা। শিক্ষা দিয়াছ কন্যার কর্ত্তব্য নিজের সুখ স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়া অন্যায় দাবী মিটাইয়া যাওয়া। সেই কর্ত্তব্য করিতে গিয়াছিলে কাব্যপিপাসু, কোমল নারীর মন লইয়া, যে মনের বিশেষত্ব প্রেমপাত্রের অনন্যচিত্ত অন্বেষণ। তাই অবশেষে যাহা তুমি করিয়াছিলে, রেণুকা দেবী, তাহা সবিশেষ জানিলে সমস্ত শিক্ষিত সমাজ শিহরিয়া উঠিবে। তোমার চিকিৎসক ও ভবিষ্যৎ

আত্মীয়রূপে এক মাত্র আমি তাহা জানিয়াছি। তুমি বিশ্বাস করিয়াছ আমি তোমার সর্ব্বপ্রকার আধিঃ ও ব্যাধি নির্ম্মূল করিতে পারিব।

অষ্ট পূর্ণিমা। পাহাড়ী প্রদেশের জ্যোৎস্না যেন মনে অহেতুক বন্যতা আনিয়া দেয়। যে-কথা, যে-চিন্তা অন্তরের কোণে অগোচরে থাকে তাহাকে টানিয়া বাহির করে।

আজ রেণুকার পিসীমার সহিত রায়সাহেবের বচসা হইয়া গিয়াছে একপালা। বিতর্ক রেণুর বিবাহ সম্পর্কীয়। রায়সাহেব ভগ্নির অনুযোগে বিরক্ত হইয়া চীৎকার করিয়াছিলেন,—"আমি মেয়ের বিয়ে দিলাম না? না, মেয়ের কপালে জুটলো না? টাকাকড়ি তো সবি ওর নামে আলাদা করে রেখেছি, বিয়ে না হলেও ভবিষ্যতে ওকে কখনই কষ্ট পেতে হবে না।"

সংযতচিত্তা বিধবা মৃদুস্বরে বলিলেন, "টাকা নিয়ে মেয়েরা কখনো সুখে থাকেনা। একটু চেষ্টা না করলে হিন্দুঘরের মেয়ের কি আপনা থেকে বিয়ে হয়?"

"না হোক, আমি লোকের বাড়ী 'দয়া করো, দয়া করো' বলে বেধে পাত্র খুঁজতে যেতে পারবোনা এ বয়েসে। একি তোমাদের যুগের গৌরী-দান যে খুঁজে ধরে আনতে হবে? হ'বার হলে পাত্র আপনি আসতো। ও না হয় বিয়ে না-ই করে থাকবে, ক্ষতি কি?"

"কারুর সঙ্গে কি তুমি ওকে মিশতে দাও দাদা, যে পাত্র আপনি আসবে? এসেও ছিল তো একবার।"

রায়সাহেব প্রচণ্ড চীৎকার করিয়া ধমক দিলেন,—"ওঃ, সেতো একটা লোফার। ওর হাতে মেয়ে দেবার চেয়ে মেয়েকে গলায় দড়ি বেঁধে জলে ভাসিয়ে দেওয়া ভাল। এদিকে আমার এই অবস্থা, এখন

তোমাদের হয়েছে বিয়ের সখ! দুদিন সবুর করো, মরবার দেরী দেরী নেই আর।"

সুতরাং আর আলোচনা অগ্রসর হয় নাই।

আসিয়াছিল। তাহারো বত্রিশ বৎসরের জীবনে প্রেম না আসিলেও প্রার্থী একজন আসিয়াছিল। কিন্তু প্রবল পিতৃশাসনের ভয়ে রেণু তাহার প্রতি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারে নাই। পিসীমার দূর সম্পর্কে শ্বশুরালয়ের আত্মীয়। দুই চারিবার অন্দরে যাতায়াত করিবার ফলে রেণুর বিশীর্ণ পুষ্পের মত ক্লান্ত মুখচ্ছবি তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সওদাগরী অফিসের কেরাণী সে, রায়সাহেবের গ্র্যাজুয়েট কন্যার উপযুক্ত তিনি তাহাকে বিবেচনা করেন নাই। সেই শেষ।

কেন অহেতুক বন্যতা? কেন দেহ ব্যাকুল? রেণু তো অসুস্থ পিতার সেবা ও সর্ব্বতোভাবে আজ্ঞাপালন একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া জানিয়াছে। মাতৃহীনা রেখার ভার ও তাহারি উপরে। কর্ম্মবিহীন জীবন তাহার, নিস্তরঙ্গ দিনযাত্রা। তবু, আজ নিরালা রাত্রে, দক্ষিণা বাতাসে, মত্ত শাল-পুষ্প-সৌরভে মনে হয় পুরুষের চুম্বন কেমন!

সুকী আজ গান গাহিয়াছিল—"বাহা মা লাক্ লাক্।" ফুল তো লোকে লইতেই চাহিবে।

—"Take away all the gifts that Death and Life may give." কিন্তু, বিশ্বব্যাপী পুষ্পচয়নউৎসবে সে-ই বা কেন বাদ যাইবে!

অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে একটি পুরুষমূর্ত্তি দেখা গেল বৈদেশিক-বেশে, ট্রাউজার ও অর্দ্ধমলিন হাফশার্টে। রেণুদের গৃহসন্নিকটস্থ আমগাছের নীচে দাঁড়াইয়া সেই মূর্ত্তি অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পরেই সুকী বাহির হইয়া আসিল এবং উভয়ের সামান্য কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে রেণুর সম্মুখ দিয়া সেই অচেনা পুরুষটি চলিয়া গেল। বিস্ফারিত

সহসা তাহার তীব্র দৃষ্টির সহিত একবার মাত্র রেণুর ভীরু কটাক্ষ মিলিত হইল।

শক্তি যদি পৌরুষের পরিচয় হয়, অপরিমিত স্বাস্থ্যসম্ভার যদি সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি বলা যাইতে পারে, যৌবনের, পুরুষত্বের, রূপের প্রকৃষ্ট প্রকাশ সেইদিন বন্য পার্ব্বত্যদেশে রেণু দেখিয়াছিল। প্রস্তর-মূর্ত্তির নিখুঁত ভাস্কর্য্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহার গঠিত, সবল প্রতিপাদ-ক্ষেপে জীবনের অদম্য প্রকাশ লক্ষিত হইতেছে। ক্ষীণ কটির উর্দ্ধে প্রশান্ত-বক্ষ সহস্রনারীর চরম আশ্রয়স্থল। বঙ্কিম অধরে বাসনার নিষ্ঠুর মাদকেতা। কিন্তু, গাত্রবর্ণ নিকষকৃষ্ণ।

সুকী রেণুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রবেশী যুবককে অশিক্ষিতা সাঁওতাল-দাসীর সহিত কথা বলিতে দেখিয়া রেণু বিস্মিত হইয়াছিল। সুকীকে সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রলোকটি কে সুকী?"

"এইতো মাষ্টর।"

সাওতাল! অনার্য্য! কিন্তু—কী রূপবান!

আবার সহসা যেন কাণের কাছে বাজিয়া উঠিল :—

—While ye live
Take away all the gifts.....
Take away all the.....
Take away.....

* * *

"ওই রূপ দেখে ভুলেছিলাম ইন্দ্র"—ক্লিষ্টস্বরে ক্ষীণালোকিত গৃহে রেণুকা দেবী বলিয়া চলিলেন,—"নিজের মুখে নিজের লজ্জার কথা বলি তোমাকে। তুমি ভুল বুঝোনা। এসব কথা আমার মনে বেঁধার মত জমে আছে।"

জানি রেণুকা দেবী, বোঝা কোন না কোন স্থানে [illegible] করিলে চলার গতি ব্যাহত হয়। কিন্তু, যখন [illegible] নামানো হইয়া গিয়াছে তখন বারে বারে এ প্রলাপ কেন? পুনরাবৃত্তি-শুধু অপরাধ খণ্ডনের জন্য নহে, বঞ্চিত চিত্তের প্রবৃত্তি নিবারণের এ এক উপায় তুমি বাহির [illegible] তোমার যৌবন—অপরাধের আলোচনায় তোমার পঁয়তাল্লিশ বৎসরের জীবন প্রেমের ও কামনার ক্ষীণ আভাস খুঁজিয়া পায়। তাই রেণুকা দেবী, তোমার বয়োকনিষ্ঠ স্নেহপাত্র হইয়াও আমি তোমার এ মানস-বিলাসে প্রশ্রয় দেই। কারণ, আমি যে তোমার চিকিৎসক।

রেখার সযত্ননির্ম্মিত চায়ের পাত্র মুখে ধরিয়া ছায়াসঙ্কুল অর্দ্ধ আলোকিত রোগগৃহে বসিয়া চিরকুমারীর বিকৃত প্রলাপ আমার শুনিয়া যাইতে হইতেছে—যখন বাহিরে পৃথিবী অপরূপ শোভা ধরিয়া পথ চাহিয়া আছে, আর তাহারই সহিত [illegible] চাহিয়া আছে রেখা। কিন্তু শুনিয়াছি প্রেমের জন্য ইহা অপেক্ষাও অনেক কঠিন ত্যাগ অনেক পুরুষ করিয়াছে। সুতরাং তুমি বলিয়া যাও, আমি শুনি। তুমি বলিয়া যাও অখ্যাত প্রদেশের এক অনার্য্যের হতাশ প্রেমকাহিনী। মানসিক বিতৃষ্ণার নিকট দৈহিক আকর্ষণের চরম পরাজয়। তুমি বলিয়া যাও সেই অনার্য্যের দেহসৌষ্ঠব, তাহার আকাঙ্ক্ষার উত্তাপ—শিক্ষা ও সংস্কারের কঠিন পরিমণ্ডলকে যাহা মোমের মত দ্রবীভূত গলিত করিয়াছিল।

* * * *

রেণুর হাতে সুকী একখানা খামে মোড়া চিঠি আনিয়া দিয়া হাসিয়া পলায়ন করিল। বসিবার ঘরে বেতের চেয়ারে গাতের বোনাটা রাখিয়া রেণুকা পত্রখানি খুলিয়া প্রেরকের নাম দেখিতে গেল। তাহাকে পত্র লিখিবার কেহ এখানে নাই।

পত্র পাঠ করিয়া রেণুকা কম্পিতহস্তে সীবনকার্য্যের বেতের রচিতর মধ্যে চিঠিখানা লুকাইয়া রাখিয়া অত্যন্ত মনোযোগের ভাণে বোনাটা আবার তুলিয়া লইল। বাহিরে কাহার যেন পদশব্দ শ্রুত হইতেছিল। যদি তাহার পিতা কোনক্রমে এ পত্রের অস্তিত্ব জানিতে পারেন তাহা হইলে চিরদিনের মত তিনি রেণুকারই উপরে দোষারোপ করিবেন নিঃসন্দেহে। অর্দ্ধশিক্ষিত সাঁওতাল যুবক ভদ্রঘরের শিক্ষিতা, বয়স্থা কুমারীর নিকটে বিনা প্রশ্রয়ে প্রেমপত্র পাঠাইবার সাহস পায় কোথা হইতে?

নিদারুণ লজ্জায় রেণুকার কুঞ্চিত অলকাবৃত বিবর্ণ ললাট অণুরঞ্জিত হইল। এই তাহার জীবনে প্রথম প্রেমপত্র! কিন্তু পাত্র অশিক্ষিত, হীন সাঁওতাল। বিতৃষ্ণায় রেণুকার অন্তর আকুঞ্চিত হইতে লাগিল। কি স্পর্দ্ধা তাহার? রেণুকে সে দূর হইতে দেখিয়া ভালবাসিয়াছে। তাহার রচিত গান রেণু শুনিয়াছে তাহাতে সে ধন্য। তাহার আরো গান আছে। রেণু যদি তাহাকে অনুমতি দেয় তাহা হইলে সে রেণুর সহিত দেখা করিয়া তাহাকে সে গান শুনাইতে চায়।

পরিষ্কার হস্তাক্ষর, বর্ণাশুদ্ধি নাই। সাঁওতাল এত ভাল বাংলা জানিল কোথা হইতে? মনে পড়িয়া গেল সুকী যে পরিচয় দিয়াছিল···মিশন স্কুলের শিক্ষক—প্রবেশিকাউত্তীর্ণ···ক্রিশ্চান ধর্ম্মাবলম্বী কবি।

রেণুকে সে ভালবাসিয়াছে! এই রক্তধূলি-মণ্ডিত শালাকীর্ণ বন্যপ্রদেশে শুলঞ্চ বৃক্ষের ছায়ায়, পাহাড়ী ঝর্ণার পার্শ্বে শুষ্ক বিগত-যৌবনা চিরকুমারীর জন্য এই প্রেম সঞ্চিত ছিল! অলক্ষিতে মধু সংগ্রহ হইয়াছে—ভ্রমরা, তুমি এসো!

ভ্রমরা, তুমি এসো। জীবন অপেক্ষাও চঞ্চল যৌবন। শেষ কিন্তু এখনো ক্ষীণ রেশ তাহার ভোগাকে বর্ষণ-রজনীতে,

বর্ষাদিনে ব্যাকুল করিয়া তোলে। এখনো সামান্য [illegible] তাহার পর আর থাকিবে না।

"We have short time to stay,—
We have as short a spring—"

কাণের কাছে বিদেশী কবির করুণ [illegible] ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সে সাঁওতাল, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহার বর্ণ নিকষকৃষ্ণ, তোমার মলিনগৌর; তাহাতে প্রভেদ হয় না। যৌবন যৌবনকে ডাকিলে আর্য্য-রক্ত ও অনার্য্য আহ্বানে সমান উদ্বেল হইয়া ওঠে। যদি দেহের বন্দনা করিতে চাও—চশমালাঞ্ছিত নয়ন ও সূক্ষ্ম-বসনাবৃত ক্ষীণদেহ অপেক্ষা অশিক্ষিত হীনজাতির সবল দেহগরিমা কি অধিক ঈপ্সিত নহে?

* * *

"ইন্দ্র, ভাল করে ব্যাপারটা ভেবে দেখ। আমার তখন যথেষ্ট বেশী বয়েস হয়ে গেছে। সম্মুখেও অন্ধকার ভবিষ্যৎ। একটা মরিয়াভাব এসে গেল। অত সুন্দর ছিল সে দেখ্‌তে! বাবাকে তো ভয়েই কিছু বল্‌তে পার্‌লাম না। বাবা তখন একটু [illegible] ছিলেন। ওখানে সাহিত্যসভার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, প্রায় বাড়ী থাক্‌তেন না। ঝরণার ধারে আমি বিকেলবেলা বেড়াতে যেতাম। ওইখানেই দেখা হোত।"—

—"ইন্দ্র, তুমি বোধহয় আমাকে ঘৃণা করছো। গোড়ায় আমি গিয়েছিলাম অন্য উদ্দেশ্যে। সাঁওতাল হয়ে আমাকে চিঠি পাঠাতে সাহস করেছিল, তাই মনে কৌতূহল হোল। ভাবলাম একবার চোখে দেখে নিষেধ করে আসবো। কিন্তু হাতে কয়ে অনেক কবিতা এনেছিল, পড়ে শোনাতে চাইল। না বলতে পারলাম না। জানতো তুমি কি রকম কবিতা ভালবাসি।"

জানি তুমি কবিতা ভালবাস; সেই কবিতা ছন্দে-সুরে [illegible] অনার্য্য-প্রেমিক তোমাকে শুনাইত। অন্যের উদ্দেশ্যে রচিত তৃতীয় ব্যক্তির যে-সব কাব্য-সংগ্রহ পাঠ করিয়া তুমি লুব্ধ হইতে সেইরূপ কাব্য তোমাকে উদ্দেশ্য করিয়া সে রচনা করিয়াছিল। কবিত্বের মধ্য দিয়া প্রেমনিবেদনকে প্রত্যাখান করিতে পার নাই। হীনবর্ণ পুরুষের প্রেমপ্রকাশে তোমার শিক্ষাসংস্কারযুক্ত যে চিত্তের একপার্শ্ব বিতৃষ্ণায় বিমুখী হইয়া উঠিত, সেই চিত্তেরি অন্যপার্শ্ব সুরের আহ্বানে অহরহ স্পন্দিত হইত। অসভ্যজাতির সহিত সভ্যজাতির যোগসূত্র আদিম যুগ হইতে আজিও এক।

"ইন্দ্র, নিজের অজ্ঞাতে বহুদূর এগিয়ে গেলাম। কল্‌কাতায় স্বপ্নেও যা ভাবতে পারিনি ওখানে তাই হোল। এখনও ভাবতে আমার আশ্চর্য্য লাগে কি করে অত নীচে আমি নামতে পেরেছিলাম! কী শাসনের মধ্যে অতি ভদ্রভাবে বাবা আমাকে মানুষ করেছিলেন। তা তো বলেছি।"

রেণুকা দেবী, অতি-ভদ্রতা ও অতি-শাসনে তোমার সকল সত্তা রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। প্রেমবিহীন যৌবনের প্রান্তে উপনীত হইলে যে হতাশা, যে বন্ধনহীন দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় তাহাই তোমাকে সমাজ-সংস্কারের গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া অনার্য্যের বাহুপাশে আনিয়াছিল। অতি-মুক্ত লতার মত কোমল ছিল তোমার আশ্রয়প্রার্থী নারীচরিত্র। প্রতিরোধের ক্ষমতা তুমি হারাইয়া ফেলিয়াছিলে।

"ইন্দ্র, তুমি তো সমস্ত বোঝো। কী রকম যেন হয়ে গেলাম। ধরা পড়বার ভয়, ঘৃণা এ সমস্ত যেন আমাকে আরো ওইদিকে ঠেলে দিত। ব্যবহার, কথাবার্ত্তা কিছুই তার সাঁওতালের মত নয়। আর, দেখতে বড় সুন্দর ছিল। যতক্ষণ সামনে থাকতো ততক্ষণ কোন

দ্বিধাই আসতো না। পরে মনে ভেবে দেখ্‌লে একটা বিশ্ব[illegible] কিন্তু আবার কাছে আসলেই সেটা মিলিয়ে যেত। [illegible] তুমি বুঝে নিও।

আমি বুঝিয়াছি। আরো বুঝিয়াছি আজ এ [illegible] মধ্যে তোমার কতখানি গৌরব আছে। একদি[illegible] যৌবনে[illegible] আহ্বানে, প্রেমের আহ্বানে তুমি অসঙ্কোচে দ্বিধা-ভীরুতা [illegible] করিয়া সাড়া দিয়াছিলে। তোমার এই বাতব্যাধি-পীড়িত, গলিত, শিথিল দেহের [illegible] অংশ একদিন একজন ভালবাসিয়াছিল। হে আজন্মকুমারী প্রৌঢ়া, আজ সে-স্মরণ তোমাকে পুলক দিতেছে। রেণুকা দেবী, তোমার কলঙ্ক সেদিন ছিল না, তোমার কলঙ্ক আজ এইখানে।

দুইদিন হইল রায়সাহেব অসুস্থ হইয়া বিরক্তচিত্তে দিবা অতিবাহন করিতেছেন। সাহিত্য সভার উদ্যোগপর্ব্বে তাঁহার সর্দ্দারী ক্ষান্ত পড়ায় ক্রোধ তিনি অনেকটা কন্যার উপর দিয়া ঝাড়িতেছেন।

দুইদিন রেণুকা ঝরণার ধারে যায় নাই। অবশ্য ইচ্ছাও তাহার ছিল না, পিতার অসুস্থতা একটি অজুহাত মাত্র। কিছুদিন পূর্ব্বে আকর্ষণ-বিকর্ষণের মন্থনে যে বিষ উঠিয়াছে, তাহার ক্রিয়ায় রেণু অবসন্ন। আজ মুক্তি তাহার একমাত্র কাম্য। মোহের শেষ পর্য্যায় পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে, অজানার ইঙ্গিত আর কিছু নাই।

প্রতিটি দিন তোমাকে যে লক্ষ্যে অগ্রসর করাইতেছিল, যে লক্ষ্যে উপনীত হইবার অন্ধ-বাসনা তোমাকে অহরহ শান্তিহীন করিয়া তুলিত, সেই লক্ষ্যস্থলে আসিয়া আজ তোমার সমস্ত বাসনা ও প্রেমের মৃত্যু হইল! প্রেমে যে চরমতার প্রত্যাশা নিজের অজ্ঞাতসারেও শৈশব

[illegible]য়া আসিতেছিলে তাহার প্রাপ্তিতে এত বিতৃষ্ণা কেন? [illegible] তুমি [illegible] জান না তুমি কি চাও।

আজ যাইতে হইবে। সে হয়তো অসহিষ্ণু হইয়া একটা অসঙ্গত কিছু করিতে পারে। তাহাকে অসহিষ্ণু হইতে দিবার সাহস রেণুর আজ নাই। রেণুর আত্মসম্ভ্রম সম্পূর্ণ তাহার প্রণয়ীর নীরবতার উপর নির্ভর করিতেছে।

"আসতে পারোনি, তাতে কি হয়েছে? বাবার অসুখ, আমি না হয় দেখতে যাব।" মুখের সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া সাঁওতাল যুবক রেণুর হস্ত ধারণ করিয়া ঈষৎ আকর্ষণ করিল। তাহার সমস্ত মুখে দ্বিধাহীন সারল্য, যাহা একমাত্র অনার্য্য জাতিতেই সম্ভব। স্বপ্নময় চক্ষু দুইটিতে তাহার একান্ত নির্ভরশীল প্রেম।

স্পর্শের সহিত রেণুর দেহ বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। কোনমতে অনিচ্ছার ভাব দমন করিয়া রেণু সবেগে প্রতিবাদ করিল, "সর্ব্বনাশ! বাবার সঙ্গে দেখা করতে কখনো যেও না।"

সে হাসিল, অতি সুগঠিত শুভ্রদন্ত অস্তসূর্য্যের আলোতে হীরক-দীপ্তিতে ঝলকিয়া গেল,—"রাগ করবেন তো? তাতে কি হয়েছে? একদিন তো বলতেই হবে।"

রেণু নীরব হইয়া রহিল। সে আশা করিয়াছে রেণু তাহাকে বিবাহ করিবে। যাহাকে অকাতরে নিজের দেহ ও প্রেম দান করা চলে, তাহাকেই যে পাণিদান করা যায় না অসভ্য যুবক তাহা জানে না। ড্রইংরুম-বিলাসী যে কোন সভ্য পুরুষকে যে-কথা রেণু অসঙ্কোচে বলিতে পারিত, আজ সেই কথা কবিতার ভাষায় তাহার মনে আসিলেও মুখে আসিল না—

"Thou lovest ; but ne'er knew love's sad satiety."

আবার পূর্ণিমা ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রশস্ত বারান্দায় বেতের আরাম-কেদারায় রায়সাহেব বসিয়া আছেন, তাহার পায়ের কাছে রেণু পদসেবা করিতেছে। রেখা ও পিসীমাও উপস্থিত। আর কয়েকদিন পরেই তাঁহারা কলিকাতা ফিরিয়া যাইবেন। সাহিত্য-সভা শেষ হইয়াছে, রায়সাহেবের প্রবাস-যাপনের উৎসাহও শেষ হইয়াছে।

যত ব্যস্ততা প্রয়োজন তাহার দ্বিগুণ ব্যস্ততায় এই বিলম্বিত সপ্তাহ ধরিয়া রেণু সংসার গুটাইয়া বাঁধিয়াছে। এস্থান হইতে পলায়ন করিতে পারিলে সে মুক্তি পায়। অশুচি স্পর্শের ন্যায় অবাঞ্ছিত স্মৃতি তাহাকে চিরদিন গ্লানি দিবে সত্য ; কিন্তু তাহা স্মৃতি মাত্র হইয়া থাকিবে ; ভীতিপ্রদ বাস্তবের রূপ ধরিয়া অনির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষায় তাহার বিমুখী দেহ-মনের নিকটে করপ্রসারণ করিবেনা। রেণু অবশ্য এ কয়েকদিন ঝর্ণার ধারে যাইবার অবকাশ পায় নাই। কল্য দেখা যাইবে।

কিন্তু, আজো উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে পুরুষমূর্ত্তি দেখা গেল, দূর হইতে আসিয়া রেণুদের বাড়ীর হাতায় সে প্রবেশ করিল। আজো পূর্ণ চন্দ্রালোকে গ্রীক-ভাস্কর্য্যের আদর্শ দেহ, তীক্ষ্ণ নয়ন, কোমল অধরোষ্ঠ পৌরুষ সৌন্দর্য্যে প্রতীয়মান হইল। যৌবনের ডাক, প্রেমের ডাক পূর্ণচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া অনার্য্য-প্রেমিকের অশান্ত রক্তধারাকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া গৃহছাড়া করিয়াছে। এক সপ্তাহের অদর্শনে সে ব্যাকুল হইয়া তাহার প্রিয়ার কাছে আসিয়াছে, সরল বিশ্বাসে তাহাকে দাবী করিতে।

রায়সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রোষনেত্রে চাহিলেন। অনাত্মীয় যুবক অন্তরঙ্গভাবে তাঁহার পারিবারিক সম্মেলনে যেন যোগদান করিতে আসিতেছে। "কে? কাকে চাও তুমি?"

হেসে হাসিল সেই মনোহর আশ্চর্য্য হাসি, যাহা রেণুকে উন্মাদ করিয়া তাহার অত নিকটে টানিয়া লইয়াছিল। তাহার সাদর অভ্যর্থনায় যেন কোন সন্দেহ থাকিতে পারেনা এমনিভাবে সে বলিল, "আমি রেণুর কাছে এসেছি।"

"কী ?"—তীব্রবেগে বাতব্যাধি ভুলিয়া রায়সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন, —"রেণু !"

রেণুর ভীতিত্রস্তিত, ব্যাকুল দৃষ্টি একবার তাহার দিকে মিনতির আবেদনে ছুটিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে পিতার উগ্র মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রেণু স্পষ্ট উত্তর দিল, "ওকে আমি চিনি না।"

* *

"তারপর ?"—রেণুকা দেবীর আরো একটু নিকটে সরিয়া আসিলাম। না চাহিয়াও বুঝিলাম নয়নপল্লবে তাঁহার অশ্রুর আবির্ভাব।

"তারপর ইন্দ্র, আর বোলোনা। দু'একবার সে বল্‌তে চেয়েছিল আমার সঙ্গে তার আলাপ আছে। কিন্তু বাবা তখন ক্ষেপে গেছেন। আমাদের দারোয়ান আর দুজন চাকর তাকে বাবার হুকুমে ধরে বেঁধে ফেল্লো। তারপর আমাদের সরিয়ে দিয়ে তার শাস্তির ব্যবস্থা হোল। সুকী ব্যাপার দেখেই পালিয়ে গিয়েছিল। অত মার দেবার পরেও বাবা তৃপ্ত হলেন না। পুলিস্-ইন্‌স্পেক্টর বাবার বন্ধু, তাঁকে চিঠি লিখে ট্রেস্‌পাসের অজুহাতে থানায় চালান দিলেন। ছ'মাসের জেল হোলো।"

একবার শুধু জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কিছু বল্লেন না ?" মৃত পিতাকে স্মরণ করিয়া আজিও রেণুকা দেবী শিহরিয়া উঠিলেন,— "সর্ব্বনাশ! বাবা তাহ'লে আমাকে মেরেই ফেলতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ও-ও কিন্তু আর কিছু বল্লোনা। সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করলো।"

চিন্তা করিয়া বলিলাম, "বোঝা যাচ্ছে সাঁওতাল ছেলেও সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করে ওর সহজ-বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ হয়েছিল। যেখানে প্রতিবাদ করে লাভ নেই, বরঞ্চ লোকসান, সেখানে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের রীতি।"

রেণুকা দেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শান্ত্বিত হইলেন,—"আমার মনে হয় আমার নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে ঘৃণায় সে চুপ করে ছিল। ইস্ত্র, মহাপাপ করেছি। এর প্রায়শ্চিত্ত কবে শেষ হবে?"

প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই। যুগ যুগ ধরিয়া এমনি ঘটিতেছে। পবিত্র আর্য্যশোণিতের জয়যাত্রায় বহু অনার্য্য রক্তধারা নীরবে বহিয়া গিয়াছে। বহু নারীর পদ-প্রসাধনের নিমিত্ত বহু পুরুষের হৃদয়রক্ত উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। এসব কথা ভুলিয়া-থাকাই মঙ্গল। সুতরাং, হে রেণুকা দেবী, তুমিও ভুলিয়া যাও।

কুঁড়ির কাণে সূর্য্যের আলো এসে বলে,
ওগো জাগো, আমি দেবো তোমাকে রূপ।
জাগে না কুঁড়ি।
বাতাস এসে বলে, ওগো জাগো,
আমি দেবো তোমাকে সুবাস।
জাগে না কুঁড়ি।
ভ্রমর এসে হুকুম করে,
খোলো দ্বার, এসেছি নিতে, দিতে নয়…
গর্ব্বে কুঁড়ি হয়ে ওঠে ফুল।

অশুচি

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

নতুন পূজারী সুদর্শন ঠাকুর যেদিন এসে তালুকপুরের জমিদার প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে স্বর্গগত পিতার পরিত্যক্ত কর্ম্মভার গ্রহণ করলো, সেদিন গ্রামের সকলেই একবাক্যে বললো, "হ্যাঁ, এইবার বাবা গোপীনাথের উপযুক্ত পূজারী হয়েছে।"

সুদর্শন সবে যৌবনের দরজায় পা দিয়েছে। ঝক্‌ঝকে গায়ের রঙ, সুস্থ সবল দেহ, মাথায় সুবিন্যস্ত কোঁকড়ানো চুল···জমিদার প্রসন্নবাবু প্রথম দর্শনেই বিশেষ প্রীত হলেন এবং সেই সঙ্গে গ্রামের অন্য সকলেও তাকে গ্রহণ করলো সস্নেহ সমাদরে। সুদর্শন আসার পরই ঠিকে পূজারী বিদায় হ'ল এবং বংশপরম্পরাগত কার্য্যে সুদর্শন পাকাপাকি বাহাল হ'ল।

তালুকপুর গ্রামটী ছোট। মাত্র—বিশ-ত্রিশ ঘর লোকের বাস। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ছুতোর ও দু' একঘর অন্য জাতি বাদে বাগ্‌দীদের সংখ্যাই বেশী। বহু পুরোনো গ্রাম। প্রসন্নবাবুরাই একমাত্র বনেদী বংশ ও কুলীন। ছোট সংসার। স্ত্রী মায়া দেবী ও একমাত্র কন্যা শীলাই হ'ল বাড়ীর সম্বল। প্রসন্নবাবু গ্রামের সর্ব্বময় কর্ত্তা। মেয়ে শীলা এইবার পনেরোয় পা দিয়েছে। স্নেহের যা কিছু বন্ধন তা এই মেয়েটী। তাই আজও স্ত্রীর সহস্র অনুরোধেও প্রসন্নবাবু ওর বিয়ের কোন কথাবার্ত্তাই উত্থাপন করেন নি। সেকেলে লোক তাই মেয়েকে গৃহকর্ম্ম পূজা-অর্চ্চনা প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মের শিক্ষা দিচ্ছিলেন অতি ছোটবেলা থেকে। শীলারও এসব বেশ ভাল লাগে। সুদর্শনকে

দেখে শীলাও বলেছিলো তার বাবাকে, "এইবার যদি ঠাকুরের পূজা ঠিক মনের মত হয়।"

যেদিন বহাল হ'ল তার পরদিন খুব ভোরে সুদর্শন ঘুম হতে উঠে বাগান থেকে ফুল, বেলপাতা দুর্ব্বা তুলে রেখে স্নান করে আসলো। আগের দিনই সে সমস্ত ঠিক করে বুঝে নিয়েছিলো তাই কোন জিনিসের জন্ত তাকে ব্যস্ত হতে হয় নি। সুদর্শন খুব ভাল কীর্তন জানতো। গুণগুণ করে কীর্তন করতে করতে দুটী মালা গেথে একটী ঠাকুরের গলায় পরালো আর একটী নিজে পরলো। ঠাকুরকে চন্দন দিয়ে নিজে কপালে তিলক কেঁটে, ধূপদীপ নৈবেদ্য সাজিয়ে সে পূজায় বস্‌লো।

শিশুকাল থেকে সে অন্তরে নিয়ে এসেছিল কোন্ পূর্বজন্মের পুণ্যের ফলে দেবতার প্রতি অসীম ভক্তি। তাই মাইনে-করা পূজারী ব্রাহ্মণ হলেও, দেব-বিগ্রহের সামনে তার মূর্ত্তি যেতো বদ্‌লে। সমগ্র চেতনা তার আরতির প্রদীপের মত জ্বলে উঠতো। সে নিজেকে ফেলতো হারিয়ে। এত সকালে ইদানীং আর ঠাকুরের পূজা হতো না তাই শীলা মন্দিরে আসে নি। ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে যখন সে মন্দিরে এসে দেখলো সমস্ত আয়োজন ঠিক করে সুদর্শন ভাবাবিষ্ট হয়ে পূজা করছে তখন হঠাৎ যেন কিসের স্পর্শে তার কিশোরী-চিত্ত আবিষ্ট হয়ে উঠলো। মনে হলো, সেই ধ্যান-স্তিমিত নতুন পূজারীর পূজা-নৈবেদ্যের মধ্যে এতদিন পরে যেন তার নিজের ভক্তিও মূর্ত্তি নিয়ে উঠেছে। কতক্ষণ জানে না, হঠাৎ শঙ্খ-ধ্বনিতে তার চমক ভাঙতেই দেখলো বিস্ময়াবিষ্ট সুদর্শন পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তারই দিকে চেয়ে। নিঃশব্দে শীলা বেরিয়ে এলো মন্দির থেকে। তার মনের মধ্যে কি যে হতে লাগ্‌লো, তা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারলো না।

দিনের শেষ আলোটুকু নিঃশেষে মিলিয়ে গেল দিগন্তের বুকে এবং সন্ধ্যার ম্লান ছায়াকে অপসারিত করে সন্ধ্যাতারার সঙ্গে হেসে উঠলো তৃতীয়ার ফাল্গুনী চাঁদ।

নতুন পূজারীর আরতি দেখতে গ্রামের প্রায় অনেকেই উপস্থিত হ'ল মন্দির-প্রাঙ্গনে। মন্দিরের পাশের ঘরে গৃহিণী মায়াদেবী শীলা ও রায় বাড়ীর মেয়েরা বসেছে। জমিদার প্রসন্নবাবু হাত জোড় করে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে। তার আশেপাশে গ্রামের অন্যান্য সকলে। সমস্ত গুছিয়ে সুদর্শন বাঁহাতে ঘণ্টা ও ডান হাতে ধূপতি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আরতির বাদ্য মৌন-সন্ধ্যাকে সজীব ভাষা-মুখর করে তুল্‌লো। গরদের কাপড়-পরা, গলার উপর দিয়ে চাদর কোমরে বাঁধা, গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দনের ফোঁটা ও বাঁ-হাতে ঘণ্টা এবং ডান হাতে ধূপতি নিয়ে যখন সুদর্শন উঠে দাঁড়িয়ে তালে তালে পা ফেলে আরতি করতে লাগলো তখন সকলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চেয়ে রইলো তার দিকে। আরতি শেষ হ'ল। চরণামৃতের পাত্র হাতে উঠে দাঁড়াতেই সুদর্শনের দৃষ্টি পড়লো শীলার উপর। এক মুহূর্ত্ত কি ভাবলো, তারপর সবাইকে চরণামৃত দিয়ে আবার এসে বসলো আসনে। বাইরে তখন প্রাঙ্গনতল তার প্রশংসায় মুখরিত। প্রসন্নবাবু মহা খুশী হয়ে বল্লেন, "হ্যাঁ, এই তো পুরোহিত, দেবতাকে জাগাতে পারে বটে।"

* *

ঠিক এক বছর পর। এই এক বছরের ইতিহাস সুদর্শনের জীবনের এক মধুময় স্বপ্ন-অধ্যায়। সে এখন শুধু মাত্র পূজারী নয়। গ্রামের কারও সে বাবাঠাকুর, কারও মামা, কারও ভাই। এমনি আত্মীয়তার বন্ধন আজ তার প্রত্যেকটী গ্রামবাসীর

সাথে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সে সবার সাথেই মেলামেশা করে। রোগে শোকে সান্ত্বনা দেয়। তার মধুকণ্ঠের অপূর্ব্ব কীর্ত্তনে নিরানন্দ গ্রাম আনন্দ-মুখর। কীর্ত্তনের প্রধান আসর বাগ্‌দী পাড়ায়। বাগ্‌দী পাড়ার সুজন ও মনোহর বেশ ভাল কীর্ত্তন করে বলে তাদের ওখানেই রোজ কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তন করতে করতে যখন সুদর্শনের দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, তখন সকলে তাকে চারদিকে ঘিরে আত্মহারা হয়ে নাচতে থাকে। কীর্ত্তন শেষ হতে কোন কোন দিন ভোর হয়ে যায়।

পূজারী হিসাবে যা মাইনে পেতো, বা গ্রামের লোকদের কাছ থেকে যে দক্ষিণা পেতো, শত চেষ্টা করেও তার এক পয়সা সে সঞ্চয় করতে পারে নি। বাগ্‌দী পাড়ায় গরীব লোকের অভাব নেই, আর তারা জানে দুঃসময়ে বাবা ঠাকুরের কাছ থেকে শুধু হাতে কেউ ফেরেনা। বিশেষ করে কাতরা তুফানীর মা সেই বিধবা বাগ্‌দী রমণীকে সুদর্শন মা বলে ডাকতো। বিধবার সম্বল বলতে একমাত্র মেয়ে তুফানী। কচি শশাটা, নেবুটা প্রায়ই নিতে হয় তাকে এই বিধবার কাছ থেকে। সুদর্শন কত মানা করেছে এসব দিতে, বরং বিক্রী করলে দুটো পয়সা হবে বলেছে, তার উত্তরে তুফানীর মা বলতো, "আপনাকে দিয়ে যে আমি শান্তি পাই বাবা।" তার উত্তরে সুদর্শন আর কিছু বলতে পারতো না।

* * * *

প্রতিদিন পূজারী আসবার আগেই নীলা স্নান সেরে শুভ্র বসনে মন্দিরে অপেক্ষা করে। সুদর্শন যতক্ষণ পূজা করে, নীলার দেহ মন যেন ধূপের ধোঁয়ার মত তাকে বেষ্টন করে ঘুরতে থাকে। পূজা শেষ হলে, যাবার মুখে যা দুটী একটী কথা হয়···তার মধ্যেই দুটী ভীরু মন পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে ধরতে যায়। ইদানীং সেই দুটী

একটা কথার সুর হঠাৎ যেন বদলে গিয়েছে। শীলা অনুযোগ করে, সারারাত জেগে বাগ্দী-পাড়ায় কীর্ত্তন করলে, সকালে আর কি পুজোয় মন বসে?

সুদর্শন মৃদু হেসে বলে, কীর্ত্তন সে-ও তো পূজো!

কিন্তু তুফানী? সে-কথা আর তুলতে পারেনা শীলা। কিন্তু যত দিন যায়, যত বাগ্দীপাড়ার লোকদের মুখে সে শোনে বাবাঠাকুরের প্রশংসা, ততই তার মনের মধ্যে পাক খেতে থাকে, একটা কথা। সে-কথা সে বাইরে মুখ ফুটে বলতে পারে না, বলতে পারেনা বলে সে নিজের মনে নিজে ওঠে জলে।

অকারণ রূঢ় হয় সুদর্শনের ওপর। সুদর্শন কিন্তু কিছু বলে না।

* * * *

সেদিন নিজে সযত্নে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা সিধে সুদর্শনের বাড়ী পাঠালো। যে ঝি নিয়ে গিয়েছিল সে ফিরে এসে খবর দিল, তুফানীর মা আর তুফানীর সঙ্গে ঠাকুর কথায় কথায়…তুফানীর মা একটা কচি পাঁঠা, একছড়া কলা আর এক হাঁড়ি দুধ বাবাঠাকুরের সেবার জন্যে দিয়ে এসেছে…

শীলা গর্জ্জন করে উঠলো, তুই আমার সিধে ফিরিয়ে আনলি না কেন?

ঝি অবাক হয়ে বলে, সে কি কথা দিদিমনি?……

শীলা আর দাঁড়াতে পারে না…রাগে কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে……

বাগ্দীপাড়ার রাত জেগে কীর্ত্তন, সময় নেই অসময় নেই তাদের সঙ্গে মেশা, বিশেষতঃ তুফানীর মার কাছ থেকে ঠাকুর পূজার অজুহাতে ফল, শাকপাতী নেওয়া—এযেন শীলার অসহ্য হয়ে উঠলো। তার সমস্ত অন্তর অহেতুক বিদ্বেষে ভরে উঠলো—অথচ বলার কি-ইবা আছে?

সুদর্শন পূজারী মাত্র। পূজা করবে, মাইনে নেবে—তার বেশী লাভ বা দেওয়ার তার কি থাকতে পারে? মাঝে মাঝে এমন হয় যে সারা রাত্রি কীর্ত্তন করে এসে সুদর্শন অনেকবেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে—সময় মত ঠাকুর পূজা হয়না। তার জন্ত বেশ দুকথা শুনতে হয় শীলার কাছে। কৈফিয়ৎ তলবে যুক্তিহীন নির্ব্বিকার থাকে সে। তাতে শীলা হয়ে ওঠে আরও রূঢ়। নারী-মনের অর্থহীন বিদ্রোহ নির্ব্বিকার পুরুষমনে কোন সংঘাত বা বিপ্লবই সৃষ্টি করতে পারেনা। তাই শীলা যত কথাই বলে সুদর্শন নেয় মাথা পেতে।

*

যেমন একদিকে গ্রামের সবাই ভালোবাসতো সুদর্শনকে তেমনি আবার দু'এক জনের কাছে সে অপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিলো। তাদের মধ্যে শ্যামু বাগ্দীই প্রধান। সে কোনই দেখতে পারেনা সুদর্শনকে। শ্যামুর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। সে চেয়েছিলো তুফানীকে বিয়ে করতে, কিন্তু সুদর্শনের কথায় নাকি তুফানীর মা তাতে রাজী হয়নি। সেই থেকে শ্যামু সুযোগ খুঁজছিলো সুদর্শনকে জব্দ করবার। শ্যামু বহুদিন চাকুরি করেছে প্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে। গৃহিণী মায়াদেবী তাকে শ্যামুদা বলে ডাকতেন এবং প্রায়ই টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। দীর্ঘ এক বছর পর সুযোগ বুঝে একদিন শ্যামু মায়া দেবীর কাছে একথায়-ওকথায় সুদর্শন ও তুফানি সম্বন্ধে একটা বিশ্রী ইঙ্গিত করলো। কথাটা শুনেই মায়াদেবী দৃঢ়স্বরে বল্লেন, "যা বল্লে, বল্লে, আর কেউ যেন না শোনে। বাবু শুনলে তোমার ওপরই রাগ করবেন।" মায়াদেবীর উত্তরে হাত কচ্‌লিয়ে নেহাৎ মনোকষ্টে শ্যামু ফিরে এলো।

*

সেদিন সমস্ত রাত্রি কীর্তন করে এসে পূজায় বসতে সুদর্শনের আটটা বেজে গেছে। শ্যামুর মুখে সেই বিশ্রী কথাটা বার বারকৎ শুনে অবধি শীলার মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো—সে পূজা শেষ না হওয়া অবধি দাঁড়িয়ে রইলো পূজার মণ্ডপে। যখন পূজা শেষ করে সুদর্শন উঠে দাঁড়ালো, তখন রূঢ়কণ্ঠে শীলা বল্‌লো, "আপনি কি কীর্তন করার জন্যই এখানে এসেছেন, না পূজা করতে, বলুন তো? সমস্ত রাত্রি যত ছোটলোকদের সাথে গাঁজা খেয়ে কীর্তন করাটাই যদি ভাল লাগে তাহলে আমাদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তাই করুন।" নতমুখে জড়িতকণ্ঠে সুদর্শন উত্তর দিলো, "আমি তো গাঁজা খাই না! আর, ওরা আগে খেতো, এখন আর খায় না।"

তেমনি রূঢ়কণ্ঠে শীলা বললো, গাঁজা না খেলে অমনি চোখ দুটী রক্ত জবার মত হয়, না? আপনি আমায় অত বোকা মনে করবেন না। নিরুত্তর সুদর্শনের চোখে চোখ রেখে শীলা আবার বল্‌লো, "বাগ্দীপাড়ার বকুল গাছ ছাড়া বুঝি আর গ্রামে বকুল ফুল কোথাও মেলেনা, না? ফুল বেলপাতা থেকে আরম্ভ করে পূজার সব কিছুই বুঝি আপনার জন্যে ভগবান বাগ্দীপাড়াতেই বন্দোবস্ত করেছেন, কেমন?" মুহূর্তের জন্যে সুদর্শনের মনে আনে আলোড়ন কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলিয়ে তারে সুদর্শন, "আমি যে মাইনে-করা পূজারী!" সামনের দেয়ালে ঘড়ি টিক্‌টিকি টক্‌টক্ করে ওঠে! শীলা আরও কি বলতে যাচ্ছিলো এমন সময় ডালাতে করে কচি শশা আর লাউশাক নিয়ে তুফানী এসে ডাক্‌লো, "দাঠাকুর"! সুদর্শন চাইলো বাইরের দিকে। ঝড়ের মত বাইরে এসে শীলা ঝাঁঝালো স্বরে বল্লো, "কেন, দাঠাকুরকে দিয়ে কি দরকার?" থতমত খেয়ে ভয়ে ভয়ে তুফানী উত্তর দিলে, "মা পাঠিয়েছে ঠাকুর সেবার জন্য"।

শীলা তবু পারে না বলতে।

পরের দিন ভোর বেলা, সে নিজেই উঠে চলেছে সুদর্শন [illegible] বাড়ী।

ভোরের শিশিরে পা লেগে শরীর উঠছে শিউরে··

সুদর্শনের বাড়ীর সামনে এসে দেখে, দরজা খোলা···

ভেতরে ঢুকে দেখে, তুফানী—রকে পড়ে আছে···তার চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল···

কোনরকমে নিজের অন্তরের তরঙ্গ-জ্বালা চেপে রেখে শীলা জিজ্ঞাসা করে, ঠাকুর কোথায়?

নিজের বুকের ভেতর থেকে একজোড়া খড়ম বার করে তুফানী বলে, তিনি চলে গিয়েছেন!

শীলা-তেমনি আসে ফিরে···

গোপীনাথের মন্দিরে [illegible] ঘণ্টা বাজে···কিন্তু আর সে যায় না মন্দিরে···

নিজের মনে সে গোপীনাথকে ডেকে বলে, তুমি [illegible] নও··· তুমি শুধু পাথর!

———

অলৌকিক রোমান্স

(শুভ্র-পর্ব)

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দাড়ি কামাতে গিয়ে ক্ষুরটা ঠোঁটের ওপরে খানিকটা বসে গিয়েছিল।

সেফ্‌টি রেজরে আমি কামাতে পারি না—ওর প্রতি আমার একটা সহজাত বিতৃষ্ণা আছে। ওর চেহারাটাই কেমন অহিংস আর অমায়িক, কেমন যেন ছেলে-মানুষি বলে মনে হয়। কিন্তু একখানা ঝকঝকে বাট্‌র্লারের ক্ষুর—তার আভিজাত্যই আলাদা। উজ্জ্বল দীর্ঘ ফলা, আলো পড়লে ঝিকিয়ে ওঠে—যেন একটা শক্তি আর মনীষার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে তার থেকে। তা ছাড়া নিরুপদ্রব শান্ত জীবনে মাঝে মাঝে যখন [illegible] চাগিয়ে উঠতে চায় তখন হাতে একখানা ধারালো ক্ষুর পেলে নিজেকে অত্যন্ত বেশি পৌরুষিক বলে বোধ হয়। কামানোর স্বচ্ছন্দ আরামের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম।

কিন্তু সার্থক হতে গেলেই রক্তপাতের আশঙ্কা আছে। যুদ্ধের ক্যাজুয়ালটি—দাড়ি বনাম ভব্যতার যুদ্ধ। তাই বেমক্কা ক্ষুরের টানে ঠোঁটের খানিকটা খচ্‌ করে কেটে বসল। ফলে অনিচ্ছাকৃত ভাবে দিন কয়েকের মধ্যেই মুখের ওপর সুস্পষ্ট নীলিম-রেখায় একজোড়া গোঁফ আত্মপ্রকাশ করলে। বাটারফ্লাই নয়—আগণ্ড।

বৈঠকখানা ঘরে দীনবন্ধু দাদা-মশাই তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে ঝিমুচ্ছিলেন। শান্ত অলস দুপুর, বাইরের মুকুলিত গোলাপ-জাম-গাছ থেকে মিষ্টি ফুরফুরে হাওয়া। খালের ওপারে দত্তদের বাড়িতে

বিয়ে—স্নিগ্ধ ফাল্গুনের রোদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সেখানে চলছিল সানাই বাজছিল। দাদামশাইয়ের ঝিম আসাটা অসম্ভব মনে হল না।

আমার পায়ের শব্দে দাদামশাই চোখ মেলে তাকালেন।

—'রঞ্জন নাকি? এসো ভায়া, এসো।'

—'আপনি ঘুমুচ্ছিলেন দাদু, তা হলে আমি যাই।'

—'না, না ভায়া এসো, বোসো একটুখানি। বুড়ো মানুষের ঘুম হচ্ছে কাবলী-বেড়ালের মতো, ফাঁক পেলেই একটুখানি ঝিমিয়ে নিই। সে ছেড়ে দাও। আর তোমার মতো মহাজনের আবির্ভাব—সেও তো একটা মস্ত কথা। জানোই তো, "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা, ভবতি ভবার্ণব—।"

—'সজ্জন চাচ্ছেন? তা হলে কবিরাজ মশাইকে ডেকে দিচ্ছি।'

—ওরে বাবা!'—দাদু সভয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলেন: ডাক্তার কবিরাজ মানেই তো পরলোকের পাশপোর্ট পকেটে করে বয়ে আনে। কবিরাজ মশাইয়ের কথা শুনলেই মনে হবে আমার অপস্মার আসন্ন অথবা জরাতিসারের লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বয়েস হয়েছে বলেই সবসময়ে যমরাজকে স্মরণ করতে আমি রাজী নই ভায়া। তার চাইতে তোমাদের মতো টাটকা তরুণদের দেখলে আনন্দ হয়, মনে হয় পৃথিবীটা এখনো মোহমুদ্গর হয়ে যায় নি—পুরুষান-বিলাসের কাল আজো রয়েছে।'

দাদামশাই শেষ কথাটা ঠাট্টা করে বললেন কিনা বুঝতে পারলাম না। আমার মনে হল এর মধ্যে কোথায় যেন গভীর একটুখানি বেদনা রয়েছে। যৌবনের দিক্‌চক্রের দিকে অন্তচারী জরার বিদায়-মলিন দৃষ্টি। খালের ওপারে দত্ত-বাড়ির সানাইটা তেমনি অপরূপ মধুর হয়ে বেজে চলেছিল।

দাদু মিনিট-খানেক চোখ বুঁজে গড়গড়ার ধোঁয়া টানলেন। তারপরে এতক্ষণে আমার দিকে ভালো করে তাকিয়েই চমকে উঠলেন যেন।

—'করেছো কী ভায়া! আঁ্যা—আরে—এতক্ষণ দেখিনি তো?

বললাম, 'কী করেছি?'

—'ওই গোঁফ? হঠাৎ চৌগোপ্পা হওয়ার সাধ গেল যে? যদ্দূর জানি অনেক পুরোনো আবর্জনার সঙ্গে ওটাকেও তো তোমরা বহুকাল আগে নিকেশ করেছো।'

আমি হাসলাম: 'ওটা রাখতে হয়েছে বাধ্যতামূলক ভাবে। কিন্তু রাখলেই বা ক্ষতি কী। গোঁফ-দাড়ি তো পৌরুষের বিধিদত্ত অধিকার। ওটাকে বর্জন করে সব সময়ে মেয়েদের মতো পেলব-গণ্ড হয়ে থাকতে হবে তার কী মানে আছে।'

দীনবন্ধু দাদামশাই চোখ দুটো বিস্ফারিত করলেন: 'অ্যাঁ—একি কথা শুনিলাম মন্থরার মুখে! কলেজে প্রাচীন-সাহিত্য পড়াতে গিয়ে তুমি কি প্রাচীন-পন্থী হয়ে গেলে নাকি! তা এ সম্বন্ধে আমার দিদিমণি কী বলেন? কোনো একটি কাব্য-মণ্ডিত অবকাশে দুই পেলব-ওষ্ঠে ওই ঝাঁটা গোঁফের সংঘাত কি রক্তপাত ঘটায়না?'

—'সেটা এখনো পরীক্ষা হয় নি। গোঁফ ওঠবার আগেই দিদিমণি বাপের বাড়ি গেছেন।'

—'হুঁ!'—দাদু গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন: 'তাই পরমানন্দে স্বেচ্ছা-ভোজন মানে স্বেচ্ছা-গুম্ফন করে বেড়াচ্ছো। একবার দিদি-মণি আসুন, মুখের ওপর বিজয়-গর্বে ওই পৌরুষের ঝাণ্ডা উড়োনো বেরিয়ে যাবে।'

—'দাদু, আপনি কাপুরুষের মতো কথা বললেন। জানেন, এ

নতুন যুগ? শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীর যে দাসত্ব আমরা স্বীকার করে এসেছি, এবার তার প্রতিবিধান করব। আমি ঠিক করেছি এবারে আমি গোলগাল একজোড়া গোঁফ ত রাখবই, দরকার হলে কবিগুরুর মতো দাড়িও রাখতে পারি। তিনি তো এদের 'পুরুষজাতের মুখ্য বিজয়কেতু' বলে উদ্দীপনাই জানিয়ে গেছেন।

—'থামো ভায়া থামো। তোমার বক্তৃতা কলেজের বহ্নশক্তি, উগ্রশক্তি আর অনেক শক্তির জন্যেই তুলে রেখে দিয়ো। যথা সময়ে দেখা যাবে এই বক্তৃতা কোথায় গিয়ে ঠেকে।

আমি সহর্ষে বললুম, দেখবেন।'

—'দেখব আবার কী। ভায়া হে, এই দীনবন্ধু সেন শর্মাই তল পড়ে গেলেন তো শ্রীমান রঞ্জন কোনু ছার। গল্পের নামে আজকাল দু চারটে অপাঠ্য প্রলাপ লেখো শুনতে পাই, তাইতেই বুঝি নিজেকে দিগ্‌গজ ঠাউরে বসে আছো? নারীজাতিকে চিনতে তোমার এখনো দেরী আছে। দিদিমণি ভারী লক্ষ্মী মেয়েটি বলে করে খাচ্ছো, তোমার দিদিমা হলে 'নাচে ভালু ভাল্' বলে নাচিয়ে দড়ি দিয়ে ঘোরাত।

—'আপনাকে ঘুরিয়েছেন বুঝি?'

—'ঘোরান নি আবার? সেদিন কাঁঠালের গল্প তো শুনেছো, আজ গোঁফের গল্প শোনো। শুনলে মন পবিত্র হবে—নিজের ধৃষ্টতার পরিমাণও বুঝতে পারবে। নিতান্ত একজোড়া নিরীহ গোঁফ নিয়ে মেয়েরা যে কী ঘটিয়ে বসতে পারে, সেটা জানলে নারী-চরিত্র সম্বন্ধে তোমার খানিকটা ধারণা এসে যাবে আর গল্পগুলোও ভদ্রলোকের পাতায় পরিবেশনের যোগ্য হবে।'

আমি খুসি হয়ে ঘন হয়ে বসলুম।—'বেশ, গলবস্ত্র হয়ে পবিত্র চিত্তেই শুনছি।'

'নিশ্চয়—গুম্ফবিস্তা প্রায় ব্রহ্ম-বিস্তার কাছাকাছি। ওরে ভৈরব, তামাক দে।'

দীর্ঘশ্বাস দাদামশাই সুরু করলেন :

আমাদের ছেলেবেলায় দেশের হাল-চাল আলাদা ছিল তারা। তখনকার মানুষগুলো এমন করে ম্যালেরিয়ায় জলে ভদ্রলোক হয়ে যায় নি তো—কাজেই দেওয়ানির চাইতে সে-সময়ে ফৌজদারীর দাপটটাই ছিল বেশি। তা ছাড়া আমাদের এই বরিশাল জেলায় যাদের চরের জমিদারী রাখতে হত—জোর যার মুলুক তার নিয়মটা জানা না থাকলে তিন দিনেই তাকে সব লাটে তুলে দিয়ে সন্নিসি হতে হত—এর অন্যথা ছিল না। আজকের দিনেও এটা যে পুরো-পুরি পাল্টে গেছে তা নয়—বরিশালের ছেলে হয়ে এখবর বোধ করি তুমি জানো।

আমার বাবা রাঘবেন্দ্র সেন চৌধুরী মারমূর্তি জমিদার ছিলেন। নিজের হাতেই যে লাঠি ধরে কবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা করেছেন তার ঠিক নেই। এমন কি আমার শ্বশুর মশাই করালীকান্ত গুপ্ত চৌধুরীর সঙ্গেও তাঁর একবার ভালো করেই জমে উঠেছিল, 'প্রেমের কাহিনী'তে সে গল্প তোমায় বলেছি।

সে যুগের আরো দশজন জমিদারের মতো, বাবাও লাঠিয়াল পুষতেন। আর সেই লাঠিয়ালদের মধ্যমনি ছিল সাজাউল্লা—ওরফে সাজু সর্দার। যেমন বুক, তেমনি হাতের গুল, আর তেমনি পায়ের জাং। আড়িয়াল দ'র এপার থেকে তার সাধা গলার হাঁক শুনলে ওপারের মানুষের পিলে চমকে উঠত। পশ্চিমী মুসলমান, বাবা কোথা থেকে তাকে জুটিয়ে এনেছিলেন, তিনই জানতেন।

বেশিদিনের কথা তা নয়, মাত্র বছর চল্লিশেক হল। সত্যি, এর

মধ্যেই ওসব মানুষ গেল কোথায়! চার পাঁচশো ডন-বৈঠক দিতে পারত, লাঠি ঘুরিয়ে নাকি বন্দুকের গুলি ফেরাতে পারত, রণপায় চড়ে মাঠ-ঘাট খানা-খন্দলের ওপর দিয়ে উড়ে আসতে পারত, আর এক এক গ্রাসে আধসের করে ছোলার ছাতু গিলতে পারত। আজকাল চারদিকে একপাল ভেড়াই দেখতে পাই, বাঘেরা আর নেই।

আমি বাধা দিয়ে বললুম, দাদু, ভুল উপমা দিলেন। বাঘেরা নেই তাতে আপত্তি করবনা, বাঘ পশু-শক্তির প্রতীক। পশুর কাল এখন শেষ হয়ে গেছে—তাই মানুষ সভ্য হচ্ছে, মার্জিত হচ্ছে। তাদের ভেড়া বলাটা আপনার যুগ-বিদ্বেষ ছাড়া কিছু নয়।

—'সভ্য?' দাদামশাই ভ্রূকুটি করলেন: 'সভ্যতার মানে কী? ডায়বেটিস্? ডিসপেপসিয়া? চাঁদ আর এলোচুল?'

—উঁহু। এখানেও ভুল। আধুনিক আকাশে যে চাঁদ ওঠে তা হরিণের শিঙের মতো বাঁকা আর নীলবর্ণ,—আজকালকার এলোচুলে সমুদ্রপারের পাইন বন থেকে ভিজে ভিজে হলদে সাপের বেগুনে গন্ধ আসে।

—'ভিজে ভিজে হলদে সাপের বেগুনে গন্ধ!' দাদু খানিকক্ষণ হাঁ করে রইলেন: 'রক্ষে করো ভাই—তোমাদের কাব্য আর সভ্যতা আমাদের পরম দুর্মেধস্ মগজে সেঁধোবে বলে মনে হয় না। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাও বোধ হয় এত দুরূহ নয়। অতএব ও তত্ত্ব থাক। আমাদের কালের গল্প বলছিলাম—তাই বলি।

সেই সাজু সর্দার। তার চেহারার বর্ণনা দিচ্ছিলাম, কিন্তু সবটা বলা হয়নি। তার সব চাইতে যে বিশেষত্ব ছিল—সে তার গোঁফ জোড়া। গালের পাশ দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে দুদিকের কান পর্যন্ত গিয়ে উঠেছিল। সে গোঁফের মহিমা আমি ভাষায় বলে উঠতে

পারবনা। সাজু দুবেলা তাতে তেল মাখাত—নাকের তলা দিয়ে টেরী হাঁটে দিত, আর যে যত্নটা করত অনেক বড় লোকের ছেলের বরাতেও তা জোটেনা।

ওই গোঁফ দেখে ভয়ঙ্কর লোভ হল আমার। নিজের দিব্যি চাঁছা-চোলা পূর্ণিমার চাঁদের মতো মুখে গালে হাত বুলিয়ে নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। ওই রকম একখানা গোঁফ না থাকলে আবার পুরুষ! সিংহের কেশর আর পুরুষের গোঁফ—এই হচ্ছে সৃষ্টির ধর্ম, এই জাতীয় একটা দার্শনিকতা আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল।

মাথার মধ্যে ঘুরছিল সেটা ভালো কথা, কিন্তু কাজে লাগাতে গিয়েই গোল বাধল। তোমার দিদিমা বজ্রতারা ওরফে তারা বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এল। আমার মুখের ওপর তখন বেশ নধর এক জোড়া কালো গোঁফের সূত্রপাত হয়েছে আর আমি দুবেলা সেটাকে টানাটানি করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করছি। এমন সময় সেই পৌরুষ-চর্চায় বিঘ্ন ঘটে গেল।

—'দিদিমা?'

—'নিশ্চয়।'—দাদামশাই গড়গড়ার ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'অমন প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধি আর কার হবে বলো? সাধে কি বুড়ো চাণক্য অমন বিধান দিয়ে গেছেন? তিনিও নিশ্চয় আমার মতো একজোড়া দশাসই গোঁফ রেখেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে সেটা বিসর্জন দিতে হয়েছিল।

—'নারীজাতির নিন্দে রেখে গল্পটা বলুন দাদু।'

—'দাঁড়াও রঞ্জন, দাঁড়াও। প্রেমের গল্প বলছি বুঝতে পারছনা মূর্খ? তোমাদের এ দিনের পর দিন হল কী বলো দেখি? আজকাল কি দুদণ্ড বসেও রসালাপ করোনা তোমরা? এটুকু ধৈর্য নেই কেন?

নাকি দিদিমণিকে কাছে পেলে প্রেমের অন্যান্য ব্যাপারে এত বেশি বিব্রত থাকো যে কথা বলে সময়টা অবান্তর নষ্ট করতে চাওনা ?'

আমি আপত্তি করে বললাম, 'দাদু এ প্রসঙ্গ ব্যক্তিগত এবং ইঙ্গিতটা ভালো নয়।'

দাদু হেসে উঠলেন : 'তোমার কোনো কালে কিছু হবেনা। কলেজে কাব্য পড়াও কী করে ?'

—'কাব্য পড়াইনা দাদু, কবিতাকে দর্শন আর ব্যাকরণ বানিয়ে ফেলি।'

—'হুঁ—তাই দেখছি। আমাদের সেই দণ্ডধর চূড়ামণি পণ্ডিত মশাইকে মনে পড়ছে। কালিদাস পড়াতে গিয়ে মল্লিনাথের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতেন,—আমরা অন্যমনস্ক হলে সাধুভাষায় অনুপ্রাস জুড়ে গর্জন করতেন : রে ব্যাল্লিক কুষ্মাণ্ড অপোগণ্ড! মৃৎ-ভাণ্ডের মতো তোর মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। তোমাদের মাস্টারদের জন্যে আমার দুঃখ হয় ভায়া।

—আমারও হয়। কিন্তু গল্পটা চালিয়ে যান দাদু।

—হাঁ, শোনো।

তাঁরা এল। দিনে-মানে কিছু ঘটলনা, মানে ঘটবার জো ছিলনা। সেতো আর তোমাদের কাল নয় ভাই, নববধূর স্বামী-সম্ভাষণ বৈষ্ণব কবিদের অভিসারের মতোই দুর্গম ব্যাপার ছিল তখন। দিনে দেখা হওয়া তো দূরের কথা, রাত্রেও সেই 'চলু গজ-গামিনী আরতি-বিথার' তার শয়ন এবং উত্থান কাক-চিলেও জানতে পারবেনা। জানলেও 'ঘরে গুরুজন—ননদী দারুণ'—অখ্যাতিতে দেশ ভরে উঠত।

রাত্রে যখন বাড়ি ঘুমিয়েছে, টিপিটিপি পায়ে তারা ঘরে এল। আমি তখন বিছানায় শুয়ে ছটফট্ করছি। বহুদিন বিচ্ছেদের পরে

প্রিয়া-সম্মেলন, তুমি নিজেও তো বর্তমানে বিরহে জর্জরিত হয়ে আছো—সে যে কী ব্যাপার সে তো বুঝতেই পারছ

ঘরে লণ্ঠনের আলো। রাজকন্যার মতো রূপের ঝলক দিয়ে তারা এসে দাঁড়াল! পানের রসে ঠোঁট রাঙানো, পরণে নীলাম্বরী, একেবারে চমক লাগিয়ে দিলে। দুহাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিতে যাবো, তারা তিন পা পেছিয়ে গিয়ে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, শেয়াল, শেয়াল।

—শেয়াল! —আমি তো হতবাক। বললুম, কোথায় শেয়াল!

—এই ঘরেই। দু দুটো।

—এই ঘরেই—দু দুটো! আবার কী মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? দিব্যি দোতলার ঘর, পদ্মের কাজ করা মেজে—ময়ূরপঙ্খী মেহেগনির খাটের তলাটা ঝকঝকে পরিষ্কার, শেয়াল আসবে কোত্থেকে? আমি লণ্ঠনটা হাতে করে বোকার মতো খুঁজতে লাগলুম। তারা বললে—দেখতে পাচ্ছোনা? গর্তে ঢুকেছে; শুধু লেজ দুটো বেরিয়ে আছে। আহাহা, তবুও দেখতে পেলেনা? তোমার নাকের মধ্যেই ঢুকেছে যে, ঠোঁটের দুপাশে একজোড়া লেজ,—টের পাচ্ছোনা?

অঃ, এতক্ষণে ঠাট্টাটা বুঝতে পারলুম। আক্রমণটা আমার গোঁফ জোড়ার ওপরেই। হেসে জবাব দিলুম, ভুল দেখেছ—ওটা শ্যালের লেজ নয়, সিংহের কেশর।

ঠাট্টায় ঠাট্টায় ব্যাপারটা যদি মিটত তা হলে তো কোনো কথাই ছিলনা। কিন্তু অত সুখ ভগবান কি আর কপালে লিখেছেন। দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত বিরহের পরে মিলনের যে ঘনীভূত সান্নিধ্যটা কামনা করছিলুম, একজোড়া গোঁফ তার মধ্যে ব্যবধানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকার তুলে দিলে।

তারা বললে, আমি ছিলুম না বলে রাজত্ব পেয়েছিলে, তাই না? কালই গোঁফ কামাতে হবে তোমাকে—নির্ঘাৎ।

আমি বললুম, কেন? গোঁফ তো পুরুষের অলঙ্কার—অহঙ্কারও বটে। আমাদের সাজু সর্দারকে দেখেছ? কেমন গোঁফ—কেমন জেল্লান—

তারা ভ্রূভঙ্গি করে বললে, হয়েছে, হয়েছে। কিসে আর কিসে! ওইতো চিংড়ি মাছের মতো চেহারা তার আবার আড়াই হাত গোঁফের সখ!

—'দাদামশাই, দিদিমার কথাগুলো ঠিক আর্যনারীর মতো শোনালো না তো?'

—'আলবৎ!' দাদামশাই জবাব দিলেন: তোমাদের আজকালকার মেয়েরা আর্যকন্যা-সুলভ সে ভাষামাধুর্যই ভুলে গেছে রঞ্জন। বড়জোর চোখ কপালে তুলে মিহি সুরে গানের মতো করে বলতে পারে: হাউ হরিবল! ইউ ব্রুট! কিন্তু আমাদের গিন্নীদের সেই 'মড়িপোড়া' 'অনামুখো' 'বাড়ুন খেগো' 'হাড় হাবাতে মিন্‌সে' সম্ভাষণের মধ্যে যে প্রাণান্তিক আর্যত্ব তোমরা তার কী বুঝবে ভায়া! বাঙালি মেয়েদের জিভ্ থেকে সেই ঝাল্-ঝাল্ টক্‌টক্ রসটি সরিয়ে তোমরা একটা করে চম চম বসিয়ে দিয়েছো। অত মিষ্টি আমাদের ভালো লাগেনা ভাই, গা বমি বমি করে।

-কিন্তু গালি-তত্ত্ব থাক। আসল ব্যাপার যা দাঁড়ালো, তা মর্মান্তিক দাম্পত্য-কলহ। সাজু সর্দারের মতো গোঁফ রেখে আমি তারই মতো বীররসে সজাগ হয়ে উঠেছিলুম। চটে গিয়ে হিন্দী করে বললুম, কভি নেহি। মরেঙ্গা মরেঙ্গা, তবু জরুর গোঁফ রাখেঙ্গা।

তারা আমার মুখের দিকে মিনিট কয়েক অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। বললে, বটে? আচ্ছা।

ভায়া হে, স্ত্রীলোকের প্রতিজ্ঞা যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার সে তো জানো। একা দ্রৌপদীর জন্যে দুঃশাসনের রক্তপান হল, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হল, কুরুবংশ একেবারে গোল্লায় গেল। আর আমার গোঁফের

বেলায় যে দস্তুরমতো একটা খণ্ড-প্রলয় উপস্থিত হবে তাতে আর সন্দেহ কী।

দু তিন দিন যায়, তারা আর ওর সম্বন্ধে কোনোরকম উচ্চবাচ্য করেনা। মনে মনে গর্বিত হয়ে উঠেছিলুম। বরাবরের আবদেরে মেয়েটিকে এবার একধমকেই ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। গোঁফ রাখবার ফলটা হাতে-নাতেই প্রত্যক্ষ পাওয়া গেছে। পরমোৎসাহে আমি দুবেলা গোঁফের পরিচর্যা করে নিজেকে সাজু সর্দারের পর্যায়ে কল্পনা করতে লাগলুম।

কিন্তু স্তব্ধতাই যে ঝড়ের পূর্বাভাস সেটা মনে ছিল না। তা ছাড়া দর্প সম্বন্ধেও শাস্ত্রে একটা প্রবচনের উল্লেখ আছে। হাতে হাতেই ফললাভ হল।

দুপুরবেলা এক ছিলিম তামাক নিরিবিলিতে সেবা করে চিলে-কোঠায় খানিকটা নিশ্চিন্ত নিদ্রাদানের অভ্যাস আমার ছিল। বেশ নিরাপদ জায়গা—বাবার আসবার কোনো সম্ভাবনাই ছিলনা। সেদিনও সেইরকম নির্বিবাদে তামাক টেনে একখানা মাদুরে পড়ে ঘুম দিয়েছিলুম।

* * * *

বেশ চমৎকার একটা দিবাস্বপ্ন আমাকে তখন মশগুল করে দিয়েছে। স্বপ্ন দেখছিলুম আমি স্বর্গে চলে গেছি। একেবারে নন্দন কাননে—হরিচন্দনের গন্ধে-ভরা মন্দাকিনী নদীর ধারে।

কোথা থেকে রূপের হিল্লোল ছড়িয়ে উর্বশীর আবির্ভাব। বঙ্কিমের আয়েষার ভাষায় তিনি বললেন, বীরবর, তোমার গোঁফ দেখে মোহিত হয়ে গেছি। আজ থেকে তুমিই আমার প্রাণেশ্বর। নির্গোফ দেবতাদের ওপরে আমার অরুচি ধরে গেছে। এসো, একটু সুধা খাও।

উর্বশী আমার মুখে সুধা পাত্র ধরলেন। ফোঁটায় ফোঁটায় সুধা পড়ছে, আমি পরমানন্দে চাটছি। কিন্তু কী যে হয়ে গেল—

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানিনা। হঠাৎ মুখের ওপরে খানিকটা সুড় সুড়ি—তারপরেই জ্বালাময়ী অনুভূতি। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম। বাঁ দিকের গোঁফ কোনো অদৃশ্য হাতের সুতীক্ষ্ণ কাঁচির ঘায়ে প্রায় নির্মূল আর ডানদিকের গালে গোঁফে অসংখ্য লাল পিঁপড়ে—কোনো একটা খাদ্যের প্রলোভন তাদের দলবলশুদ্ধ আমন্ত্রণ করে এনেছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে থাকব, তারও জো নেই। লাল পিঁপড়েরা গালে-মুখে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমি লাফাতে লাগলুম। তখনো বুঝতে পারছিনা পৃথিবীতে এত সুখাদ্য থাকতে আমার গোঁফের ওপরেই পিপড়েদের এত লোভ কেন! কাব্যে ইতিহাসে কখনো এমন ঘটনার কথা তো পড়েছি বলে মনে হয়না।

—দিদিমার কাণ্ড নিশ্চয়ই?

—নিশ্চয়। কোনো সন্দেহ আছে সে বিষয়ে। স্বপ্নের মধ্যে আমি যে সুধাপান করছিলুম সেটা উর্বশীর স্বর্গীয় শ্রীকরে পরিবেশিত নয়। তারা গোঁফে যখন মধু ঢালছিল তখন তারই দুএকটা ফোঁটা ঠোঁট বেয়ে মুখে পড়ছিল আর আমি তারই আনন্দে—

আমি হেসে উঠলুম।

—'যাক দাদামশাই, গোঁফ গেল তা হলে।'

'না গিয়ে আর উপায় কী। একদিকের গোঁফ তো আগেই সাফ হয়ে গেছে, ওপাশটাও বাধ্যতামূলক ভাবে নির্মূল করতে হল।

—'অতঃপর শান্তিস্থাপন নিশ্চয়?'

—ক্ষেপেছ নাকি? আমিও দিনবন্ধু সেনশর্মা। ভাঙব তবু মচকাবনা, ঠিক করলুম হয় আমি থাকব নইলে গোঁফ থাকবে। মরতে হয় সে ভি আচ্ছা—কিন্তু মরবার আগে এমন একখানা গোঁফ পৃথিবীতে রেখে

যাব যা, তাজমহলকেও লজ্জায় ম্লান করে দেবে। যুগে যুগে কবিরা তা নিয়ে অমর কাব্য রচনা করতে পারবে।

তিনদিন ধরে তারার সে কি হাসি! সারাক্ষণ সে-হাসি আমার গায়ে বিষের ছুরির মতো বিঁধতে লাগল। মনে হল এমন পরাজয় আমার কখনো হয়নি, সেবার সেই কাঁটালের ব্যাপারেও নয়। কিন্তু আর পিছোলে চলবেনা। গোঁফ রাখেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা।

বাবাকে গিয়ে বললুম,—আমি দিনকয়েক রসুলগঞ্জের কাছারীতে গিয়ে থাকতে চাই।

বাবা একজোড়া তীব্র চোখ মেলে আমার দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, হঠাৎ এমন সুবুদ্ধি যে? আড্ডাবাজী করে বেড়ানোতে অরুচি ধরে গেল?

আমি ভয়ে কাঠ। বাবা বললেন, আচ্ছা যা। কিন্তু বৌমার সঙ্গে ঝগড়া করিস্‌নি তো হতভাগা? তা হলে কিন্তু জুতিয়ে গাল ছিঁড়ে দেব।

আমি বললুম, না।—তারপর কম্পিত পদে প্রস্থান করলুম।

যাত্রার আয়োজন সুরু হল। এক ফাঁকে ছোট ছোট পায়ে তারা এসে দর্শন দিলে। বললে, আমার ওপরে রাগ করে যাচ্ছ বুঝি?

সত্যি কথা সোজা করে বলাই ভালো। আমি চুড়িদার সিল্কের পাঞ্জাবীটা পরতে পরতে জবাব দিলুম, হুঁ।

—কবে ফিরবে?

—মানুষের মতো মানুষ হয়ে।

তারা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল, যেন হাসির ধমকে সে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ভায়া, ভেবে দেখো, কি নিষ্ঠুর নির্মমতা। মনের দুঃখে আমি যখন প্রায় বিবাগী হতে চলেছি,

চোখের কোণা অভিমানে ভিজে এসেছে আর আশা করছি তারা এসে বলবে, হৃদয়েশ্বর, এবার দাসীকে মার্জনা করো—এমন সময় একি অমানুষিক নৃশংস হাসি!

তারা বললে, মানুষ হয়ে? না, একমুখ দাড়িগোঁফ নিয়ে জানুবান হয়ে?

রাগে যদি তখন ফেটে চুরমার হয়ে যাওয়া যেত তা হলে আমি তাই করতুম। কিন্তু ফাটতে পারলুম না। গোঁফ নেই বটে, তবু সাজুসর্দারের মতো গর্জন করে বললুম, দেখে নিয়ো। এবার শুধু গোঁফ নয়, দাড়ি নিয়েও ফিরব এবং তোমার হাসি বন্ধ করে ছাড়ব।

তারা বললে, আবার সন্ন্যাসী হয়ে কাঁটাল খেতে যাবে নাকি?

এরপরে আর কথা বলবার ধৈর্য থাকেনা, থাকা সম্ভবও নয়। বাবাকে আর পিসীমাকে প্রণাম করে আমি বাড়ির মাঝি মাজিরকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটে চলে এলুম। বাবা বলে দিলেন, দিনরাত বখামি করে বেড়াসনে, বিষয়-সম্পত্তি একটু দেখাশোনা করিস।

নৌকো ছেড়ে দিলে। সেন-বাড়ির দোতলাটা যতই চোখের আড়ালে সরে যেতে লাগল, মনটা ততই যেন বিশ্রী হয়ে উঠতে লাগল। এবারে মনে হতে লাগল, একেবারে অতটা না করলেও বোধ হয় চলত। গোঁফ তো আবার উঠত, তারা আর কতবার তার সঙ্গে যুদ্ধ করে পারত?

কিন্তু বেরিয়ে যখন পড়েছি আর ফিরে যাওয়া চলেনা। তা ছাড়া বাবাই বা কী বলবেন! আর বারে বারে তারার কাছে এমন করে বেকুব হওয়ারই বা কী মানে আছে! ও কি সাপের পাঁচখানা পা একসঙ্গেই দেখতে পেয়েছে যে আমাকে স্বামী বলে

তো দূরের কথা, মানুষ বলেই গণ্য করেনা! চোখের জল মনের উত্তাপে শুকিয়ে যেতে লাগল।

রসুলপুরে পৌঁছোনো গেল। সুন্দর জায়গাতে মস্ত কাছারী বাড়ী। সামনে তাকালেই নদীর স্বচ্ছন্দ বিস্তার চোখে পড়ে। প্রচুর মাছ, প্রচুর দুধ, প্রজাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, নজরাণা, এটা-ওটার ভেট। হঠাৎ যেন অনুভব করা গেল আমিও জমিদারের ছেলে, অসংখ্য লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তারার ভয়ে কেন আমি কেঁচো হয়ে থাকব?

দিন ভালোই কাটতে লাগল। সঙ্গে বন্দুক ছিল, অবসর সময়ে শিকার করে বেড়াই, কাদাখোঁচা চখাচখী, আর কিছু না পেলে বক। কাগজ-পত্র বুঝে নায়েব মশাইই দেখাশোনা করেন, ওসম্বন্ধে কোনো দায়িত্বও ছিলনা, ভাবনাও ছিলনা।

শুধু মাঝে মাঝে মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে যেত। রাত্রে শুয়ে শুয়ে বিছানাটাকে বড় বেশি চওড়া মনে হত—মনে হত বুকের ভেতরে সব যেন কেমন খালি খালি হয়ে গেছে। ভাবনা উড়ে চলে যেত সেখানকার সেই দোতলার ঘরটিতে—যেখানে পদ্মের কাজ করা মেজে, ময়ূরপঙ্খী খাট আর দুধের মতো বিছানায় নীলাম্বরী পরে একটি সোনার মতো মেয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে।

—'দাদামশাই, কাব্য সুরু করলেন যে। আপনার গল্প কতদূর?'

—'হচ্ছে, হচ্ছে ভায়া দাঁড়াও। একটু কি রসস্থ হতে দেবেনা? প্রেমের গল্প শুনতে হলে কি ঘোড়ায় জিন দিয়ে বসতে হয় নাকি?

—'আচ্ছা, বলে যান।'

দাদামশাই আধবোজা চোখ দুটো খুললেন। একবার ভালো করে তাকিয়ে নিলেন আমার মুখের নধর শুষ্ক-শ্রীর ওপরে। তারপরে সুরু করলেন:

হ্যাঁ—আসল কথাটাই বাদ পড়ে যাচ্ছে। সেই দোতলার ঘরে সোনার মতো মেয়েটির কাছে গিয়ে পৌঁছোনো এমন কোনো কঠিন কথা নয়, মাত্র এক জোয়ারের পথ। কিন্তু একজোড়া গোঁফ সব কিছুতেই বাগড়া দিয়ে বসে আছে। গোঁফে মধু মাখিয়ে পিঁপড়ে লেলিয়ে দেওয়ার কাহিনীটা যেই মনে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে পিত্তি পর্যন্ত একসঙ্গে জ্বলে ওঠে। নাঃ—অপমান আর সহ্য হয়না। আমি দাড়ি রাখব গোঁফ রাখব, যা খুশি তাই রাখব। যতদিন অনুতাপ করে তারা আমার কাছে ক্ষমা না চায়, ততদিন কিছুতেই তার কাছে ফিরে যাবনা।

সুতরাং দাড়ি বাড়তে লাগল—গোঁফ বাড়তে লাগল। যেমন করে উলুবন গজায়, তেমনি নিশ্চিন্ত স্বচ্ছন্দভাবেই গজিয়ে চলল। গোড়ার দিকে একটু একটু কুট কুট করত, তারপরে সব ঠিক হয়ে গেল। সেই রোমরাজি মণ্ডিত মুখশ্রী ক্রমশ এমন খোলতাই হয়ে উঠল যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই চমকে উঠতে লাগলাম। মনে হল এখন শুধু নিজেকে পুরুষ-সিংহ বললেই যথেষ্ট হয়, সাক্ষাৎ সিংহ-অবতার বললেই ঠিক হবে।

রসুলপুরে কতদিন কাটিয়েছিলাম ঠিক নেই,—আন্দাজ [redacted] হবে। একদিন বিকেল বেলা আয়নার কাছে বসে বেশ দরদ দিয়ে গোঁফ পাকাচ্ছি—হঠাৎ হাউ-মাউ করে কান্না শোনা গেল। বাইরে এসে দেখি আমাদের পুরাণো চাকর কৈলাস।

—'কী হয়েছে রে কৈলাস, ব্যাপার কী?'

—'শিগ্‌গির চলুন দাদাবাবু, সর্বনাশ। কাল রাত্রে বৌদিদি যেন কী দেখে ভয় পেয়েছে, সেই থেকে কেমন করছে। আপনি চলুন।'

—'অবস্থা কেমন রে?'—আমার বুকের রক্ত ততক্ষণে বরফ হয়ে গেছে।

—'কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছেনা দাদাবাবু, আপনি চলুন এখনি। কী

হবে দাদাবাবু? বৌদিদি এমন লক্ষ্মী পিতিমের মতো মেয়ে—ওহো—হো—হো—'

ডুকরে কাঁদতে পারলে তো আমিও বাঁচতুম ভাই। প্রাণের মধ্যে যে কী হচ্ছিল সে ভাষায় কী করে প্রকাশ করি। বুকের ভেতরটা যেন অনুতাপে পুড়ে যাচ্ছিল। ছিঃ ছিঃ কী করলাম! নিতান্ত একটা জেদের বসে এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসলাম! তারা যদি না বাঁচে, তারা যদি মরে যায়? ওঃ—তা হলে যে কী হবে সে আমি কল্পনাও করতে পারছিলাম না। শুধু বুঝতে পারছিলাম তা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকটা দুখানা হয়ে ভেঙে যাবে।

তারপরে কী হল ভালো মনে নেই। পাগলের মতো চলে এলাম। এসে দেখি বাড়িতে কবিরাজের ভিড় লেগে গিয়েছে। পিসীমা কাঁদতে কাঁদতে এসে বললেন, 'শিগ্‌গির যা দীনে, বারবার তোকে দেখতে চাচ্ছে।'

আমার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছিল। দোতলার সেই ঘরে —সেই খাটে শুয়ে আছে তারা। ঘোমটা নেই, মাথার চুল এলোমেলো, [illegible] ভাবে তাকাচ্ছে চারদিকে। আমি ঘরে ঢুকতেই চেঁচিয়ে উঠল: 'ওরে বাবা, দাড়ি-গোঁফ—মস্ত ভূত! ওরে বাবা রে'—আমি থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম। তারা আবার মুখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠল: ওরে বাবা ভূত রে—গেলুম—এবার বাবা সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঘাড় ধরে মস্ত একটা ঝাঁকুনি দিলেন আমায়। বললেন, 'ছাখো হতভাগার কাণ্ড—একমুখ জঙ্গল নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ও দেখলেই তো ছেলে-পুলে হার্টফেল করে। যা ওগুলো সাফ করে আয়—দেখছিস্‌না বৌমা আরো বেশি ভয় পাচ্ছে?'

নিরুত্তরে বাইরে চলে গেলুম। ক্ষুরের তিন টানে মুখ পরিষ্কার করে এলুম তারার সেবা করতে। অনুতাপে আমার তখন অন্তর

পুড়ে যাচ্ছে—যথাসর্বস্ব তারার জন্যে সমর্পণ করতে পারি—গোঁফ দাড়ি তো সামান্য কথা।

দাদু থামলেন। গড়গড়ায় আর একটা টান দিলেন ধীরে সুস্থে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'দিদিমার অসুখ সারল দাদামশাই?'

দাদামশাই হাসলেন: 'অসুখ হয়েছিল নাকি যে সারবে? সব মিথ্যে—আমাকে বোকা বানাবার ফন্দি।'

—'বোকা বানাবার ফন্দি?'—আমিও এবারে বোকা হয়ে গেলাম: তার জন্যে এত আয়োজন? অসুখ, ভূতের ভয়?'

—'নিশ্চয়। এ তো আমার তোমাদের কাল নয় ভাই। যে-যুগে নায়িকার নাম হত বজ্রতারা, সে-সময় দাড়ি-গোঁফ নিয়েও এই রকম নাটক হতে পারত। কিন্তু তারপরে সন্ধি হয়ে গেল—আর কোনো-দিন গোঁফ রেখে পৌরুষ-সাধনার চেষ্টা করিনি।'

দাদু চুপ করলেন। দেওয়ালে দিদিমার ছবিটার দিকে তাকিয়ে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিলেন। তারপর হাঁক দিয়ে বললেন, 'ওরে ভৈরব, কল্‌কেটা বদ্‌লে দে—'

দুরাশা

শ্রীঅজিতকুমার রায়চৌধুরী

আটত্রিশ নম্বরের বাড়ীটায় ভাড়াটে এসে বেশীদিন থাকতে পারেনা। ভাড়া যে বেশী তা নয়। বড় দুখানা ঘর, একটা রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর নেই বটে কিন্তু সিঁড়ির নীচে যে জায়গাটা আছে তাতে বেশ বড় একটা সংসারের ভাঁড়ার ঘর হয়। ভাড়া মোটে ছ'টাকা। অবশ্য যুদ্ধের আগেকার কথা বল্‌ছি।

কিন্তু এত সুবিধা থাকলে কি হয়, একখানা মুখের কড়া-কথাই ভাড়াটেদের দু'মাসের বেশী থাকতে দেয়না। ভাড়াটেদের দোষ দেওয়া চলেনা। তারা বারোটা কেন সারারাত লাইট জ্বালিয়ে রাখবে তাতে কার কি? আলাদা মিটার আছে, কোম্পানীর বিল তারাই দেবে। তাদের ছেলে বিষ্টিতে ভিজুক, ঘুগনী খাক্, তাতেই বা আর কার কি? কই, বাড়ীওয়ালা বিনয়বাবু ত' কিছু বলেন না, তবে তাঁর স্ত্রী শৈলজার অত কথা কেন? পাড়ার মেয়েরা আড়ালে বলত, [illegible] বোধ হয় মুখে ক্ষুর ছুঁইয়েছিল, কি মুখের ধার।

কিন্তু তারা বুঝবে কি করে, কেন শৈলজা অমন করে, কেন ভাড়াটের ছেলের দিকে তার অত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। নিজের চারটে ছেলে মেয়ে যখন তাকে অকালে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, তখন সমস্ত বিশ্ব সংসার শৈলজার কাছে শূন্য বোধ হয়েছিল। তারপর দেখল, তার সেই ছেলে-মেয়েরা ত' হারিয়ে যায়নি, তারা ছড়িয়ে আছে সমস্ত বিশ্বময় সমস্ত শিশুদের মাঝখানে। ঐ মুখুয্যেদের, পালদের, মিত্তিরদের সবার ছেলেমেয়ের মধ্যে তার ছেলেমেয়েরাও বেঁচে আছে, হাত বাড়ালেই তাদের ধরা যায় না বটে কিন্তু দূর থেকে দেখেও তৃপ্তি পাওয়া যায়। তাদের সামান্য কোন কাজে লাগতে পারলে অপরিসীম আনন্দ

পাওয়া যায়। তাই ত' সতর্ক করে দেয়, ওদের [illegible] রাখ, ওদের কষ্ট দিওনা।

পাঁচ ছ'ঘর ভাড়াটে উঠে যাবার পর আর একঘর ভাড়াটে এল। ভাড়াটেরা তিনটি প্রাণী মাত্র। অক্ষয় তার স্ত্রী মনোরমা ও তিন বছরের মেয়ে লক্ষ্মী। শৈলজা ওপর থেকে ওদের দেখতে লাগল। লক্ষ্মীকে বুকে ধরবার অদম্য ইচ্ছাটাও কোনরকমে চেপে রাখল। মনোরমা দু'একবার কথা বলবার চেষ্টা করেছে কিন্তু শৈলজা আমল দেয়নি। বোধহয় বিনয়বাবুর কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তা তখনও পুরোপ হয়ে যায়নি। কিন্তু কতদিন আর এভাবে চলে, মানুষ কি এভাবে থাকতে পারে।

লক্ষ্মী তিন বছরের হলে কি হয় তাকে সামলানো মনোরমার পক্ষে অসম্ভব। সেদিন লক্ষ্মী ওপরে উঠে পিঁগয়ে কাকাতুয়ার সামনে দাঁড়াল। শৈলজার কাকাতুয়াটা লক্ষ্মীর কাছে এক আশ্চর্য্য জিনিষ। কাকাতুয়ার মাথার ঝুঁটি ঝেঁকে ডাকার মত বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষ্মীর পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। লক্ষ্মী একটা কাঠি দিয়ে কাকাতুয়াকে খোঁচা মারে। খোঁচা খেয়ে কাকাতুয়াটা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। মনোরমা লক্ষ্মীকে দেখ্‌তে পেয়ে উঠে এসে কাণে ধরে দুই চড় কষিয়ে দিল। শৈলজাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—ছিঃ ভাই, কচি মেয়েকে এমন ভাবে মারে। দেখি, গালটা একেবারে ফুলে জয়ঢাক হয়েছে।

—নামিয়ে দিন দিদি। ও মেয়েকে সামলান যার তার কম্ম নয়। হতভাগা মেয়েকে হাজার বার যা নিষেধ করব তাই করবে।

—ও কি আর বুঝ্‌তে পারে, লক্ষ্মী আমার সোনামেয়ে।

প্রথম আলাপটা লক্ষ্মীকে কেন্দ্র করেই সুরু হল।

সেই দিনই দুপুরে শৈলজা খাওয়া-দাওয়ার পর নীচে এল। মনোরমার ঘরে গিয়ে দেখে যে মনোরমা শুয়ে শুয়ে বই পড়্‌চে

আর কাঁদতে। শৈলজাকে দেখে চোখের জল মুছে বলল—আসুন দিদি, বসুন।—বলে উঠে আসন পেতে দিল।

—থাক্ থাক্, আমি কি কুটুম নাকি। তা' অত কাঁদছিলে কেন? হাতে ওটা কি?

—একটা গল্পের বই। জয়াবতীর দুঃখ দেখে চোখের জল আট্‌কান যায় না, দিদি।—বলে এক নিশ্বাসে জয়াবতীর কাহিনী যতটা জানা ছিল শেষ করে বলল—আপনাকে পড়া শেষ হলেই দোব 'খন। পড়ে দেখবেন, এমন বই আর ভূ-ভারতে নেই।

অল্প হেসে শৈলজা বলল—ঐটে হবেনা বোন, পেটে ডুবুরী নামালেও ক'অক্ষর উঠবে না।

দুই কর্ত্তা বেরিয়ে যাবার পর দুই গিন্নীর হাতে প্রচুর সময় থাকে। শৈলজা অন্যান্য কাজ-কর্ম্ম সেরে ভাতের থালা তরকারী প্রভৃতি নিয়ে মনোরমার রান্নাঘরে হাজির হয়, ঘণ্টা দুই ধরে ভোজন পর্ব্ব চলে।

সেদিন মনোরমা বলল—এটা আপনার অন্যায় দিদি। বিনয়বাবু আপনার জন্যেই এনেছিলেন।

—এনেছিলেন তা' হবে কি। আমি ধুম্‌সো মাগী তোর সামনে মাছের মাথা খাব, বলি আমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই।

—বিনয়বাবু জান্‌তে পারলে কি ভাব্‌বেন।

—তার আবার ভাবাভাবি কি?

কিছুক্ষণ পরে মনোরমা বলল—বললে বিশ্বাস করবেন না দিদি, আমাদের গাঁয়ের খোঁড়া মোক্তারের পরিবারের বছর বছর মেয়ে হয় আর মরে, হয় আর মরে কিন্তু যেই মাদুলী ধারণ করলে সেই বছরই সোনার চাঁদ ছেলে হ'ল। শত্রুরের মুখে ছাই দিয়ে ছেলে এখন দিব্যি আছে। আমার এ কথাটা রাখ্‌তেই হবে। আপনিও একটা নিন।

—বুড়ো বয়সে আবার ওসব কেন? যেগুলো [illegible] তারা যদি থাকবার হ'ত তা'হলে থাকত, ভগবান সব সুখ সবার কপালে লেখেনা রে। তা'ছাড়া আমার লক্ষ্মী বেঁচে থাক, আর একটাও ত আবার আস্‌ছে। দেখি, আমার দিকে তাকা দেখি, হুঁ, এবার তোর ছেলেই হবে, দেখে নিস্।

পরদিন সকালে বাজার করে এনে তেল মাখ্‌তে মাখ্‌তে বিনয়বাবু বললেন—নয়ন বলছিল, বাসুদা আপনার দোতলার ঘর খানা ত' পড়েই থাকে, আমায় যদি দেন তা হ'লে ভাল হয়।

—অত আদিখ্যেতায় কাজ নেই। নয়নু ঠাকুরপো'কে বলে দিও, বাকী টাকাগুলো যেন সুদ সমেত দিয়ে যায়।

—'টাকা মেরে দেবেনা, সে ভয় নেই।'

—তুমি জান্‌লে কি করে? এখানে আস্‌তে চাইছে নিশ্চয়ই কোন কু-মতলব নিয়ে।

রসিকতা করে বিনয়বাবু বল্‌লেন—কি কু-মতলব বল দিকি, তোমায় নিয়ে পালাবে?

—মরণ আর কি! দিন দিন যেন খোকা হচ্ছেন।

—দেখ, দো'তলার ঘর ত' এমনই পড়ে থাকে, কাউকে ভাড়া দিলে বাজার খরচটা উঠে আসে।

—ভাড়া দিতে হয় মাস দুই বাদে মোনোর আঁতুড় উঠে গেলে দিও।

—ওরা বুঝি দু'মাসের ভাড়া নিলে।

—তোমার চোখে কি চামড়া নেই? এমন কসাই-এর হাতে পড়ে ছিলুম গা। দেখছ, দু'বেলা ভাল করে খায় না কিছুনা, ঘর ভাড়া দেবে কোত্থেকে? একটা মানুষের যদি উপ্‌গারে আসে ঘর-গুলো তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না;—যাও, চান করে নাও। কথা শুন্‌লে পিত্তি অবধি জ্বলে যায়।

[redacted] থেকে তরকারী ঢেলে ঝাঁকায় তোলবার সময় শৈলজা বলল—বাঃ বেশ পটল ত', কত করে সের যাচ্ছে গা ?

—চার আনা।

—চার আনা ! চার আনা সের পটল খাবার সামর্থ তোমার ? বলি হ্যাঁ গা, তুমি কি ভেবেছ বল দিকি। এই ভাবে খেলে যে সসাগরা পৃথিবী খেয়ে মুখপোড়া ভগবানকে অবধি টলিয়ে দেবে। বলি শেষ বয়সে হরেকেষ্ট বলে দোর দোর খ্যাংড়া খাবার ইচ্ছে আছে ?

শৈলজার কথাই সত্যি, মনোরমার ছেলেই হল। ছেলেটা ভূমিষ্ঠ হ'ল শৈলজারই হাতের উপর। সদ্যজাত শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে শৈলজা চমকে উঠল। ঠিক তার সেই চার মাসের ছেলেটার মত। কে বলবে যে এ শৈলজার সেই ছেলেটা নয়। ছেলেটা বোধ হয় তার আগের জন্মের কথা ভুলতে পারেনি।

ন্যাকড়ায় জড়িয়ে ছেলেটাকে শৈলজা চোখের সামনে ধরল। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে, ভাল করে মুখ দেখা গেল না। ছেলেটা কেঁদে উঠল, বোধ হয় তার আগের মা-কে চিনতে পেরে তুলসী মা-এর আহ্বানে সাড়া দিল।

কিন্তু কি যে হ'ল, দশদিন বাদে ছেলেটার পেট অসম্ভব রকম ফুলে উঠল। ঐ এক কোঁটা ছেলে, হাঁ করে ঠিক বুড়ো মানুষের মতই বাঁচবার জন্যে বাতাস গিলবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই হ'লনা। তের দিনের দিন শৈলজার হাতের ওপরেই মরে গেল। শৈলজা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল কাঁদতে পারলনা। কিন্তু যখন কষ বেয়ে রক্তের সরু একটা রেখা শৈলজার হাত রাঙিয়ে দিল, তখন আর সে থাকতে পারলনা। ছেলেটা চোখের জল ফেলতে পারেনি তাই যাবার আগে রক্ত-রেখা দিয়ে নিজের অসহ্য যন্ত্রণার পরিচয় তার আগের

জন্মের মা-এর কাছে রেখে গেল। রুদ্ধকণ্ঠে অচেতন [illegible]কে বলল—তোরা এবাড়ী ছেড়ে চলে যাস। আমি সত্যিই ডাইনি, নিজের চারটেকে খেয়েছি, তোরটাকেও খেলুম।—বলে সেই যে চলে গেল, তারপর এক মাসের মধ্যে মনোরমার সঙ্গে দেখাও করলনা।)

মনোরমা শুয়ে আছে। সকালে ওর সঙ্গে রাগারাগি করে অক্ষয় না খেয়েই চলে গেছে। মনোরমারও মেজাজটা ভাল নেই। হঠাৎ দুম' দুম' করে পা' ফেলে লক্ষ্মীকে নিয়ে ঘরে ঢুকে মনোরমার পাশে বসিয়ে দিয়ে শৈলজা বলল—কি বিষ-পাহাড়ী মেয়ে বাছা। এত আদর যত্ন, তা' মুখে এক কথা খালি, মা-র কাছে যাব। মা যেন ওকে একেবারে সগ্‌গে তুলবে। দুপুরের ঘুমটা মাটি করে দিলে।

মনোরমাও তীক্ষ্ণস্বরে বলল—নিয়ে যান কেন রোজ রোজ?

—শোন একবার কথা! বলি তোর যে [illegible] হয়েছে রে!

—মুখ আবার কি? মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্যে কি আমি কোন দিন কারুর পায়ে ধরে সেধেছি যে খোঁটা দিতে এসেছেন।

—এতেই রাজকন্নের গায়ে ফোস্কা পড়ল! অত দেমাক ভাল নয়, ওপরে দম্ভহারি মধুসূদন আছেন। তোরই মেয়ে দিনরাত মাসী-মাসী করে ওপরে যায় কেন? এবার যদি যায় তা'হলে ঠ্যাং ভেঙে দেব।

—মেয়ে আমার অমনি যায় না, ডেকে নিয়ে যাও বলেই ত যায়।

—মেয়ে ওর ভাজা মাছ উল্‌টে খেতে জানেনা, বদমাইসের ধাড়ী।

—খবরদার, গালাগাল দিওনা বলছি।

—একশ বার দেব। আজই আমার তিনমাসের ভাড়া চুকিয়ে চলে যাবি, নইলে আমি অনথ করব। বলে, 'যতই নীচু করবে মাথা ততই দেবে কুশের কাঁটা।'

'অনথ' কিছুই হয়নি, মনোরমারাও বাড়ী ছেড়ে যায় নি। কিন্তু

এক [illegible] বাক্যালাপ বন্ধ। শৈলজা মেঝেতে কান পেতে রোজ শোনে লক্ষ্মী মাসীর কাছে যাব বলে বায়না করে আর বেদম প্রহার খায়। মনোরমা মাসীর আদ্যশ্রাদ্ধ করে আর শৈলজাও মনোরমার সপিণ্ডকরণের ব্যবস্থা দেয় কিন্তু কেউই সাম্‌না-সাম্‌নি কথা বলেনা।

সেদিন দুপুরে লক্ষ্মীকে প্রহারের মাত্রাটা এতটা বেড়েছিল যে শৈলজার বুক টিপ্ টিপ্ করছিল, এই বুঝি মেয়েটা মরে গেল। কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্মী কেঁদে আর না হতেই চুপ করল। শৈলজারও তন্দ্রার মত এসেছিল এমন সময় শুনতে পেল লক্ষ্মী ডাকছে, মাছিমা, মাছিমা। শৈলজা চোখ খুলে দেখে লক্ষ্মী দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাক্‌ছে। উঠে লক্ষ্মীকে কোলে তুলে গায়ে হাত বুলোতেই লক্ষ্মী কেঁদে উঠ্‌ল। শৈলজা মুখ চেপে ধরে বলল—কাঁদিস্ না, মা রাক্ষুসী আবার শুন্‌তে পেলে উঠে আস্‌বে। হ্যারে হতভাগী, কেন মার খাস্, পালিয়ে আসতে পারিস্ না। ইস্, চোরের মার মেরেছে গা, সৎমাতেও এমন [illegible] ভাঙায় না।

খাটের নীচে বিনয়বাবুর জলখাবারের সন্দেশ ছিল। শৈলজা লক্ষ্মীকে সন্দেশ খাওয়াতে লাগল। সবেমাত্র একটা খাওয়া হয়েছে এমন সময় নীচে থেকে মনোরমা ডাক্‌তে ডাক্‌তে ওপরে উঠে এল। শৈলজা তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীকে মাটিতে বসিয়ে খাটের উপর ঘুমুবার ভাণ করে শুয়ে পড়ল। লক্ষ্মী মার গলার আওয়াজে ভয় পেয়েছিল বটে, কিন্তু মাসীর ব্যবহারে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। একটা সন্দেশ হাতে নিয়ে এই দ্বিবিধ অনুভূতির মাঝখানে পড়ে সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল।

মনোরমা লক্ষ্মীকে দেখে জ্বলে উঠ্‌ল, বলল,—উঠে আয় শিগগির। এলি উঠে? মনোরমার কণ্ঠস্বরে শৈলজারও যেন ঘুমটা ভেঙে গেল। উঠে লক্ষ্মীকে ঐ অবস্থায় দেখে বলল—ওমা আমার কি হবে গো!

একি মেয়ে বাবা, এযে দিনে দুপুরে ডাকাতি। [illegible] ভাঁড়ের তলা থেকে সন্দেশ চুরি করে, এমন মেয়ে ত বাপের জন্মে দেখিনি। এমন মেয়ে আঁতুড়ে নুন খাইয়ে শেষ করে দিতে পারেন নি।...আর বাপ মা-র শেখান না থাকলে ঐ কচি মেয়ে কি চুরি করতে পারে?

মনোরমা কোন কথা বলল না। ঘরে ঢুকে নয়নের হাত থেকে সন্দেশটা ছুঁড়ে ফেলে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিচে গিয়ে মারতে আরম্ভ করল, চোখা চোখা বাণও ছুঁড়তে লাগল ওপর দিকে লক্ষ্য করে। শৈলজা বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল, মনোরমার কথার জবাব দিল না।

রাত্রে বিনয়বাবু বুঝলেন একটা কিছু হয়েছে। তিনি বললেন, শৈ, আজকে আবার কি হল? সম্বোধনটা বহু পুরোন এক গেল। শৈলজার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। বিনয়বাবু বলে শৈলজা আর পরের মেয়ের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। ওরা [illegible] ধরা দেয়না। অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে শৈলজা বলল, দিদি তুমি আপনার চলে যেতে বল, আমার আর সহ্য হয় না।

দিনকয়েক বাদে আবার বাক্যালাপ সুরু হয়। দুজনের পায়না সপ্তাহকালব্যাপী মৌনতার পর কে যে প্রথম কথা দিয়েছে আর অপর পক্ষ কখন হঠাৎ তার উত্তর দিয়ে ফেলেছে।

নয়ন দোতলার ঘর ভাড়া নিল। নয়ন-বৌ যে বিশেষ সুবিধের নয় তা শৈলজা প্রথমেই টের পেয়েছিল। কিন্তু টের পেলেই বা কি হবে, নয়ন-বৌকে তাড়ালেও নড়বে না, গাল দিলেও গায়ে মাখবেনা। তার ওপর শৈলজার সেবা-যত্ন যা সুরু করল তাতে মুখ ফুটে শৈলজা আর কিছু বলতেও পারেনা। এখন মনোরমার সঙ্গে বিবাদে নয়ন-বৌকে সাক্ষী রেখে শৈলজা বলে—তুমিই বল ত বৌ, কি অন্যায় কথাটা বলেছি। আমার চোখের সামনে মেয়েটাকে ধরে অমনি ঠ্যাঙাবি

ভূই—আমি দিনরাত ভয়ে ভয়ে থাকি কখন কি হয়। রাত্তিরে তিন চারবার পিদীম জ্বালিয়ে দেখি আছে না গেছে, কথায় বলে ঘুম না মরণ। তা আমায় সাত ঘাটের জল খাইয়ে দিলে গা। মুখুজ্যে-গিন্নী শুনে গেল, সে মাগী কি আর সাতবাড়ী না বলে ছাড়বে।

—কি করব দিদি, আমি ত ভাবতেও পারিনা। বলি, পরের জন্যে কে এত করে? মা-ও মেয়ের জন্যে করেনা। এই যে এক বছরের বাড়ীভাড়া বাকী, অন্য জায়গায় হলে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিত।—তারপর গলা খাটো করে বলে—আমার মনে হয় দিদি, স্বভাব চরিত্তিরও ভাল নয়, দেখলেন না কোথাকার কে এক ছোকরা দেওরের সঙ্গে কি ঢলাঢলি!

—কোথাকার কে এক? তুমি ত আচ্ছা মানুষ, বাছা, অক্ষয়ের লক্ষ্মীর ই-এর মিনো দু'টো হেসে কথা করেচে অমনি তার দুরাশা। গেল!

শৈলজা ঘরের যে কৌশলটা ছিল সেই কৌশলটা জেনে নেওয়া যে কি বাড়ীউলীর কাছে একবছরের ভাড়া বাকী ফেলে মনোরমা নিশ্চিন্তে বাড়ীতে আছে। কিন্তু কিছুতেই সে নয়নকে মনের মধ্যে ঢুকতে পারলনা—মনোরমার কৌশলও জানতে পারলনা।

—মনোরমার ঘরে পনের-ষোলজন আত্মীয় এসে হাজির। একে দানাটানির সংসার তার ওপর এই একগাদা লোক, কি দিয়ে যে কি হবে, তাই ভেবে মনোরমার মেজাজটা বিগড়ে ছিল। ওপর থেকে শৈলজা ডেকে বলল—ওপরে একবার চট করে আয়।

মনোরমা কথাটা শুনেও শুনলে না। শৈলজা আরও কয়েকবার ডাকল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেও মনোরমা এলো না দেখে শৈলজা নয়ন-বৌকে বলল—দেখলে ত' চরিত্তির। এত ডাকলুম্ তা' নবাবনন্দিনীর

সাড়াই মিললনা। বলি তোরই ভালর জন্তে ডাকা। [illegible] হারটা দিয়ে গেল তা একবার দেখ্‌সে, কেমন হয়েছে জিনিষটা।

নয়ন-বৌ নীচে এসে মনোরমাকে বলল—মোনোদি' বাড়ীউলী গিন্নী কিন্তু রেগে আগুন।

—উনি ত' রেগেই আছেন। এক মনসা তায় ধুনোর গন্ধ।

—যা বলেছেন।

নয়ন-বৌ ওপরে গিয়ে পল্লবিত করে শৈলজাকে বলল—শৈলজা ওপর থেকে গলা ছেড়ে দিল, মনোরমাও আসরে নামল। মনোরমার আত্মীয়রাও মাঝে মাঝে যোগ দিয়ে ঝগড়াটা বেশ জমাট করে তুলল। মনোরমা কিছুক্ষণ বাদে চুপ করল। শৈলজা একাই বকে যখন দেখল যে মনোরমা চুপ করেছে, তখন নিজের ঘরে গেল। ঘরে ঢুকবার মুখে দেখে নয়ন-বৌ মুচ্‌কি [illegible] শৈলজা বলল—দাঁত বার করে আর হাস্‌তে হবে না, [illegible] হাস্‌তে জবাব দিল—দাঁত-ত' আর ভাড়াটে [illegible] আপনার কথা শুনবে।

মনোরমা নীচে থেকে নয়ন-বৌর গলা শুনে আবার [illegible] এসে দাঁড়াল। শৈলজা যখন দেখ্‌ল যে মনোরমা নয়ন-বৌর দিকে, তখন অমনি নয়ন-বৌকে ছেড়ে মনোরমাকে আক্রমণ করল। শৈলজা বলল—মেয়েকে যদি ওপরে পাঠাস্ তবে ঠ্যাং ভেঙে দেব।

—মেয়েকে যদি আর কোনদিন তোর কাছে দি' তবে যেন মেয়ের মরা মুখ দেখি।

—কি বল্‌লি মুখপুড়ী।—শৈলজা চীৎকার করে উঠল।

—ফের গালাগাল দিলে মুখ পুড়ো জ্বেলে দেব।

—মোনো, দিব্বি' ফিরিয়ে নে, মেয়ের নাম নিয়ে ঐ দিব্বি দিতে নেই।

—তোমার মেয়ের নাম নিয়ে আমি যা ইচ্ছে তাই দিব্বি দেব, তোর কি তাতে।

সেইদিন বিকেলে লক্ষ্মীর জ্বর হল এবং খবরটা নয়ন-বৌ শৈলজাকে জানিয়ে বলল—কি বলব দিদি, মেয়ে যতই মাসীমা বলে কাঁদে মা ততই ধমক দেয়। সে দাঁত কড়মড়ানি যদি দেখতেন! হাসতে হাসতে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যায়। আমি ত' মুখে কাপড় গুঁজে হাসি চেপেছি, মাগী শুনতে পেল আবার কি বলে বসবে। বাপের জন্মে এমন হাসি হাসি নি।—নয়ন-বৌ হেসে গড়িয়ে পড়ল।

শৈলজা মুখ ফিরিয়ে বলল—কে তোমাকে মাথার দিব্বি দিয়ে হাসতে বলেছে?

লক্ষ্মীর জ্বর বেড়ে চলল, সেই সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা।

শৈলজা ঘরের মেঝেয় কাণ পেতে শুয়ে থাকে। বিনয়বাবু দেখেও কিছু বলেন না। শৈলজা মাঝে মাঝে বলে—কালকেই নয়নকে চলে যেতে বলবে।

নয়নকে শেষ অবধি বাড়ী ছেড়ে যেতেই হল। যাবার মুখে নয়ন-বৌ মুখ ফিরিয়ে মুচকি হেসে বলে গেল—মরণ আর কি!

সেদিন শৈলজা থাকতে না পেরে মনোরমার ঘরের সামনে গিয়ে বলল—মোনো, আমার ওপর রাগ করে মেয়েটাকে কষ্ট দিস্ নি, তোর পায়ে ধরছি।

—লজ্জা করে না কথা বলতে?

—মোনো, নয়ন-বৌকে তাড়িয়ে দিয়েছি আমায় দেখতে দে লক্ষ্মীকে।

—না না না, লজ্জা করে না বলতে?

—দিবি না দেখ্‌তে?

—না না না, কতবার বলব।—বলে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

—বটে, এত তেজ! কালকেই আমার বাড়ী ছেড়ে চলে না গেলে আমি পাহারওয়ালা ডাক্‌ব।

বিকেলে ডাক্তার এসে বলে গেলেন, বসন্ত হয়েছে।

বিনয়বাবু শৈলজাকে বল্‌লেন—ডাক্তার ত' বলে গেল মায়ের দয়া হয়েছে। কি যে করি।

—করবে আবার কি? কাটাই তুলে দাও, ঐ সব রুগী পুষে কি যমকে টেনে আন্‌বে?

—তুমি কি বল্‌ছ?

—ঠিকই বলছি।

লক্ষ্মীকে দেখলে চেনা যায় না। শ্রীটুকু ফুলে গেছে, চোখ চাইতে পারে না। যখন জ্ঞান থাকে, ক্ষীণ স্বরে মাসীমা-কে ডাকে তারপর ক্লান্ত হয়ে কাৎরায়। ওকে একবার দেখতে যায় না, উপরন্তু ওদের তুলে দেবার জন্যে বিনয়বাবুকে পীড়াপীড়ি করে।

'ঝনাৎ'করে দরজার গোড়ায় চাবির আওয়াজ হতেই অজয়রা আর অক্ষয় দু'জনেই চেঁচিয়ে উঠল—কে? কে ওখানে?

অক্ষয় এসে লাইট জ্বালিয়ে দেখল, শৈলজা দাঁড়িয়ে। অক্ষয় বললে—কি চান?

—কি আবার চাইব? বাড়ীতে যেন কাবলীয়ালা পুষেছি, রাত্তিরে বাইরে যাবারও ক্ষমতা নেই। পারব না বাপু নিজের বাড়ীতে চোরের মত থাকতে। এতই যাদের প্রাণের ভয় তারা অন্য জায়গায় চলে গেলেই পারে।

পরদিন সকাল থেকে লক্ষ্মীর অবস্থা খুবই খারাপ। বিনয়বাবু বিমর্ষমুখে অনাহারেই বেরিয়ে গেলেন। শৈলজা মেঝেতে শুয়ে রইল। রাত্রে শৈলজা আর থাকতে পারল না। নীচে নেমে গেল।

অক্ষয় আর মনোরমার মনে হল কে যেন পড়ে গেছে। বাইরে এসে আলো জ্বালাতেই দেখা গেল শৈলজা পড়ে আছে।

অন্ধকারে নামবার সময় কি ভাবে যেন শৈলজা পা পিছলে গড়িয়ে পড়ে যায়। সিঁড়ির শেষে একটা ঝাঁটা ছিল তারই ওপর গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়ে। ঝাঁটার একটা কাঠি চোখের ভেতরে ঢুকে যায়, মাথাটাও কেটে যায় অনেকটা।

রোজ বিনয়বাবু হাসপাতালে দেখতে যান। শৈলজা বিনয়বাবুর জ্বাসবার সময়টুকুর জন্যে উৎসুক হয়ে থাকে, রোজই বলে—লক্ষ্মী কেমন আছে?

—ভাল আছে, তবে এখনও ঘা শুকোয়নি।

—খুকী আমায় দেখতে আসে না কেন?

—লক্ষ্মীকে একলা ফেলে কি করে আসে, বল?

—আমার জন্যে মোনো, লক্ষ্মী ওরা খুব কাঁদে, না? বেশ হয়েছে, আর লাগবি আমার সঙ্গে? এখন কেঁদে মর। আচ্ছা, আমার চোখের এইগুলো কবে খুলে দেবে বলত? কালকের দিনটা দেখে পরশুদিন আমি নিজেই সব খুলে ফেলব তা ব'লে রাখছি।

—না না, অমন কাজও করতে যেওনা। সেদিন ডাক্তাররা বুঝবেন নিশ্চয়ই খুলে দেবেন।

—ডাক্তার-মড়ারা আবার কি জানে।.....আচ্ছা, আমি নাকি একটা চোখে একদম দেখতে পাব না? তুমি কাণা-বৌকে নিয়ে কি

করে ঘর করবে গো? তুমি বরং কচি দেখে আর একটা বিয়ে করবে। আমরা দুই সতীনে তোমার পাকা চুল বেছে দেব।—বলে শৈলজা হেসে উঠ্‌ল।

সপ্তাহ তিনেক বাদে শৈলজা হাঁসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। একটা চোখ তার সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে, আর একটার শক্তিও অত্যন্ত ক্ষীণ।

রিক্‌শা থেকে নেমে শৈলজার হাত ধরে দরজার গোঁড়ায় তাকে দাঁড় করিয়ে বিনয়বাবু ভাড়া দিচ্ছেন এমন সময় শৈলজা বলে উঠল—দরজায় তালা দেওয়া কেন?

তোমার বোন একলা আছে কি না তাই। সর, তালাটা খুলে দি।

শৈলজা নিজেই বাড়ীর ভেতর ঢুকে মনোরমার ঘরের সামনে গিয়ে ডাকল—মোনো, মোনো! লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, মাসীমা আমার!

কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিলনা। তেমনি ঘরের ভেতর থেকে একটা পায়রা উড়ে বেরিয়ে এসে দোতলার কার্নিশে বসল। সিঁড়ির কোণ থেকে মনে হল কে যেন অতি ক্ষীণস্বরে বলল—মাছীমা, এই যে আমি। কিন্তু সে স্বর শৈলজার কাণে গিয়ে পৌঁছলনা। আস্তে আস্তে দেওয়াল ধরে কোনরকমে মনোরমার ঘরের সামনের সিঁড়িতে বসে শৈলজা আবার ডাকল—লক্ষ্মী, মাসীমা আমার, আমি ফিরে এয়েচি।

সমস্ত বাড়ীটায় তার সেই কাতর কণ্ঠস্বর একটি শিশু-কণ্ঠের উত্তরের ব্যাকুল-আকাঙ্ক্ষায় গুমরে গুমরে কেঁদে ফিরল। দোতলা থেকে কাকাতুয়াটা ঝুঁটি ঝেঁকে ডেকে উঠল।

পঞ্চু ও মুংলী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

স্ত্রী মোক্ষদা, পুত্র পঞ্চু এবং গাভী মুংলী এই নিয়ে বংশীলালের সংসার।

মুংলী বন্ধ্যা, পঞ্চু হাবা এবং মোক্ষদা পাগল।

মোক্ষদা যে সব সময়ই পাগল তা নয়। মাঝে-মাঝে বেশ ভালো থাকে। তখন রাঁধে-বাড়ে, স্বামী-পুত্রকে খাওয়ায়, মুংলীকে জাবনা দেয়, মুড়ি ভাজে, মুড়ি বিক্রি করে,—সবই করে। তারপর হঠাৎ এক সময় পাগল হয়ে যায়। একেবারে উন্মাদ পাগল। লোক জনকে মেরে-ধরে, জিনিসপত্র ভেঙে, চেঁচিয়ে, লোক কেলেঙ্কারী কাণ্ড বাধায়। তখন তাকে তালাবন্ধ ক'রে রাখা ছাড়া উপায় থাকেনা। তারপরে কিছুদিন বাদে আবার ভালো হয়ে যায়। পাগলামির কথা কিছুই মনে থাকে না। কেউ তার উল্লেখ করলে লজ্জা পায়।

পঞ্চুর কিন্তু জোয়ার-ভাটা নেই। ষোলো বছর বয়স হ'ল, কিন্তু বুদ্ধি সেই দু'বছরের শিশুর মতো। কি করে আর কি বলে তার কিছুই ঠিক নেই। দিলে খায়, না দিলে চায়ও না, খায়ও না।

এসংসারে তার বন্ধু কেউ নেই।

তার সঙ্গে যারা এসেছিল, আজ তাদের কে কোথায় পেটের ধান্ধায় ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ বা ফেরীওলা, কেউ বা রেলের খালাসী, কেউ বা খাটছে চটকলে। কিন্তু সে তার এগুলো না। তার

বয়স বাড়ছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়ছে না। দেহের বৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু মন স্থাণুর মতো একই জায়গায় ব'সে রয়েছে।

তার সঙ্গী মুংলী। নির্বুদ্ধিতার ক্ষেত্রে ওদের দুজনের একটা মিল হয়ে গেছে। সেই মিলের টানে ওরা দুজনে এক জায়গাতেই থাকে বেশি।

সকালে উঠে আঁচলে মুড়ি নিয়ে পঙ্কু মুংলীকে নিয়ে চরাতে বেরোয়। মাঠে মুংলী ঘাস খায়, আর তার পিঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পঙ্কু খায় মুড়ি। পেট ভরে যায় যখন দুজনের, তখন মুংলী এসে গাছের ছায়ায় ব'সে ব'সে রোমন্থন করে। পঙ্কু তার পিঠে ঠেস দিয়ে শুয়ে থাকে।

থেকে থেকে মুংলীকে জড়িতকণ্ঠে কত কি যে বলে সাধারণ মানুষে তার অর্থ বুঝবে না। কিন্তু মুংলী হয়তো বোঝে। নিঃশব্দে সে শোনে। কান নেড়ে, লেজ নেড়ে, শিঙের আগা দিয়ে ওর পিঠ চুলকে বুঝি তার উত্তর দেয়।

সামনের রেললাইন দিয়ে দুটোর ডাউন পাসেঞ্জার চলে যায়।

ওরা দুজনে ধীরে ধীরে বাড়ী ফেরে।

বংশীলাল তাঁতি।

নিজের বিঘে কয়েক জমি আছে। পাড়ার পাঁচজনের কিছু জমি পাঁচুনে ভাগেও নেয়। ফলে তাকে আর হালের বলদ রাখতে হয় না।

চাষের সময় ক্ষেতে খাটে। অবসর সময়ে তাঁত বোনে।

যখন সুস্থ থাকে তখন যথেষ্ট খাটে। পাড়ার ভদ্রলোকদের ধান 'বাইচে' নেয়, চাল ক'রে। তাতে করে নিতান্ত মন্দ আয় হয় না।

এমনি ক'রে ওদের দিন মন্দ চলছিলো না।

এমন সময় এলো দুর্ভিক্ষ।

হিসেবী লোক বংশীলাল। দুর্ভিক্ষের প্রথম দিকটা ততটা কাবু হ'ল না। কিন্তু গোটা বর্ষায় একটি ফোঁটাও বৃষ্টি পড়লো না, জিনিসপত্রের দাম গেল অসম্ভব রকম বেড়ে, তখন রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লো।

কিন্তু তাতেও সে দমতো না। ঘরে তার দুটি ধান তখনও ছিল। বৃষ্টির অভাবে চাষ বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁত আছে। চাষই তার একমাত্র উপজীবিকা নয়।

এই সময়ে তাঁতখানা চালাবার মতো সুতোও যদি সে পেত! কাপড়ের দাম যেরকম বেড়েছে, তাঁতখানা যদি সে চালাতে পারতো তাহ'লে ভাবনার কারণ ছিল না।

কিছু সুতোর জন্যে গত একমাস ধ'রে সে নীলগঞ্জের হাটে যাওয়া-আসা করছে, কিন্তু এক নাচি সুতোও সে সংগ্রহ করতে পারলে না। হাটে কারও দোকানে সুতো নেই।

সমস্তদিন নীলগঞ্জের হাটের ধুলো খেয়ে সন্ধ্যার সময় বংশীলাল ফিরে এসে বিষণ্ণমুখে তাঁতঘরের দাওয়ায় বসলো।

কী ক'রে কি করবে?

গোলার ধান ফুইতে ফুইতে একেবারে গোলার নিচে এসে পৌঁছেচে। একটা মাসও আর চলবে কিনা সন্দেহ। তারপরে কি ক'রে আর দিন যাবে?

পরামর্শ করে এমন একটি লোক বংশীলালের সংসারে নেই। ছেলেটি হাবা, গৃহিণী পাগল। সুস্থ অবস্থাতেও বেশি কথা সে বলে না। নিজের মনে সংসারের কাজ ক'রে যায়। বংশীলালও গোলমেলে বিষয় নিয়ে তাকে ঘাঁটাতে চায় না।

একা-একাই বংশীলাল ভাবে। যত ভাবে ততই তার মাথা গরম হয়ে ওঠে। সে কি নিজেই শেষে পাগল হয়ে যাবে!

এরই সপ্তাহখানেক পরে।

পঞ্চু সকালে উঠে আঁচলে মুড়ি নিয়ে প্রতিদিনকার মতো গোয়াল ঘরে গিয়ে দেখে, গোয়ালে মুংলী নেই।

গোঁজে তার গলার দড়ি বাঁধাই আছে। পাৎনায় তখনও কিছু খড়-বিচালী রয়েছে। সারারাত্রি জলে ভিজে সেগুলি হলদে হয়ে গিয়েছে। চালের বাতায় পাঁচনখানি গোঁজা। এই দুর্দিনেও মুংলীর শিঙে মাখাবার জন্যে পঞ্চু একটা বাঁশের চোঙায় কিছু সর্ষের তেল সংগ্রহ ক'রে এক কোণে লুকিয়ে রেখেছিল, সেও ঠিক তেমনি আছে।

শুধু মুংলী নেই!

কোথায় গেল মুংলী! সাধারণতঃ সেই তো উঠে মুংলীকে গোয়াল থেকে বাইরে বার করে। ক্বচিৎ কোনোদিন তার উঠতে দেরী হলে তার বাবা কিংবা মা সে-কাজ করে। আজকে কি তার উঠতে দেরী হয়েছে?

সময়ের বোধ পঞ্চুর নেই।

চরাতে নিয়ে যাবার আগে পুকুর-পাড়ে যেখানটায় মুংলীকে বাঁধা হয় সেই দিকে সে ছুটলো। গিয়ে দেখলে সেখানেও সে নেই।

কোথায় গেল তবে? পঞ্চুর অপরিস্ফুট মনের ভিতরটা হঠাৎ যেন হাঁপিয়ে উঠলো। ছুটে গেল সে তার বাপের কাছে। কিন্তু কোথাও পেলে না বংশীলালকে। সে কোথায় বেরিয়ে গেছে। ছোট তাদের গ্রাম। বেশি লোকের বাস নেই সেখানে। সমস্ত জায়গা খুঁজেও বংশীলালকে পাওয়া গেল না।

পঞ্চু ছুটে গেল মোক্ষদার কাছে। টানতে লাগলো তার কাপড় ধ'রে।

মোক্ষদা নিজের মনে কি একটা কাজ করছিলো। যত সে বলে: কি রে, কি? পঞ্চু তত ওর কাপড় ধ'রে টানে। টেনে নিয়ে চলে গোয়াল ঘরের দিকে।

—কিরে, কি?—শূন্য গোয়ালঘরের চারদিকে অবাক হয়ে মোক্ষদা চায়। ব্যাপারটা যে কি, কিছুই বুঝতে পারে না।

পঞ্চু ব্যাকুলভাবে পাৎনার দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়, তার পরে গোঁজের দিকে। তবু মোক্ষদা বুঝতে পারে না।

উত্তেজনায় পঞ্চুর সমস্ত শরীর ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে। ব্যাপারটা কিছুতে মাকে বোঝাতে না পেরে সে গরুর দড়িটা গলায় দিয়ে মুংলীর মতো ডাকতে লাগলো।

মোক্ষদা হেসে ফেললে।

বললে, আ কপালের কপাল! মুংলী? সে বোধ হয় পুকুরপাড়ে বাঁধা রয়েছে দেখগে।

হাত নেড়ে, মাথা নেড়ে, মুখে একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ ক'রে পঞ্চু জানালে সেখানেও নেই।

মোক্ষদার মুখে এতক্ষণে যেন আশঙ্কার ছায়া নামলো। কোথায় গেল মুংলী তাহ'লে? কেউ কি তাকে খোঁয়াড়ে দিয়ে এলো না কি? রাত্রে শুতে যাবার আগে মোক্ষদা যথারীতি তাকে খোল-খড় দিয়ে এসেছে। এ তার নিত্যকর্মের অন্তর্গত। গলার দড়িও মুংলী ছেঁড়েনি। গোঁজের দড়ি যেমনকার তেমনি বাঁধা আছে। কেউ নিশ্চয় তাকে খুলে নিয়ে গেছে।

কে সে? চোরে?

অথবা বংশীলাল? বংশীলাল খুলে তাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

ভোরে উঠে সে যে কোথায় বেরিয়ে গেছে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। নীলগঞ্জের হাটে সুতো এসেছে কি না বংশীলাল মাঝে মাঝে তাই দেখতে বেরোয়। সেখানেই হয়তো গেছে। যেখানেই যাক, হুঁকো হাতে মোক্ষদার সামনে দিয়েই সে গেছে। মুংলীকে সে নিয়ে যায়নি তাতে আর সন্দেহ নেই। গেলে মোক্ষদা দেখতে পেতো।

তবে কি চোরে?

মোক্ষদা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো।

দেখতে দেখতে পাড়ার লোক এসে জুটলো।

রামু বললে, বিশ্বেস নেই বাবা। আমার তো সন্দ হয় এ চোরের কাজ। নিশেনপুরের বঙ্কু মোড়লের অমন সুন্দর দুধেল গাই নিয়ে গেল চোরে। আর এ তো বাঁজা গাই। দুধও দেয়নি কিছুই না।

—কথা মিথ্যে বলোনি খুড়ো। গেরস্ত বাড়ীর দুধেল গাই যারা চুরি ক'রে নিয়ে যেতে পারে, একটা বাঁজা গাই চুরি করা তাদের কাছে তো কিছুই নয়।

কার্যকারণ এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ ও বিচার বিবেচনা ক'রে সকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল যে, এ চোরেরই কাজ। তা ছাড়া আর কিছুই নয়। বেশ বোঝা গেল, গলার দড়ি খুলে মুংলীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দড়ি ছিঁড়ে পালায়নি সে।

তবু একবার গোটা গ্রামখানা চারিদিকের খাল-বিল বন-বাদাড় লোকের বাড়ীর আনাচ-কানাচ তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হ'ল। কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

পঞ্চু অনাহারে চারিদিকে ছুটোছুটি করছে মুংলীর সন্ধানে।

মোক্ষদা কাজকর্ম ছেড়ে দাওয়ায় মুহ্যমান হয়ে বসে।

পাড়ার মেয়েরা এসে সান্ত্বনা দিলে, কি করবে ভাই। মোড়ল আসুক, পুলিশে খবর দাও। দু'দিনে চোর বামাল শুদ্ধ ধরা পড়বে। তাই ব'লে গেরস্থ বাড়ী, উনুন না জ্বললে চলে? ওঠো, উনুন ধরাও। ভাতে-ভাত যা-হোক-দুটো ফুটিয়ে নাও। ছেলেটাকে দাও, নিজেও দুটো মুখে দাও। তারপরে ধরো, মোড়ল আসবে তেতে-পুড়ে একটু পরে, তার কথাও ভাবো।

তবু মোক্ষদা নিঃশব্দেই ব'সে রইল।

প্রতিবেশিনীরা জোর ক'রে তাকে তুলে রান্নাঘরে নিয়ে গেল। একজন উনুন ধরিয়ে দিলে, একজন জোর ক'রে তাকে বাসি কাপড় ছাড়িয়ে রান্না করতে বসালে।

ডালায় দুটো কি কি আনাজ পড়ে ছিল। তাই ভাতে ফেলে নামিয়ে নিলে মোক্ষদা।

কিন্তু খাওয়াবে কাকে?

পঞ্চু বিদ্যুচ্চমকের মতো একবার ক'রে রক্তবর্ণ মুখে বাড়ী ফিরছে, গোয়ালঘর, উঠান, খামার খুঁজে দেখে যাচ্ছে মুংলী ফিরেছে কি না, আবার ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাকে ধরবেই বা কে? খাওয়াবেই বা কে?

মোক্ষদা যেন কী এক রকম হয়ে গেছে। নড়াচড়া করতে পর্যন্ত তার কষ্ট হচ্ছে। দাওয়া থেকে নেমে পঞ্চুকে ছুটে গিয়ে ধরবে, এমন সাধ্য তার নেই।

ধরা গলায় কুণ্ডুদের বড় বৌকে বললে, ছোঁড়াকে ধরতে পারবে দিদি?

—আমি? ওরে বাবা!

বড় বৌএর সাধ্য নেই। জড়বুদ্ধি হাবা ছেলের মন বাড়েনি, কিন্তু

বয়স তো বেড়েছে। চাষীর ঘরের ষোলো বছরের জোয়ান ছেলে। তাকে ধ'রে আটকাতে পারে বড় বৌ? সাধ্য কি?

—কিন্তু ছেলেটাকে দুটো খাইয়ে তো নিতে হয়।

—তাহ'লে বরং রামুকে ডাকো। এইবার যখন আসবে পঞ্চু, জোর ক'রে ধ'রে দুটো খাইয়ে দিক।

খবর পেয়েই রামু এলো।

একটু পরেই পঞ্চু এলো। তার চোখ-মুখে ভয়ঙ্কর হিংস্র ভাব। একটুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। একটা অসহ্য জ্বালায় যেন সে ছটফট করছে। তার দিকে চাইতে ভয় করে।

রামু বললে, পঞ্চু, রান্না হয়েছে। দুটো খেয়ে নে বাবা। তার পরে আমরা দুজনে বেরুব খুঁজতে।

পঞ্চু বললে, না।

কঠিন, সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—না কিরে? সমস্ত দিন খাসনি। চোখ-মুখ শুকিয়ে গেছে।

—না।

পঞ্চু আবার বাইরে যাচ্ছিল, রামু ওকে জড়িয়ে [illegible] ধরে ফেললে।

বললে, শিগগির দুটো ভাত বেড়ে দাও ভাজ-বৌ। আমি নিজে খাইয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু খাইয়ে দেবে কাকে?

রামুর গায়ে অসম্ভব জোর। তার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার সামর্থ্য পঞ্চুর নেই। তার উপর সমস্ত দিনের অনাহার এবং রোদে-রোদে ঘুরে বেড়ানো, উদ্বেগ এবং অশান্তি।

পঞ্চু এঁকে বেঁকে রামুর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে

ছটফট করতে লাগলো। সে কী প্রাণপণ প্রয়াস! রামুর মতো শক্তিমান লোকও হিমসিম খেয়ে গেল।

মিনিট দশেক এমনি ধ্বস্তাধ্বস্তি চললো।

তারপরেই হঠাৎ পঞ্চুর সমস্ত দেহ কেমন ধনুকের মতো বেঁকে শক্ত হয়ে উঠলো। তারপরে রামুর বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে নেতিয়ে এলিয়ে পড়লো।

চোখ নিমীলিত।

ওরা সবাই হাহাকার ক'রে উঠলো।

মাথায় জল দিয়ে পাখার বাতাস ক'রে পঞ্চুর যখন জ্ঞান হ'ল তখন সূর্য ডুবু-ডুবু। গ্রামের ভিতরে অন্ধকার নেমে আসছে দ্রুতবেগে। চাষীরা গোয়াল-ঘরে সাঁজাল দিয়েছে। খড়ের চালের ফাঁক দিয়ে তারই ধোঁয়া সন্ধ্যার অন্ধকারকে যেন প্রত্যুদ্গমন ক'রে আনছে।

এমনি সময় ফিরলো বংশীলাল।

হাঁটুর নীচে পর্যন্ত কাপড় মালসাট মেরে বাঁধা। দুটো পা, মাথার চুল, এমন কি ভ্রূ পর্যন্ত ধূলায় শাদা। মাথায় একটা ধামায় নানারকমের অনেক তরকারী। মুখে পরিতৃপ্তির একটা অস্পষ্ট এবং শ্রান্ত হাসি। অনেকখানি পথ হেঁটে এসেছে বেচারা ওই বোঝা মাথায় ক'রে।

ক্লান্তভাবে ধামাটা দাওয়ায় নামিয়ে, গামছায় মুখটা মুছতে গিয়ে সমবেত সকলের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চেয়ে সে চমকে উঠলো।

পঞ্চুর জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু তখনও সে শ্রান্তভাবে শুয়ে।

—কি হ'ল ওর?

প্রথমে কেউ উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলে না। ওর দিকে

ফিরেও চাইলে না। সকলের দৃষ্টি এবং মনোযোগ পঙ্কুর দিকেই নিবদ্ধ।

বংশীলাল পঙ্কুর কাছে এসে দাঁড়াতে রাম্বু ওর সঙ্গে প্রথমে কথা কইলে: কী কাণ্ডই যে সমস্ত দিন গেল বংশীদা!

—কেন? কি ব্যাপার?

মুংলীকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত দিন রোদে রোদে পঙ্কু তারই খোঁজে ঘুরেছে। না খাওয়া-দাওয়া, না কিছু। তারপরে এই কাণ্ড!

বংশীলাল মুংলী সম্বন্ধে একটি কথাও জিগ্যেস করলে না। বললে, কি হয়েছিল? সর্দিগর্মি?

—কে জানে কি? সমস্ত শরীর সিটিয়ে উঠে, চোখ কপালে তুলে ছেলে যায় আর কি?

কুণ্ডুদের বড়বৌ ফিস ফিস ক'রে বললে, "হবে না গা? যেমন পঙ্কু, তেমনি মুংলী। দুটিই সমান অবলা। ভাই-বোনের মতো একসঙ্গে মানুষ হয়েছে। শোক কি ওর সোজা হয়েছে?"

বড় বৌ আঁচলে চোখ মুছলে।

এবারে বংশীলাল তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো:

—হ্যাঃ! ভাই-বোন! তোমাদের সবই ইয়ে! একটা বাঁজা গাই,—না দিত দুধ, না বিয়োত বাছুর! তারই শোকে চলাচলি! যত আদিখ্যেতা!

বংশীলাল খিড়কীর পুকুরে পা ধুতে গেল।

ফিরে এসে বললে, একটু তেল দাও তো। সমস্ত দিন চান খাওয়া কিছুই হয় নি। ভাত-টাত আছে? শরীরটা যেন তাঁ তাঁ করছে।

পঙ্কুর চারপাশের ভিড় আসতে আসতে হালকা হয়ে গেল। মোক্ষদা

এক বাটি তেল বংশীর পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে রান্না ঘরে গেল।

বংশীলাল তেল মেখে গেল স্নান করতে।

মোক্ষদা পঞ্চুর মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, দুটি ভাত খাবি বাবা?

মায়ের ডাকে পঞ্চু একবার চোখ মেললে। করমচার মতো লাল চোখ। কিন্তু উত্তরে সে যে কি বললে বোঝা গেল না।

সকালে উঠে পঞ্চুকে পাওয়া গেল না।

গোটা গ্রাম এবং মাঠ-ঘাট-বন সমস্ত খুঁজেও সমস্ত দিনের মধ্যে তাকে পাওয়া গেল না। কোথায় গেল সে কে জানে? মুংলীকে খুঁজতে? কিন্তু কোথায়?

দিনের শেষে অবসন্ন মনে শ্রান্ত দেহে বংশীলাল যখন ফিরে এল, মোক্ষদা তখন ঘোর উন্মাদ। তখনই হাসছে, তখনই কাঁদছে, তখনই উঠানে ধেই ধেই ক'রে নাচছে।

বংশীলাল ফিরতেই মোক্ষদা মস্ত বড় একখানা থালা ছুঁড়ে মারলে তার মাথার উপর। ভাগ্যগুণে তার মাথায় লাগলো না। পিছনের দেওয়ালে লেগে ঝন ঝন ক'রে মাটিতে পড়লো।

আর বংশীলাল সহ্য করতে পারলে না। লাফিয়ে দাওয়ায় উঠে তার চুলের মুঠি ধ'রে ফেলে নির্দয়ভাবে যেখানে-সেখানে মারতে লাগলো। সে কী মার! সহজ অবস্থায় মোক্ষদা হয়তো সে প্রহারে ম'রেই যেত। কিন্তু পাগল সে, মারের উপরে সে বংশীকে আক্রমণ করতে যায়।

তাকে হিঁচড়ে টেনে ঘরের মধ্যে পুরে বংশী বাইরে থেকে শিকল বন্ধ ক'রে দিলে।

রাত তখন কতটা কে জানে।

পাড়া নিশুতি। একদল শেয়াল গ্রামের প্রান্তে ডেকে এইমাত্র ফিরে গেল। মোক্ষদা সমস্তক্ষণ কাৎরে-কাৎরে কেঁদে এই একটু আগে চুপ ক'রেছে। বোধ করি বা ঘুমিয়েই গেছে।

বংশীলাল অতি সন্তর্পণে উঠলো। ঘরের প্রদীপটা জ্বাললে। তারপরে ঘরের একটা নিভৃত কোণ থেকে বের করলে, এক তাড়া নোট!

একটি-দুটি ক'রে নোটগুলি সে গুণলে। মোট এক-শো সাত-চল্লিশ টাকা। দু'টাকা ক'আনা গেছে তরকারি কিনতে। কোঁচড় থেকে ক'আনা পয়সা বের ক'রে হিসাবটা মিলিয়ে নিলে।

কী সুবিধাই হয়েছে যুদ্ধ বেঁধে!

একটা বাজা গাই, যার পিছনে শুধু খরচাই হত, লাভ হ'ত না এক পয়সা। তারই মূল্য দেড় শো টাকা! এত সুদ আর কোন দিন সে পেতো!

লোভে বংশীলালের চোখ প্রদীপের আলোয় চকচক ক'রে উঠলো। টাকাগুলো আবার সে সন্তর্পণে আগের জায়গায় লুকিয়ে রেখে দিলে। প্রদীপটা নিবিয়ে দিতেই চমৎকার অন্ধকার!

নিশীথনগরী

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

একটা হরিণ যেমন চমকে ওঠে।

বনে যদি আগুন লাগে। তেমনি।

অবিরাম-ধারায় বৃষ্টি পড়ছে তখনো, গোঁ গোঁ ক'রে জোলো-হাওয়া ছুটে চ'লেছে গোঙাতে গোঙাতে···তবু তখনো দিন। ভিজে ঝাপ্‌সা আলো তখনো জড়িয়ে রয়েছে নোংরা আকাশের এখানে-সেখানে। দিন ব'লে তাই যা' চেনা যায়। ভিজে ত' গিয়েইছি—তবু কেন আশ্রয় চাই?. অন্ধকারের. জন্ত প্রতীক্ষা কোরছিলাম। আশ্চর্য লাগে, না? মানুষে হা-হুতাশ করে আলোর জন্তে আর আমি প্রার্থনা করি অন্ধকার—নিবিড়, নিশ্ছিদ্র, নিরন্ধ্র অন্ধকারের জন্ত আমার শবরী-প্রতীক্ষা। আকুলভাবে।

ছোটলোকদের সীমানা এটা। রাত-বিরেতে ক্বচিৎ এক-আধ-আধলা ভদ্রলোকের মুখ যদি হঠাৎ ভেসে ওঠে—সে এমন কিছু ইতিহাসে লেখা থাকবার মত ব্যাপার নয়। উপস্থিত দু'ধারে শুধু নড়ব'ড়ে, ঘুণ-ধরা, ছেঁড়া-চট আর মাদুর-ঝোলানো পচা দোতালা, হিন্দুস্থানী ধোবির ময়লা কাপড়ের আড়ৎ, চাঁই মাড়োয়ারীর খুপ্‌চি-খুপ্‌চি লোহা-পট্টি—যতটুকু আন্দাজে পাওয়া যায়। তারপর, যতদূর তাকাও: খাসা রাস্তা, চওড়া রাজপথ—ডাবের খোলা, দেশলাইয়ের বাক্স, ছেঁড়া জুতোর ছড়াছড়ি—স্বাস্থ্যহীনতার বিচিত্র মৃণ্ময় মানচিত্র। ধাঙড়দের ময়লাফেলা গাড়ীর মোষ জিরুচ্ছে পরম নির্লিপ্ততায়—কাদার মধ্যে থেবড়ে প'ড়ে, যেন পরম ব্রহ্মে ধ্যানমগ্ন।

স্বল্প-পরিসর একটা নীচু টিনের চালার ছেঁচ-তলায় দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখ্‌ছিলাম। আর জামা-কাপড় নিঙড়াচ্ছিলাম, পাত্‌লুন আর পায়জামা, ভিজে পাউরুটী হ'য়ে গেছে একেবারে। ঈশ্বর ভদ্রলোকের খানিকটা সম্মান প্রাপ্য হলো আজ।

বিশেষ ধরণের কিছু শ্রদ্ধা কোনোকালেই ছিলো না সেই ভদ্রলোকটীর ওপর, কী অবিশ্বাসী নক্ষত্রে জন্মেছিলাম জানিনে, কোনোদিন সম্রদ্ধ হতে পারবো কিনা: সে-রকম কোনো দূরদৃষ্টির পরিচয়ও এখনো নিজের কাছে কিছুই দিই নি। কিন্তু জামা আর পায়-জামার ভিজে হাতাগুলো পরম যত্ন সহকারে নিঙড়াতে নিঙড়াতে ভদ্রলোকের আজ একটী সুবুদ্ধির তারিফ কোরছিলাম সত্যি সত্যি।

মেঘটা সমস্তদিনই ছিলো,—সেটা এমনকিছু আশ্চর্য্যের নয় কিন্তু সময়মত এই আকাশ-ভাঙা সমুদ্র না নামলে এতক্ষণ অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রাণবল্লভের হাত ধ'রে কুঞ্জে গিয়ে উঠতে হতো। আর

নগরে বড় একটা আসিনে।

উনিশ শ' বেয়াল্লিশের আগষ্টের ভূত আড়া ক'রে বেড়াচ্ছে এখনো পেছন পেছন, এখনো নামের ডগায় ঝুলছে রাত-সতীশ দুরন্ত দুরন্ত পারোয়ানা: ঝোড়ে-জংগলে, বাঁশবনে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছি জন্তুর মত। নগরের শানের পাঁচিল টপ্‌কে বেরিয়ে এসেই ভাগ্যিস সমস্ত বাংলাদেশটা এখনো আম-জাম আর তাল-নারকেলে মোড়া—নয়ত, অজানা দরদী বন্ধুদের প্রেমালিংগন থেকে কী ক'রেই না মান-ইজ্জৎ বাঁচাতে হতো—সে কথা ভাবতে গেলেও শিউরে উঠি। নিতান্তই বার্তাবাহকের অভাব আর বিশেষ রকমের তাগিদে প'ড়েই ভরদুপুরে একেবারে প্রাণ-চঞ্চল মহানগরের বুকে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। চেহারাটা প্রায় মেরে এনেছি, আগাপাছতলা ভোল পাল্টে ফেলেছি এই ক'বছরে। প্রকৃতিদেবীও অসীম করুণাময়ী—ঋষি-

সুলভ কেশ-শ্মশ্রুতে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে মুখমণ্ডল। ভাবছিলাম, যে-পেলব সুকুমার মুখকান্তির অনুসন্ধানে আকুল হ'য়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছেন প্রাণ-বল্লভ, এই কাষ্ঠবৎ দেহের দিকে সেই আকুল-করা সপ্রেম-দৃষ্টিতে আর ফিরে তাকাবার অবকাশ হবে কি? কিন্তু হে পুষ্পধনু! তোমাকে প্রণাম করি: তুমি মূককে বাচাল করো, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাও—চৌরঙ্গীর এক জনাকীর্ণ ট্রামের ফুট-বোর্ডের ঝোঝুল্যমান জনতার মাঝ থেকে দেখি বঁধুয়া বিহ্বল-নেত্রে তাকিয়ে আছেন আমারি লোমশ রাধা-অংগের দিকে। কোনো কাজ-কর্ম ত' হলোই না, সারাটা দিনও ঠায় মাঠে মারা গেলো—তবু যে শেষপর্য্যন্ত প্রাণ নিয়ে ফিরে আস্‌তে পেরেছি—সেইটেই আশ্চর্য্য। শেষপর্য্যন্ত অবস্থা এমনতরই সঙ্গীন হয়ে উঠলো: প্রাণ বুঝি সত্যি সত্যিই সঁপে দিতে হয় বঁধুয়ার হাতে। এঁকেবেঁকে, এখান দিয়ে—একেবারে ঘুরে ও-রাস্তা ঘুরে ও-রাস্তা পেছনে রেখে, একেক গলির মধ্যে যেন তিনচারবার ক'রে পাক খেয়ে খেয়ে যখন একেবারে হয়রাণ হ'য়ে পড়েছি, অবশেষে নাম্‌লো এই বৃষ্টি। আকাশ ভেঙে বৃষ্টিধারা নেমে এলো চারিদিক অন্ধকার ক'রে। এক দুর্বিনীত সাদা কুয়াশার পুরু পর্দা প'ড়ে গেলো সমস্ত মহানগরীর বুকে। আর সেই ছুট দিয়েছি। ভদ্রলোক বোকা হলেও অন্ততঃ যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন আজ। খানিকটে সম্মান তাঁর পাওনা হলো।

এমনসময়ে এই আগুন।

ত্রস্ত হ'য়ে উঠলাম দিশেহারা হরিণের মত।

মেঘান্ধকার ধারা-ঝরোঝরো আষাঢ়-সন্ধ্যা, কারো তোলা-উনুনের আগুন চল্‌কে জলে ওঠেনি কোনো খড়ের চাল, বাজও নয়, বিদ্যুতও নয়—তবু আগুন, দপ-ক'রে জ্বলে-ওঠা আগুনের মতই এই আশ্চর্য্যভাব। জামা-পায়জামাগুলো সত্যিই বিশ্রীরকম ভিজে গিয়েছে, হাতাগুলোকে

প্রাণপণে নিঙড়ে নিয়ে ঘাড় হেঁট ক'রে হাত ঝাড়া দিয়ে সমান ক'রে নিচ্ছি—এমনসময় অত্যন্ত বিস্ময়দীর্ণ গলায় হাঁকের পর উপর্য্যুপরি হাঁক: এই যে এখানে, এদিকে—

ত্রস্ত হয়ে উঠলাম নিমেষে: কোন্‌খানে কোন্‌দিকে?

কোন্ দিক থেকে ভেসে আস্‌ছে এই অনুসন্ধানী গলা? খুব সন্তর্পণে আনাচে-কানাচে তাকাতে চেষ্টা করি কিন্তু চারিদিকেই শুধু সেই পরিচিত পুরু-কুয়াশা, সাদা কুয়াশার চাদর ঝোলানো চারিদিকে—তা' ফুঁড়ে শুধু কালো আকাশের একটু যা আভাস পাওয়া যায় মাত্র, আর কিছুই চোখে পড়ে না।

কাছে-পিঠে কোথাও একটী জনমানবের সাড়া পর্য্যন্ত নেই। গাঢ় হ'য়ে এসেছে মৃত্যুর মত অন্ধকার। শুধু কোলাব্যাঙের বিরাট কোরাস্ বাজছে আশ-পাশের ড্রেনে। একটা বুড়ো গরু কেবল চলাটার একপাশে একরাশ গোবর-চোনার মধ্যে অবসন্ন দাঁড়িয়ে খুট্ খুট্ ক'রে চিবোনো আমের আঁটী উগ্‌লিয়ে উগ্‌লিয়ে ফেল্‌ছে।

আবার সেই গলা, সেই হাঁক। আর একটু জোরে এবং আরো একটু চেঁচিয়ে: এই যে এদিকে, এখানে—

সমস্ত শরীরের মধ্যে এবার একটা ক্রুর আগুনের হলকা ব'য়ে গেল—সেই দুরন্ত বর্ষার মধ্যে দাঁড়িয়েও সমস্তদিনের পরিশ্রম-ক্লান্ত, ভিজে ঠাণ্ডা রক্তেও অকস্মাৎ যেন চন্‌চন্ ক'রে উঠলো কড়া বারুদের ঝাঁঝ। তলপেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে জীবনরক্ষী আমার ছোট্ট আগ্নিক বন্ধুটীকে চেপে ধ'রে এবার তৈরী হ'য়ে রইলাম। —সমস্তটা দিন জ্বালিয়ে, অসংখ্য কাজ-কর্ম পণ্ড ক'রেও তৃপ্তি হয়নি, আবার এখেনে এসেও ধাওয়া ক'রেছে তা' হলে। যতদূর মনে হচ্ছে: তৈরী হয়েই এসেছে দলবল নিয়ে—'এখেনে' আর 'এদিকে'

ওই দুটী শব্দে কেবল আমার দিক-নির্দেশ কোরছে। তবে তাই হোক। এসো বঁধুয়া! এতদিন আমার প্রাণের জন্ত হয়রাণ হ'য়ে ঘুরছ, তোমারও ক্লান্তি-নিরসনের প্রয়োজন। এসো প্রিয়তম, তোমার প্রাণখানাই নাহয় আমার কাছে স্মৃতি হ'য়ে থাক। এসো, আমি তৈরী—

বৃষ্টির পুরু পর্দা ভেদ ক'রে অকস্মাৎ পায়ের কাছে, একরাশ কাদার মধ্যে ধপ ক'রে কি যেন একটা আছড়ে পড়লো এসে। আমার হাত ততক্ষণে ঠিক উঁচু হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু চম্‌কে উঠলাম ভয়চকিত এক বোবা কান্নায়—দু'খানা কাঠির মত লিক্‌লিকে হাত তুলে কাদামাখা ঐকটা ছ'সাত বছরের ছেলে প্রাণপণে যেন আমার করুণা ভিক্ষা কোরছে।

এ্যাঃ, কাদায় তুমি যে একেবারে 'ঘুরে' গেছ দেখছি—ছুটে গিয়ে বাঁ-হাতখানা হাত ধ'রে ছেলেটাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলাম।

: বোল্‌বে কিছু আমাকে?

—ছেলেটা ধুঁকছে তখনো। দুর্গন্ধ পচা কাদায় ওর মুখ-চোখ একেবারে ঢেকে গিয়েছে—দু'হাত দিয়ে যথাসম্ভব মুছে ফেলে, পিট্ পিট্ ক'রে দু'টো ছোটো ছোটো মুরগীর মত চোখ তুলে কয়েকবার ভালো ক'রে তাকিয়ে নিলো এদিক-ওদিক্—তারপরে যা' বোল্‌লে, তাতে একটা অভিনব বিস্ময়বোধ না ক'রে পারলুম না! সেই দারুণ বৃষ্টি এবং অন্ধকারের মধ্যেও এটুকু অন্ততঃ বোধগম্য হ'লো: ছেলেটার মুখে-চোখে কোথায় যেন একটা অন্তমান মধ্যবিত্ত বংশের অস্পষ্ট লাবণ্য আল্‌তোভাবে আট্‌কে আছে তখনো। যেটা যাই-যাই ক'রেও এখনো টিকে আছে টায়-টোয়।

: বাবা আপনাকে ডাক্‌ছেন। ওই যে ঐখেনে দাঁড়িয়ে—ঠিক আমার মুখোমুখী রাস্তার ওপারে একটা দীর্ঘ একহারা দোতালা

বাড়ীর দিকে সে আঙুল দেখালে। তখনো মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ-পৃথিবী একাকার হ'য়ে নাচ্ছে দুরন্ত দুর্যোগে। সেই কুৎসিৎ কাদার রাস্তাও একেবারে ভরোভরো। সারি সারি মড়ার মাথার মত ডাবের খোলাগুলো ভেসে চলেছে কাঁপতে কাঁপতে। আর সেই বৃষ্টির সংগে সন্ধ্যার কঠিন অন্ধকার গুলে গুলে আরো বীভৎস হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভয়-আড়ষ্ট রাত্রির মহানগর—ছোটলোকদের পাড়ার ঠুলি-দেওয়া আলোগুলোও মুছে দেওয়া হয়েছে একেবারে। সাধারণ আলোর সম্মানটুকুও বুঝি এদের প্রাপ্য নয়।

ওপারে প্রেতের মত একটা অস্পষ্ট ভাঙা দোতালাবাড়ী ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে বটে কিন্তু সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে কে এমন শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আমার জন্যে অপেক্ষমান হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন—অনেক ভেবে-চিন্তে কিছুতেই কিছু ঠিক কোরতে পারলাম না। আর কেনই বা তিনি দাঁড়িয়ে আছেন? আমার প্রতি এতটা সহৃদয় হ[illegible] মত উদারতাই বা তাঁর কেন হ'লো? এবং এখানে কোনো তথাকথিত ভদ্রলোকই বা বাস করে নাকি? তেলের কলের কুলি, ধাঙড়, হিন্দুস্থানী ধোবি—যতদূর চেনা যায়, এরাই ত' এখানকার শাশ্বত অধিবাসী, কেমন যেন অস্বাভাবিক ব'লে মনে হতে লাগ্‌লো সমস্ত ঘটনাটা।

ছেলেটার হাত ধ'রে বললাম: ভিজ্‌ছো কেন ভাই, চলো ওই চালাটার নীচে চলো—কিন্তু আমারি হাতে উল্টো টান দিয়ে বোল্‌লো ছেলেটা: বারে, আপনি আসুন। ওই ত' বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন সিঁড়ির ওপর। আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আসুন—নয়ত, আমাকে মেরে একেবারে খুন ক'রে ফেলবে—

আর দ্বিরুক্তি মাত্র অবসর না দিয়ে সেই কাদা আর জলের মধ্যে দিয়ে আমাকে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে চল্‌লো সে। কোনো প্রতিবাদ করার অবসর পর্য্যন্ত পেলাম না।

এই যে, এইযে এখানে, এদিকে—

চমকে তাকালাম। আবার সেই গলা। সেই বিশ্রী বিরক্তিকর, কর্কশ আওয়াজ। দেখলাম: একটা একফুট পরিসরের অন্ধকার সিঁড়ি উঠে গেছে ঠিক আমারি সুমুখে। সেই লঝ্‌ঝড় ভাঙা দোতলাটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। ছেলেটা তখনো আমার হাত ধরে আছে তেমনি প্রাণপণে। এবার বোল্‌লাম তাকে: হাতটা ছেড়ে দাও, ভাই। আর ত' আমি এসেই গেছি—এখনত' আর সত্যিই পালাতে পারছি নে।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই সেই অন্ধকার সিঁড়ির ভেতর থেকে ক্ষেপা কুকুরের মত ছেলেটাকে তাড়া ক'রে নেমে এলেন এক ভদ্রলোক, সেই কর্কশ গলার স্বর: য়্যাঁ, এখনো ধ'রে আছিস্ হাত। ছেড়ে দে, হাত ছেড়ে দে বেটাচ্ছেলে—ভদ্রলোকের আঙুলগুলোর দফা একেবারে রফা ক'রে দিয়েছিস্।

ওরে বাবারে—ভয়ার্ত গলায় লাফ দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল ছেলেটা সেই দারুণ বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে।

সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা ভোজবাজী। একটা অহেতুক সন্দেহের ক্ষীণ ধোঁয়াও যে বুকের ভেতর তাল পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিলো না, সে কথাও অস্বীকার করা যায়না।

: আসুন, আসুন। উঠে আসুন—

উঃ, কী জঘন্য সেই সিঁড়ি। একপাশে ঘুণ-ধরা নোনা দেয়াল আর একপাশে সমান্তরালভাবে উঠে গেছে পচা, স্যাঁওলা পড়া কোন্ আদ্যিকালের কাঠের রেলিঙ।

তাও মাঝে মাঝে হাঁ হাঁ কোরছে সিঁড়ি খুলে গিয়ে। কোন ধাপে ধাপে ইঁটও নেই। এখানে-ওখানে এক পুরু করে উঁচু হয়ে উঠেছে ছাগলের নাদি আর ভিজে-ওঠা শুক্‌নো গোবর। এক জায়গায়

দু'টো ধাপের মাঝখানে সাপের জিভের মত খানিকটে আলো চক্ চক্ ক'রে উঠলো।

দেখবেন, ঐখানটা সাবধানে আস্‌বেন একটু। ওখানটা ইঁট খসে গিয়ে আল্‌গা হ'য়ে গেছে একেবারে। বাড়ীওলা প্রভু মাড়োয়ারী—মাসে মাসে প্রথমদিনে ভাড়াটী ঠিক এসে গুণে নিয়ে যায় মশাই, আর এসবগুলো মেরামত ক'রে দেবার কথা উঠ্‌লেই, প্রত্যেকবারই স্তোকবাক্য দিয়ে ব্যাটা সেই যে স'রে পড়ে আর একমাসের মধ্যে চুলের টিকিটী পর্য্যন্ত দেখতে পাবেন না তার—

কী উত্তর দোবো এর? সোজা উঠ্‌তে লাগ্‌লাম মূর্ত্তির পেছন-পেছন, ভদ্রলোকের মুখ পর্য্যন্ত দেখিনি এখনো। দেখলাম, শুধু ট্যাবাপড়া একখানা কংকাল। আর খন্‌খ্‌নে গলায় সেই কংকাল মাঝে মাঝে কেবল কথা ক'য়ে উঠ্‌ছে। এ যেন কোন্ প্রেতের পেছন পেছন এক প্রেতলোকে যাত্রা কোরেছি আধিভৌতিক একখান হাড়ের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে। কিন্তু কী জন্যে?

আরেকবার নোতুন ক'রে চমকে উঠ্‌লাম।

প্রতি মুহূর্তেই নোতুন নোতুন বিস্ময় এখানে।

মুখ দিয়ে ছোট্ট একটা ভীতি-ব্যঞ্জক শব্দও বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই কখন বেরিয়ে গিয়েছিলো—খেয়াল করিনি অত। এবং এরি মধ্যে যে সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে একেবারে দোতালায় পৌঁছেচি—টের পাইনি তাও। হুটোপাটি ক'রে তাল পাকিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পায়ের ওপর পড়েই—খিচিমিচি খিচিমিচি—একটা অদ্ভুত কোলাহল তুলে কী এক শ্রেণীর সচল জীব বিছিন্ন হয়ে আবার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আবার মুহূর্তের অবসর মাত্র না দিয়ে সংগে সংগে আরো একঝাঁক পাখীর মত ঝট্‌পট্ ক'রতে ক'রতে কারা এসে মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়েই মুহূর্ত্তের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

আরে, আপনি যে বিশেষরকম ঘাবড়ে গেছেন দেখছি। আসুন, আসুন—ও কিছু নয় মশাই, ও কিছু নয়। ইঁদুর আর তেলাপোকা। আপনাকে অচেনা লোক দেখেছে বলেই প্রতিবাদ ক'রে উঠলো। আমাদের ও-সব খুব গা-সওয়া। চ'লে আসুন, ও'তে ভয় পাবার কিছু নেই—ভদ্রলোক এগিয়ে যেতে লাগ্‌লেন।

কিন্তু আমাকে এত রাজ-সম্মানের আসল উদ্দেশ্যটা কি, কেনই বা এই অযাচিত প্রীতি, এই শুভেচ্ছা ও করুণা প্রদর্শন—কেন? অথচ এখনো পর্য্যন্ত কোনো আত্মস্বার্থের পরিচয়ও ত' দিলেন না ভদ্রলোক! কিছুই অনুমান করতে পারিনা, নিশ্চিন্ততাও আসে না। কোন্ গহ্বর থেকে, কখন্ কালোডানা মেলে ছুটে আসে বিপদ—আমার সেই আত্মিক বন্ধুকে সর্ব্বদাই হাতের মুঠোর মধ্যে রাখছিলাম কঠোরভাবে।

একটা দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। একটা ফেনায়িত টক গন্ধে থম্‌থম্ করছে অন্ধকার স্যাঁতসেতে ভারী বাতাস। কার্বন ডায়ক্সাইড্ তালে তালে ঝুমুর বাধছে চারিদিকে, এত অন্ধকার যে চোখে ধাঁধা লাগে—নীল সবুজ নানারঙের ঝিলিমিলি জেগে ওঠে চোখের মণিতে। মৃত্যুর অগণ্য বীজাণু। কড়ি-বরগা বেয়ে টুপিয়ে টুপিয়ে জল পড়ছে। সূর্য্য এখানে কতকাল আসেনি? ঈশ্বর! এখানেও তাহলে মানুষ বাস করে। মধ্যবিত্ত ধোপ-দোরস্ত ভদ্রপরিবার, মহানগরের দিনের আলোয় যারা টগর ফুলের মত ছড়িয়ে থাকে ট্রামে, বাসে, রেস্তোরায়, অফিসে আর আদালতে!

ঘড়্ ঘড় ক'রে একটা আওয়াজ হলো।

এবং তারপরেই কংকালের সেই অন্ধকার গলার খন্‌খনে প্রীতি-সম্ভাষণ, সুপরিচিত:

এই যে এদিকে, এখানে।

যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখানে থেকে বাঁ হাতে বেঁকতে হ'লো।

: আলো মশাই, জ্বালা হয়নি এখনো। চলে আসুন। ভয়ের কোনো কারণ নেই। হাতের পাশেই দেয়াল পাবেন। দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে সোজা চলে আসুন। এখানে আর কোনো ভাঙা-চোরা নেই, সোজা এসেই ঘর—

ঘুরঘুট্টি ভূতের মত অন্ধকার। ভয়ে ভয়ে কতকটা আলগোছে এসে যেখানে প্রবেশ করলাম—তাকে ঘর বলে মেনে নিলে যথেষ্ট বেশী সম্মান দেওয়া হয়। বিবর।

আমার হাত ধ'রে কিসের ওপর একটা বসিয়ে দিয়েই ভদ্রলোক যেন ছুটেই বেরিয়ে গেলেন।

:ব্যস্ত হবেন না, এখুনি আস্‌ছি। একটা আলোর ব্যবস্থা ক'রে আসি। বিশেষ নড়চড় কোরবেন না—চেয়ারটার আবার একটা পায়া-ভাঙা কিনা! তবে পড়বে না অবশ্য—দেয়ালে হেলান দেওয়া আছে, বসুন আপনি, এলাম ব'লে আমি—

এক নিঃশ্বাসে মুখস্থর মত তর তর ক'রে এতগুলো উপদেশ, আশা এবং ভরসার বাণী শুনিয়ে ঝড়ের মত নিমেষে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল সেই কংকাল।

নিস্তব্ধ, কনক'নে ঠাণ্ডা ঘর।

একটা ছুঁচ পড়লেও বুঝি তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত বাড়ীতে।

টুপ-টাপ ক'রে ছোটো ছোটো একেকটা শব্দ হচ্ছে এদিকে ওদিকে, থেকে থেকে। জল পড়ছে। বৃষ্টির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে ছাত থেকে। অনেকক্ষণ বসে থাকলে মনে হয় কে যেন কাঁদছে।

অতিক্রান্ত হয়ে চ'লেছে মুহূর্তের পর মুহূর্ত। ঠায় ব'সে আছি। বুঝি আলো আসে।

ফর ফর ক'রে তেলাপোকা উড়ছে। ঝটাপটি করতে করতে ছুটে চলেছে ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁদুর। অদ্ভুত ইঁদুর—যেন ইঁদুরেরই রাজত্ব! হ্যামিলিনের কথা মনে পড়ে। জল পড়ছে। টুপ-টাপ: থেকে থেকে সেই কান্নার মত মেঝের ওপর একেকটা ক'রে গোল শব্দ।

: অনর্থক প্রতীক্ষা কোরছেন, উনি আর আসবেন না—

সেই প্রেতায়িত কুটুরীর এক কোণ থেকে ক্লান্ত সরু গলায় কে যেন কথা ক'য়ে উঠলো। এবার সারাটা গা সত্যিই ছম ছম ক'রে উঠলো। এর জন্যে সত্যিই প্রস্তুত ছিলাম না। এর মানে?

বিদ্যুৎ-তাড়িতের মত চেয়ার থেকে ত্রস্তে উঠে দাঁড়িয়ে দীপ্ত কণ্ঠে ব'লে উঠলাম, কে?

ছোট্ট উত্তর: মানুষ।

: কে আপনি?

: ওই ত' বোল্লাম—এবার বিদ্রূপে বেঁকে এলো সেই গলা: মানুষ এবং আরো লোভনীয় যা এমনরাত্রে, মেয়ে মানুষ। কিন্তু অমন 'আপনি' বলে অনর্থক লজ্জা দিচ্ছেন কেন? আরেকটু মিষ্টি ক'রে ডাকুন, 'তুমি' বোলুন।

স্তম্ভিত হ'লাম: কি বোলতে চান আপনি?

এবার খিল্ খিল্ ক'রে হেঁসে উঠলো, সেই অদৃশ্য নারী-কণ্ঠ। সে হাসি শুনলেও ভয় হয়: অমাবস্যার রাত্রের নিস্তব্ধ শ্মশানের ছায়ামূর্তিদের হাসি।

ক্রমাগত হাস্‌ছে মেয়েটি! সে হাসির যেন আর শেষ নাই। মৃত্যু গলে গলে পড়ছে। যেন ঝুড়ি-ঝুড়ি শবাস্থি টুকরো-টুকরো হ'য়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে।

তারপর, হাসি থেমে গেল। আরেকটী ব্যঙ্গাত্মক প্রশ্নের শাণিত

তীর উড়ে এলো সাঁ করে: সত্যিই কি বুঝতে পারেন নি? যা বোলতে চাই, খুব অস্পষ্ট লাগছে কি এখনো?

এখনো সত্যিই পারিনি। কিন্তু এইবার সমস্ত পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। ছেলেটির সেই ছুটে গিয়ে পায়ের কাছে পড়া, সেই কংকালের মুহুর্মুহু বীভৎস গলায় চীৎকার এবং এখানে সযত্নে এনে বসিয়ে দিয়ে ঝড়ের মত নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে যাওয়া—সব পরিষ্কার লাগছে এখন, কুয়াসা-ছেঁড়া কড়া রোদ্দুরের মত অত্যন্ত স্পষ্ট এখন সব। উলংগ।

ব্যাপারটার আকস্মিকতার আঘাতটা আস্তে আস্তে সামলে নিলাম খানিকপর।

তারপর একটা অহেতুক প্রশ্ন কোরলাম: সে কোথায়? সেই ছেলেটি?

পরিষ্কার অকুণ্ঠ গলা, কোথাও এতটুকু লজ্জার লেশমাত্র নেই: ওঃ, আমার ভায়ের কথা বোল্‌ছেন? সে কি আর এখনো ব'সে আছে এখেনে? অতটুকু ছেলে—কষ্টও হয়, কোথায় লেখাপড়া শিখবে—আর পাঁচটা ভদ্রলোকের ছেলের মত সুস্থভাবে বড় হ'য়ে উঠবে, তা নয়। কিন্তু উপায়ই বা কি? যাক্‌গে, সে অনেক কথা। যা' জিগ্যেস্ কোরছিলেন: সে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে অলিতে-গলিতে, আনাচে-কানাচে। ও শিকার ধরে, আমি খেলাই, বাবা ট্যাক্স আদায় করেন, বুঝলেন?

খানিকক্ষণ চুপচাপ। কারো মুখে কোনো কথা নাই।

বোবা হ'য়ে গেছি আমি। কী বোল্‌তে পারি, কী কোরতে পারি, কী কোরতে পারা যায়?

নিজেকে আশ্চর্য্যরকম দুর্বল মনে হচ্ছে এখন—এই মুহূর্তে

এখান থেকে ছুটে পালাতে পারলে যেন বাঁচি, কিন্তু পা দু'টো এত নিঃসাড় আর ভারী!

বিচিত্র জীবন আমার। পথে-ঘাটে, জলায়-জংগলে, খালে-বিলে সাপ-খোপ আর সরীসৃপের সংগে আড়াআড়ি ক'রে বসবাস। কিন্তু মহামহিমময় বৃটিশ-সভ্যতার উদ্ধত অহমিকার মহানগর, সভ্যতা সমুজ্জল মহানগরের অন্তরালে এ কোন্ প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের দেশ, মানুষ যেখানে সূর্য্য থেকে বহুদূরে পুতিগন্ধময় পুন্নাম বিবরের মধ্যে আলোর জন্যে হাহাকার ক'রে, প্রতিনিয়ত টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে কান্নায়? এ কোন্ দেশ! এরা কোন্ দেশের মানুষ!!

কাঁধের ওপর আচম্বিত একটা মৃদু স্পর্শ।

সাপের মত ঠাণ্ডা একখানা অন্ধকার হাত, একটা চাপা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ—বোধহয় ময়লা-শাড়ীরই হবে। সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়লাম।

আসুন। অনর্থক আর সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি? বাবার খাতায় প্রতিটী মিনিট সেকেণ্ডের হিসেব ওঠে যাচ্ছে। আপনাকে একটু ভিন্ন ধরণের মানুষ ব'লে মনে হচ্ছে। সেইজন্যেই অযথা কতকগুলো আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ করাতে রাজী নই। চ'লে আসুন, তাড়াতাড়ি চ'লে আসুন—অত্যন্ত অধীরভাবে হাত ধ'রে টানাটানি করতে লাগলো মেয়েটি।

: তুমি ভুল কোরছো—এতক্ষণ পর তাকে 'তুমি' বোল্‌লাম। তারপর, ন'ড়ে চ'ড়ে আরো শক্ত হ'য়ে বস্‌লাম চেয়ারে।

: ভুল আমি করি না। করলেও খুবই কম করি। দেখিনি এখনো আপনাকে—কিন্তু, স্পষ্টই আন্দাজ করতে পারছি—অন্য জাতের মানুষ আপনি। কিন্তু নিজের দিকটাও আবার আমাকে দেখতে হবে ত'। পয়সা আপনার কাছ থেকে আমি নোবোই, কিন্তু

আমারো ত' একটা বিচার বা কর্তব্যবুদ্ধি ব'লে জিনিষ আছে—কিছু না দিয়ে আপনার কাছ থেকেই বা কিছু আদায় করি কি ক'রে?

—শেষদিকে বড্ড যেন অসহায় লাগলো ওর কণ্ঠস্বর।

আবার সেই গলা। সেই কর্কশ হাড়গিলের মত রুক্ষ চীৎকার:

এই যে এখানে, এদিকে—

ধারা-ঝরোঝরো নিস্তব্ধ বর্ষারাত্রির বুকে দু'খানা ধারালো সড়কি গিঁথে কে যেন এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে দিলো। আবার সব চুপচাপ। শুধু অস্পষ্টভাবে কোথায় যেন একটা ঘুম-ভাঙা কুকুর অনর্থক খানিকটা ঘেউ ঘেউ ক'রে চীৎকার ছড়িয়ে দিয়েই অনর্থক ভাবেই আবার থেমে গেল।

বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলাম মেয়েটীকে: ওটা কি হ'লো?

: ও কিছু নয়—নির্লিপ্ত নিরুত্তাপ গলায় উত্তর দিলে সে: ও মাঝে মাঝে ঐরকম এক-আধবার ক'রে অমন চীৎকার ক'রে ওঠেন উনি—অন্ধকারের মধ্যে কোনো নিরুদ্বিগ্ন পথচারীকে যদি হঠাৎ আকৃষ্ট করা যায় এদিকে। কিন্তু—

মেয়েটী দীপ্ত হয়ে উঠলো এবার: কিন্তু আপনার মতলবটা কি বোলুন ত'? ঠায় কি এখেনে ব'সে ব'সেই রাত্রি কাটিয়ে যাবেন? আর এই অন্ধকারেও আপনার চেহারা যেটুকু কল্পনা কোরতে পারছি—তা'তে ত' পকেটের অবস্থাও খুব সুবিধের ব'লে মনে হচ্ছে না।

তাই ত'? এ কথাটা ত' চিন্তা করিনি এতক্ষণ।

এখানে রাত্রি কাটাবোই বা কোন্ অধিকারে? নীতি-জ্ঞানের সহস্রতম কথা জলাঞ্জলি দিলেও, আমার পকেটও ত' সত্যিই গড়ের মাঠ। এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে নিয়ে হঠাৎ একটা যেন মীমাংসায়

পথ খুঁজে পেলাম—খুব গম্ভীরভাবে জবাব দিলাম, একটা পাকা শয়তানের মত, বেশ জোরের সংগেই, যেন আমার আত্মসম্ভ্রমে বেশ খানিকটা আঘাত লেগেছে, এমনি গাম্ভীর্য্যে :

আমার পকেটের অবস্থা সম্পর্কে তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকলেও—অনুমানটা আমাকে না জানালেও চলতো। চেহারাটা সুবিধেমাফিক না হলেও আমিও যে লাখটাকার মালিক না হতে পারি—এমন ত' কোনো কথা নয়। কথাটা ভালো বলতে পারলে না ত'! সে যাই হোক, যথাযথ প্রাপ্তিযোগ সম্পর্কে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। কিন্তু আর একটা দিকও আছে : তোমার চেহারাটাও দেখা দরকার আমার। দাম দেবো যখন—

খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো মেয়েটা : ওঃ, তাই বোলুন। আমারি ভুল হয়েছিলো—আপনি যে একটু অন্যজাতের লোক, রুচিবান ব্যক্তি কিনা? নিশ্চয়—দাম দেবেন, যাচাই ক'রে নেবেন না? কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি জানেন—চেহারা খুব কম লোকেই দেখতে চায়। এখানে যারা আসে, বিশেষ ক'রে এই রকম রাত্রে, কুকুরের মত হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে আসে সমস্ত শরীরে বৃষ্টি আর বেমো-দুর্গন্ধ মেখে। দাম দেয়, কাজ ফুরুলেই চ'লে যায়। আপনাদের মত লোক আর ক'জন মেলে বলুন? সেই জন্যই আলোর বড় একটা দরকার হয়না। আচ্ছা, দাঁড়ান একটু, দেখি—

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে আবার থমকে দাঁড়ালো মেয়েটা : দেশলাই আছে? তা হলে রেড়ির তেলের একটা প্রদীপ ছিলো বোধহয়, চেষ্টা ক'রে দেখতাম নয় একবার—

দেশলাই ছিলোনা, দরকারও হয়না। দুঃখের সংগে বললাম : নাতো'।

: তা হলে—অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

: ব্যবসা করো, এসব পাট তোমার থাকা উচিত—কঠিন কণ্ঠে বোললাম।

দমলো না সে, সমান তেজের সংগেই জবাব দিলে :—উচিত তা জানি। কিন্তু তেল পাবো কোথায়? তেলের 'কিউ'তে গিয়ে সমস্ত বেলা কাটিয়ে আসতে গেলে ঐ বুড়ো আর শিশুটাকে তা হলে উপোষ ক'রে থাকতে হয়। না দাঁড়িয়েও অবিশ্যি পাওয়া যায়—কিন্তু দোকানিকে আলাদা বক্‌শিস দিতে হয় তাহলে। ভদ্রলোক দোকানী কিনা? কিন্তু আমারো ত' মানুষের শরীর, আমি—কি বোলতে গিয়েই অকস্মাৎ থেমে গেল, তারপরেই চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে : আচ্ছা, আপনি একটু বসুন ত, এই এলাম ব'লে—

রাত্রি গভীর।

ঢং ঢং ক'রে দূরে কোথায় বারোটার ঘণ্টা পড়ছে।

রাত্রির হৃদ্‌পিণ্ডে কে যেন হাতুড়ি ঠুকছে। সে ধ্বনি বড় ভয়াবহ।

কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ছে এক বিভীষিকার বার্তা।

বৃষ্টির বিরাম নাই। বাইরে শুধু একটা চাপা ঝম্‌ঝম্ আওয়াজ। বেশীক্ষণ কাণ পেতে থাকলে বুঝি সমস্ত চেতনাও আড়ষ্ট-আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আকাশ-পৃথিবী কাঁদছে। নিপীড়িত ভারতবর্ষের বুকের ভেতর থেকে বুঝি পাক দিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আস্‌ছে আজ এই অফুরন্ত কান্না : মুক্তি-প্রাগূষার পূর্বমুহূর্ত পর্য্যন্ত বুঝি এবর্ষণের আর বিরাম নেই।

একটিও পয়সা নেই পকেটে। অথচ মেয়েটিকেও বেশ বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। একবুক প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে সে আমার দিকে—এখন তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে জঘন্য কাপুরুষতা বুঝি আর কিছু নেই। এও একপ্রকার শোষণ :

ক্ষুধিতের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া, বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাসকে আরো দীর্ঘায়িত করা। দরজার কপাটটায় 'ঠক্' ক'রে একটা আওয়াজ হলো।

: কে?

একপ্রকার ছুটে এসেই একেবারে বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। আত্মসম্মানের ওপর ছপাৎ ক'রে একটা চাবুক প'ড়লো। দু'হাত দিয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে অত্যন্ত অপ্রসন্নকণ্ঠে প্রশ্ন কোরলাম: কী চাই তোমার?

দুই হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধ'রলো: চুপ। একটীও টুঁ শব্দ করবেন না। শব্দ হলেই বিপদ। নীচু গলায় শুধু আমার প্রশ্নের জবাব দিন। লুকোবেন না আমাকে, আপনি কি স্বদেশী?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে বস্লাম, গলার স্বরও রুক্ষ হ'য়ে উঠলো অতিমাত্রায়: কেন? সে খোঁজে দরকার কি তোমার?

এইবার আমার পা চেপে ধরলো সে অসহায় ভাবে: আছে দরকার। দোহাই আপনার—দয়াক'রে কেবল একটু আস্তে কথা বোলুন।

আস্তেই বোল্লাম সমস্ত উদ্বিগ্নতা গোপন ক'রে: কি বোল্তে চাও?

আমার হাত ধ'রে চেয়ার থেকে অপ্রকৃতিস্থভাবে উঠিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে চ'ল্লো ঘরের মাঝখানের দিকে—থাম্লো এসে থলে-ঢাকা একটা ভাঙা জান্লার সুমুখে, তারপর দ্রুত ব'লে যেতে লাগলো:

পালান আপনি, শীগগির পালিয়ে যান। সিঁড়িতে দু'জন পুলিশের লোক এসে বাবার সংগে ফিস্ফাস ক'রে আপনার সম্বন্ধেই কথা বলছে। বাবাকে টাকা গুণে দিচ্ছে—এখুনি ঘরের মধ্যে এসে

ঝাঁপিয়ে পড়বে। টাকার জন্যে বাবা সবকিছু করতে পারেন। পালান আপনি। কেমন সন্দেহ হ'লো ব'লেই তখন বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে—বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত শুনে এলাম আমি। এলো ব'লে ওরা: আর দেরী করবেন না—আসুন, এই যে এখান দিয়ে পথ—

রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে—স্পষ্ট বোঝা গেল। তার গরম, উদ্বিগ্ন, দ্রুত নিঃশ্বাসগুলো রাশে রাশে আমার বুকের ওপর পড়তে লাগলো সাপের শিষের মত। ঝোলানো বেণীটাকে আস্তে আস্তে একপাশে একটু সরিয়ে, পেছন ফিরে দরজার দিকে আর একবার তাকিয়ে, আমাকে ঠেলে আগিয়ে দিলো সেই পথে: এখান থেকে—সেই ঠিক ওদিককার মত ঐ রকম একটা সিঁড়ি পাবেন। তবে একতলা বরাবর গিয়ে সিঁড়িটা একেবারে ভেঙে গেছে—সেখান থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়তে পারবেন না?

বিমূঢ়, বিস্মিত, স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম পাথরের মূর্তির মত।

তারপর, আস্তে আস্তে মায়ের-দেওয়া শেষ সম্বল সেই লাল টকটকে প্রবালের আঙটাটা আঙুল থেকে খুলে ওর দু'খানা হাত মুঠোর মধ্যে নিবিড় ক'রে টেনে নিয়ে সেখানে রেখে দিলাম।

প্রবল প্রতিবাদে আমার পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো সে।

জোর ক'রে তাকে সরিয়ে দিয়ে অন্ধকারে ভাঙা সিড়ির ওপর এসে দাঁড়ালাম। এমনসময় কড় কড় ক'রে একটা দুঃসাহসিক হুঙ্কার দিয়ে, আকাশখানাকে ফালি ফালি ক'রে চিরে, এঁকেবেঁকে ছুটে বেরিয়ে গেল একটা বাজ, আর সে রূঢ় আলোয় চম্‌কে ফিরে তাকিয়ে যা' দেখলাম, তা' মরণেও ভুলবার নয়।

দেখলাম: ঝরে-যাওয়া মাধবী এসে পলকের জন্যে আমার চোখের সুমুখে দাঁড়িয়েছে। বড় আদরের সেই মা-মরা একটীমাত্র বোন মাধবী আমার—মনে পড়ে—দু'টী টলটলে জলভরা চোখে মাধবীও সেদিন আমার

বিদায়ের পথে এমনি ক'রে এসে দাঁড়িয়েছিলো। উনিশ শ' বেয়াল্লিশের জলন্ত আগষ্ট : মৃণ্ময়ী মৃত্যুর ডাক এসেছে তখন ঘরে ঘরে : হুহু ক'রে দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে নগর থেকে গ্রাম-গ্রামান্তরে : ঘরের আগল ভেঙে বন্যার মত পথে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রাণ-পতঙ্গ। আগষ্ট : উনিশশ' বেয়াল্লিশ : এক বে-আইনি সূর্য্যের আলোয় টলমল টলমল ক'রে কাঁপছে সারা ভারতবর্ষের আকাশ।

বাড়ীর সুমুখ দিকে সেদিনও এমনি ক'রে ভূত এসেছিলো।

মাধবী ধ'রে রাখেনি, মাধবী বাধা দেয়নি : শুধু এমনি ছুটি মায়াদাখা জলভরা চোখ তুলে আমার বিদায়ের পথে নীরবে এসে দাঁড়িয়েছিলো এমনি ক'রে দুরন্ত নিশীথরাত্রে। জোর ক'রে বুক থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নামিয়ে দিয়ে, ভাঙা সিঁড়ির আরেক ধাপের দিকে পা বাড়ালাম।

অন্ধকার মহানগর।

সন্ধ্যাবেলা দীঘির ওপর তাদের কথা হচ্ছিল। ভ্রমরকে ডেকে, পুকুরের পাঁক দুঃখ করে বলছিল, তুমি কি নিষ্ঠুর! রোজ তুমি আমাদের পাড়ায় আস···কিন্তু পদ্মের সঙ্গে মেলামেশা ছাড়া, একদিনও তুমি আমাদের কাছে আসো না···জান না কি, যে-পদ্মকে তুমি এত ভালবাস, সে আমার এই পাঁক থেকেই জন্মেছে?

হেসে বলে ভ্রমর, সেই জন্যেই তো সকলের চেয়ে পদ্মকেই এত ভালবাসি! তোমার পাঁক থেকে তাকে মধু সঞ্চয় করতে হয়েছে, কি ভীষণ তার সাধনা!

সেইদিন থেকে পাঁক আর করে না অভিযোগ।

বস্ত্রহরণ

শ্রীগৌতম সেন

(১)

শহর থেকে যাত্রার দল এলো বাবুদের বাড়ি পালা গাইতে। পালা হবে বস্ত্রহরণ।

বড় বড় ঝাড়-লণ্ঠন অনেকদিনের ধূলো ঝেড়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে। বৃহৎ নাট-মন্দির আবার অনেকদিন পর আলোয় ঝলমল কোরে উঠবে এই আনন্দে ছেলে-বুড়ো কারুর চোখে ঘুম নাই।

অনাদি ভট্চায বলে, দলটা খুব ভালই হবে কি বলো? পোষাকের বাক্সই তো দেখলাম পঞ্চাশ-ষাটটা। লোকগুলোকেও দেখে শিক্ষিত মনে হোলো। কোলকাতার দল তা হবে বই কি। তাই ব'লে সেবারের দলটাও কিছু মন্দ ছিলো না,—কি বলো?

সতীশরায়ের কথাটা সইলো না। কারণ সে-ই আনিয়েছে এবারের এই নতুন দলটি। বল্লে, কার সঙ্গে কার তুলনা করো হে! দেখবে এক-একখানা সাজ···আসল পান্না-চুনীর কাজ! এক-একজনের চেহারা দেখবে, ঘি-দুধ-খাওয়া চেহারা!

স্পষ্টিধর কিন্তু গতবারের 'চিত্রাঙ্গদাকে' ভুলতে পারেনি।—একখানা চেহারা বটে! বলে, অমনটি আর দেখবো না। টানা-টানা চোখ, যেমন রং তেমনি গড়ন আবার তেমনি মিষ্টি-হাসি। বুকটা কেমন কোরে ওঠে!

সতীশরায় উল্লসিত হোয়ে বলে, তোমার সেবারের 'চিত্রাঙ্গদা' যে এবার এ-দলে 'দ্রৌপদী' সাজছে।

সৃষ্টিধর লাফিয়ে ওঠে : বলো কি হে! বাছাই তো মন্দ করো নি তাহলে!

তবে আর বলছি কি। আরো দেখবে, দুঃশাসন যে সাজবে—সে হোলো একজন বি, এ,—গ্রাজুয়েট।

বটে! সৃষ্টিধরের চোখ কপালে উঠেছে।

অনাদি ভট্চায আর থাকতে পারলে না। বললে, যাই বলো, গ্রাজুয়েট হোয়ে দুঃশাসন সাজাটা কেমন যেন—

খুড়োর যেমন কথা! সতীশরায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে। একজনকে সাজতে তো হবে হে! তা ছাড়া অমন 'মোসন' দিয়ে কে আর পার্ট করবে? পার্টটা তো আর যে-সে পার্ট নয়।

তাই ব'লে তিনি শিক্ষিত লোক হোয়ে ভদ্রঘরের বধূর অঙ্গ থেকে—নাঃ, কাজটা ভালো হোলো না। আরে, কাপড় ধ'রে টানা-টানি করে কারা? সে কি ওঁদের মত লোকের করা সাজে—না, করা উচিত! কি বলো হে? ব'লে অনাদি ভট্চায সৃষ্টিধরের মুখের দিকে চাইলে।

সতীশ রায়ও এ-কথাটা না ভেবেছে তা নয়; কিন্তু এর মীমাংসায় পৌঁছুতে পারেনি। এবার ইচ্ছা আছে, কথাটা একদিন ঐ গ্রাজুয়েট-দুঃশাসনকেই জিজ্ঞাসা করবে।

সন্ধ্যা না হোতেই ভিড় জমতে সুরু হোলো। দূরান্তের কল-কোলাহল যেন ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

নাট-মন্দিরের পাশেই যাত্রাদলের সাজঘর। গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা সবাই একবার কোরে উঁকি দিয়ে যায়।—এ তাদের কাছে বিস্ময়! কারণ ঐ মানুষগুলোই একটু পরে সাজ বদ্‌লে কেউ হবে ভীষ্ম, কেউ বা দুঃশাসন!

একটা মোটা লোককে দেখে কেউ কেউ অনুমান কোরে নিলে, আজকের পালায় ঐ ব্যক্তিই হবে ভীম।

দেখতে দেখতে বড় বড় সাজের-বাক্স, চুলের-বাক্স খোলা হোয়ে গেলো। চুলগুলো ব্রাস কোরে একটি একটি কোরে তারা দড়ির আলনায় ঝুলিয়ে দিচ্ছে। জমকালো ভেলভেটের সাজে সাজ-ঘরের আর-একদিক ঝলমলিয়ে উঠলো।

ছেলের দল হৈ হৈ কোরে আসরে যে যার জায়গা কোরে নিয়ে ব'সে পড়লো।

কিন্তু কোথায় কি! ব'সে ব'সে তারা অধৈর্য হোয়ে উঠে। খবর এলো জমিদারবাবু খেয়ে না এলে পালা সুরু হবে না। ছেলেরা আবার একবার সাজঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

একটা মেয়ে—মানে, সাজা-মেয়ে হাঁটু অবধি কাপড় তুলে বিড়ি টানছে দেখে মন্টুর গা ঘিন্ ঘিন্ কোরে উঠলো। বললে—চল্ চল্, এ দেখলে দ্রৌপদীর ওপর আর ভক্তি থাকবে না।

তার একটু পরেই আসরে হারমনিয়মের বাক্স বেহালার বাক্স গিয়ে পড়তেই অমন যে গোলমাল এক মুহূর্তে স্তব্ধ হোয়ে গেলো।

পালা সুরু হোলো রাত ন'টায়।

অমন যে বৃহৎ নাট-মণ্ডপ তিল ধারণের জায়গা নেই। গ্রামান্তর থেকে ভিড় করে সবাই ছুটে এসেছে। বসবার জায়গা হবে কি হবে না এ প্রশ্নও কারুর মনে ওঠেনি: যেমন হোয়েছে পুরুষের ভিড়, তেমনি মেয়েদের।

জমিদার হৃদয়নারায়ণ প্রবীণ। লোকটা পাজী নয়, তবে ধর্মের ভাণ আছে। একেলে-শিক্ষা বিশেষ নাই,—কুশিক্ষাও কিছু কিছু আছে। দান আছে কিন্তু নিগ্রহ তার চাইতেও বেশী। ব্যবহারিক জীবনে বিনয়ের অভাব নাই কিন্তু ধন-দম্ভ ষোল আনা। তিনি

জমিদার—এ কথাটা ভুলতে চান না, অপরকেও ভুলতে দেন না। গ্রামের সবাই ভয় করে আবার সুযোগ পেলে অনিষ্ট করবার চেষ্টাও করে।

কৃপণ,—খরচ করতে হোলে দশবার ভেবে খরচ করেন। ঝুলনোৎসবের এই বাৎসরিক ব্যয় পুরুষানুক্রমে প্রজারাই বহন করে আসছে। এর জন্য জমিদারবাবুর স্বতন্ত্র কোনো ব্যয় নাই। তবু লোকে এর মালিকানি-মর্যাদা জমিদার বাবুকেই দিয়ে থাকে।

আসরের পুরোভাগে জমিদারবাবুর পৃথক আসন: জাজিমের উপর জরির কাজ, ভেলভেটের তাকিয়া, তারই আশে-পাশে আতর-দান, গোলাপ-পাশ, পানের ডিবা। নিমন্ত্রিত যাঁরা এসেছেন তাঁদের স্থান জমিদারবাবুর পাশেই। দোতলার বারান্দায় চিক ফেলে মেয়েদের জায়গা করা হোয়েছে।

কুরুসভা।—সভার মত সভা। আলোয় চারদিক ঝক্‌মক্ করছে।

পাণ্ডবের প্রতি অত্যাচারে প্রজারা উঠেছে ক্ষেপে। তাই শুনে হৃদয়নারায়ণ বললেন, ওদের হৈ চৈ করা স্বভাব—ঘাড় ধ'রে বের কোরে না দিলে ওরা শান্ত হবে না।

পাশা-খেলায় যুধিষ্ঠির হেরে গিয়ে সর্বস্ব হারালেন। পাণ্ডবের বধূ দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করতে ওরা সভায় টেনে নিয়ে এলো।

হৃদয়নারায়ণের মধ্যে জমিদার তখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মনে প'ড়ে গেলো, তিনিও একদিন এমনি একটা বিচার করেছিলেন। নিতাই মালি খেতে না পেয়ে তার বৌটাকে বিক্রি করেছিলো মধু সাহাকে। বৌটা যেতে চায় না, তাই মধু জোর কোরে ধ'রে এনেছিলো জমিদারের কাছারিতে। এ দোষ কার? মধু সাহার, না নিতাই মালির? কাপুরুষের হাতে বধূর লাঞ্ছনা……

হৃদয়নারায়ণ দুর্যোধনকে একবার ভালো কোরে চেয়ে দেখেন, তারপর নিজেই নিজের মীমাংসায় আসেন,—এ দোষ দুর্যোধনের নয়, দোষ ঐ যুধিষ্ঠিরের।

দুর্যোধন হুকুম দেয় দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করবার। দুঃশাসন এগিয়ে আসে। লাঞ্ছিত যাজ্ঞসেনী 'জনার্দন, জনার্দন' ব'লে কেঁদে ওঠে···

জমিদার হোলেও হৃদয়নারায়ণ মানুষ: চঞ্চল হোলেন। বললেন, এতবড় বে-আইনী আমার বাড়িতে হোতে দেবো না।

খবর পেয়ে অধিকারী ছুটে এলো। বললে, তা কি কোরে হয় হুজুর!

জমিদার গর্জে উঠলেন, হবে না মানে?

তারপর দুজন পাইককে হুকুম করলেন, ঐ দুঃশাসনকে বেঁধে নিয়ে এসো।

দুঃশাসন বুদ্ধিমান। সবিনয়ে জানালে, রাজা দুর্যোধনের আদেশে সে এ-কাজ করেছে: শাস্তি দিতে হোলে রাজাকেই দেওয়া উচিত।

ঠিক কথা। ছাড়া পেয়ে দুঃশাসন পালিয়ে বাঁচালো।

পালা সেই খানেই শেষ হোলো।

(২)

আরো দশবছর পরের কথা।

জমিদার হৃদয়নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র শোভনলাল এম, এ পাস কোরে বাড়ি এসে বসেছেন। জমিদার এখনো বেঁচে আছেন কিন্তু জমিদারীর আর সে-সৌষ্ঠব নাই। কালের শাসনে তার অনেকখানি বর্ণশ্রী ঘুচে গিয়েছে। শোভনলাল এখন নিজেই দেখা-শোনা করেন,—হৃদয়নারায়ণের বয়েস হোয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাতেই শোভনলাল অনেকগুলো কোম্পানীর কাগজ কিনে ভবিষ্যৎ সুখ-সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছেন।

তারপরেই সুরু হোলো তেরশ' পঞ্চাশের প্রবল বন্যা···দুর্ভিক্ষ মহামারী···

মহাকালের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় জমিদারীর আরো অনেকখানি ধ্বসে যায়। যুদ্ধের খবরও ভালো নয়···

চাল নাই, কাপড় নাই, কেরোসিন নাই···চতুর্দিকে 'নাই নাই' রব। সবাই এসে জমিদার-বাড়িতে হাত পাতে। কিন্তু জমিদার একা কি করবে? সারা-বাংলা আজ ভিক্ষুক,—নগ্ন!

কোন্ মহাজন একটিন কেরোসিন বিলি করবে তাই অনাদি ভট্চায চলেছে একটা বোতল হাতে কোরে। কাতারে-কাতারে লোক দাঁড়িয়েছে লাইন দিয়ে।

চাল নাই,—চল্লিশ টাকা দর দিয়েও লোকে চাল পাচ্ছে না। তারপরেই সুরু হয় চালের লাইন···জনপিছু এক সের কোরে চাল পায়।

গ্রামে গ্রামে বসে 'ফুড কমিটি।' মাতব্বর যাঁরা তাঁরা এগিয়ে আসেন,—বিলির ব্যবস্থা তাঁরাই করেন।

বস্ত্র-রেশন তখনো হয়নি সুরু! দুঃখে কষ্টে শতছিন্ন মলিন বসন কোনরকমে লজ্জা নিবারণ করছিলো—আর বুঝি তাও থাকে না!

শ্যামাচরণের মা মরে গেলো। শব-আচ্ছাদনের কাপড় নাই। এ-গাঁ সে-গাঁ কোরেও কোথাও একটুকরো কাপড় সংগ্রহ হোলো না, শেষে শ্যামাচরণ জমিদার বাবুর কাছারিবাড়িতে হাতযোড় কোরে এসে দাঁড়ালো। শোভনলাল তাঁর নিজের ধুতি-কাপড় একখানা দান করলেন।

শোভনলাল তাঁর গ্রামের হোয়ে সরকারকে আবেদন জানান। কিন্তু সরকার এ-বিষয়ে নীরব। যাদের পয়সা আছে তারা শহর থেকে

বেশী দাম দিয়ে মহাজনদের ঘর থেকে কাপড় নিয়ে আ[illegible] আর যাদের পয়সা নেই তারা ছেঁড়া-নেকড়া প'রে কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করছে। সবচেয়ে মুস্কিল হোয়েছে মেয়েদের,—তাদের সর্বাঙ্গ আচ্ছাদনের উপযুক্ত নেকড়া জোটে না ব'লে কেউ কেউ ঘরের বার হয় না। কিন্তু এইভাবেই বা কদিন চলে!

সৃষ্টিধরের বিধবা মেয়ে, আজ তিনদিন ঘরের খিল খোলেনি।—একটুক্‌রো নেকড়াও তার পরণে নাই!

সাধারণে বিলি করবার জন্যে সরকার নাকি ইতিমধ্যে কাপড় পাঠিয়েছেন।—সবাই মুখ চাওয়া-চায়ি করে, কিন্তু কোন্‌ো কিনারাই হয় না।

খবর এলো, পাশের গাঁয়ের ভবানীচরণের বৌ লজ্জায় গলায় দড়ি দিয়েছে।

সরকার আরো কাপড় পাঠালেন। এবারে বিলির ব্যবস্থা শোভনলাল নিজে নিলেন। কিন্তু এ-কাপড়ও কেউ চোখে দেখলে না।

কাপড় আনতে হোলে কাছারি-বাড়িতে দরবার করতে হয়; পাঁচবার হাঁটাহাঁটির পর কেউ পায় ধমক, কেউ বা পায় সামান্য কয়েক গজ কাপড়। অত বড় গাঁয়ের অভাব কি মাত্র ঐ কয়েক গজ কাপড়ে মেটে? কিন্তু কে শোনে সে কথা!

সতীশ রায়ের ছেলে ছুটে এলো জমিদার-বাড়ি। বললে, হুজুর, আমার যে দু-একখানা শাড়ি না দিলেই চলে না।

শোভনলাল ধমক দিলেন।

গাঁয়ের লোক ভয়ে কিছু বলতে পারে না। অতবড় জমিদারের বিরুদ্ধে বলতে গেলে বিপদই বাড়বে, সুরাহা কিছু হবে না।

ভালো শহরের মেয়ে, লেখাপড়াও কিছু জানে,—অনাদি ভট্চাযের পুত্রবধূ সে। স্বামীকে সেদিন বলে, তোমাদের জমিদার বাবুটি তো বেশ রসিক দেখছি—গাঁ-শুদ্ধ মেয়েদের নগ্ন কোরে তিনি এক নতুন আমোদে মেতেছেন। লোকটির বয়স কত গো?

সুধাংশু হাসে।

তুমি হাসছো কি গো! নইলে এও কি কেউ কখনো পারে! মহাভারতের যুগে পেরেছিলো এক দুঃশাসন—তার শাস্তিও বড় কম হয়নি। কিন্তু আজ সে ভীমও নেই সে-সাহসও কারো নেই।

সুধাংশু বলে, শুধু ভীমের কথাটাই তোমার মনে হোলো, জনার্দনের কথাটাও একবার ভাবো। আজ সহস্র চিৎকারেও জনার্দন দেয়না সাড়া! নইলে ভবানীচরণের বৌটা গলায় দড়ি দেয়!

মণিমালার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে! বলে, আমি যে তোমাদের গাঁয়ের বৌ, নইলে একবার দেখতাম।

কি দেখতে শুনি? সুধাংশু হেসে বলে।

তোমাদের জমিদারের সখটি ভালো কোরে মিটিয়ে দিয়ে আসতাম।

দুপুর-রোদে অনাদি ভট্চায ফিরে এলো। ডাকলে, বৌমা!

মণিমালা কাছে আসতে বুড়ো ভট্চায একজোড়া শাড়ি হাতে দিয়ে বলে, অনেককষ্টে আদায় করেছি মা,—দিতে কি চায়!

নির্বাণোন্মুখ-অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়লো। বললে, এ-কাপড় তো আমি নেবো না বাবা!

অনাদি ভট্চায বিস্ময়ে হতবাক্ হোয়ে গেলো!

সুধাংশু ব্যাপার দেখে পা টিপে স'রে পড়লো।

কথা মণিমালাই বললে, গাঁয়ের অনেকেই কাপড় পেলে না, লজ্জায় অনেকেই গলায় দড়ি দিচ্ছে—আরও হয়তো অনেককে দিতে

হবে, আমিও তো তাদেরই একজন বাবা! মরি তো সবাই মরবো।

এ কার ওপরে রাগ করছো মা! পাবে, সবাই এমনি কোরেই পাবে—

কেউ পাবে না বাবা। জমিদারের হাতে যতদিন বিলির ব্যবস্থা থাকবে, ততদিন এমনি অনেক বৌ-ঝিকে জীবন দিয়ে ইজ্জত রাখতে হবে।

গাঁয়ের লোক জমিদারকেই দোষ দিচ্ছে বটে। কিন্তু সে-ই বা কি করতে পারে মা! কাপড় যা আসে, তাতে সব লোকের চাহিদা মিটতে পারে না।

আপনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন, এ তাদের বানানো কথা। কাপড় কেউ-ই পাচ্ছে না, সব চ'লে যাচ্ছে জমিদারের অন্দর-মহলে।

কি সর্বনাশ! এতবড় আলোচনা তারই বাড়িতে! অনাদি ভট্চায শিউরে ওঠে। পুত্রকে ডেকে বলে, বৌমাকে এ-শিক্ষা দিলে কে?

সুধাংশু বলে গেলো, আর যেই দিক, সে দেয়নি।

ও-দিকে কাছারি-বাড়িতেও গোলমাল সুরু হোয়েছে। অনেকবার দরবার কোরেও বিপিন ঘোষ তার স্ত্রীর জন্যে একখানা কাপড় সংগ্রহ করতে পারেনি। প্রতিবারেই শোভনলাল আশ্বাস দিয়ে আসছেন, এবার তোমার ব্যবস্থা করবোই। কিন্তু এবারেও তাকে ফিরতে হচ্ছে,—এই নিয়ে গোলমাল।

বিপিন ঘোষ জাত-গয়লা। বললে, হজুর তা তো শুনবো না,—এবার কাপড় আপনাকে দিতেই হবে।

শোভনলাল ধমক দিলেন।

বিপিন ঘোষও রুখে আসে : কাপড় না নিয়ে এবার ফিরবো না হুজুর! বৌটা আজ তুদিন ঘরে খিল দিয়ে প'ড়ে আছে—একটুক্‌রো নেকড়াও নেই তার পরণে। ইজ্জৎ কি শুধু তোমাদের মেয়েছেলেরই আছে হুজুর,—আমাদের নেই ?

শোভনলাল গর্জে উঠলেন : বের কোরে দাও রাস্কেলটাকে। চোখ রাঙিয়ে কাপড় আদায় করবে ভেবেছো !

চোখ আমাদের আর কোথায় হুজুর,—চোখ বুজেই আছি।

পাইকরা ছুটে এলো লাঠি নিয়ে। ভিড় সরাতে হবে, জমিদারের হুকুম।

বিপিনও গলা চড়িয়ে দিলে : কাপড় না নিয়ে যাবো না। অনেক কাপড় তোমার অন্দরে,—এবার টেনে বার করবো !

জমিদারের মুখের ওপর এতবড় কথা! শোভনলাল ছুতো ছুঁড়লেন। যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা!

লাঠি-কাঠ গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। জাত-গরুলার তপ্ত-রক্ত পিঠ ফেটে খানিকটা বেরিয়ে গেলো।

সবাই পরামর্শ দিলে নালিশ করতে। কিন্তু অতবড় জমিদারের বিরুদ্ধে নালিশ! শুনলেও গা কাঁপে!

গা মণিমালারও কাঁপলো। অনেকরাত্রি পর্যন্ত সে ঘুমুতে পারলো না। বলে, দেশে কি তোমাদের মানুষ নাই ?—সবাই কি ভেড়া ?

সুধাংশু চোখ বুজে পড়েছিলো,—কথাটা তার গায়েও বিঁধলো। বললে, গালাগালটা আমাকেও দেওয়া হলো যে।

গালাগালের কথা হচ্ছে না,—ঐ একটা লোক গাঁয়ের মধ্যে যা-ইচ্ছে কোরে যাবে ?

বাধা দেবার শক্তি না থাকলে করবে বই কি।

মণিমালা চুপ কোরে যায়। অনেকক্ষণ……

অনেকক্ষণ পরে সে বলে, একটা কথা বলবো ?

সুধাংশুর চোখ জড়িয়ে আসছিলো, বললে, বলো।

আমি একখানা চিঠি দেবো জমিদারের নামে,—নিয়ে যাবে ?

সুধাংশুর তন্দ্রাভাব কেটে গেলো।

আমি এই কথাই লিখবো,—'লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর উষ্ণ-নিশ্বাসে একদিন কুরুবংশ ধ্বংশ হোয়েছিলো,—শিক্ষিত ভদ্রসন্তান আপনি, সমগ্র নারীজাতির পক্ষথেকে আপনাকে এই দুঃশাসনের-বৃত্তি পরিত্যাগ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

সর্বনাশ! শেষপর্যন্ত না ওরা আমার দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ কোরে টেনে নিয়ে যায় ব'লে সুধাংশু হাসে।

মণিমালাও হাসে। বলে, তাহোলে তো বাঁচবে তুমি।

আচ্ছা, সে যা হয় পরে হবে,—এখন তো ঘুমোও।

* * * *

চিঠি পেয়ে শোভনলাল নিজেই এলেন। বললেন, কোথায় আমার দোষ, বলতে হবে। এই গাঁয়ে সাত-শো লোকের বাস। কাপড় যা আসে তাতে ত্রিশ জনকেও পুরো একখানা জোড়ে দেওয়া যায় না। বাইরে থেকে গাল দেওয়া সহজ,—দেবেন বই কি। আর আমার কথা ? একদিন আমার বাড়িতে আসুন—দেখবেন, একটি টুকরোও সেখানে পাবেন না। আমাদের নিজের কাপড় 'ব্লাক-মার্কেট' থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তবু যদি বলেন, কোন্ লোভে এই দায়িত্ব নিয়ে ব'সে আছি। লোভ নয়, লাভ—সেটা অপরের। আজ যদি আমি এ-দায়িত্ব ছেড়ে দি, তাহোলে দেখবেন,—আমার ব্যবস্থায় তবু কষ্ট পাচ্ছে, তখন আর তাও পাবে না।—আপনি আসুন,—আপনি নিন এই ভার। তবেই বুঝতে পারবেন, আমার কথা কতটা সত্য।—নেবেন ভার ?

চো

মণিমালা আগ্রহের সঙ্গে বলে, নেবো। কিন্তু—

দাদার বাড়িতে বোন যাবে, এতে কিন্তু তো কিছু নাই।

মণিমালা যায়।

কাপড় আগেও যেমন বিলি হচ্ছিলো এখনো তেমনি হয়। ভুল তারও একদিন ভাঙলো, যেমন ভেঙেছিলো শোভনলালের। এতবড় গ্রামের বস্ত্রসমস্যা এভাবে মিটতে পারে না,—মণিমালাও দেখলে।

তারিণী ভট্চায এবারেও কাপড় পেলে না। স্ত্রীকে এসে বলে, আমার ধীরা আর হোলো না, এবার তুমি ছাখো চেষ্টা কোরে।

মরণ আর কি! সবাই অনাদি ভট্চাযের ছেলের বৌ নয়। ও হারামজাদী মুখ পুড়িয়েছে ব'লে কি গাঁয়ের সবাই পোড়াবে!

তারিণী ভট্চায কানে আঙুল দিলে। সর্বনাশ! অমন কথা মনেও উচ্চারণ করোনা। পাঁচজনের উপকার হবে ব'লে না সে এই ভূতের বেগার খাটছে!

আর কিছু ভনাগত না গো,—আমরা অনেক দেখেছি। এবারে অনাদি ভট্চাযের দরজায় হাতি বাঁধা থাকবে তুমি দেখে নিও।

সাপের ছোবল!—বিষ ছড়ালো।

ষষ্টিতলার নিয়মিত তাসের আড্ডা ভেঙে এখানে-ওখানে জটলা বসে,—ছেলে-বুড়ো সবারই মুখে এক কথা: মণিমালার গা-ভর্তি গয়না, এবার অনাদি খুড়োর দুমহলা উঠবে।

প্রদীপের আলো জেলে অনাদি ভট্চায মহাভারত পড়ছিলো···

কুরুসভায় রজঃস্বলা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা···

ভীষ্ম···দ্রোণ···বিদুর সকলেই হেটমুণ্ডে দাঁড়িয়ে···

রাজ-সিংহাসনে অক্ষম রাজার প্রহসনাভিনয়ে-দক্ষ স্নেহান্ধ পিতা

অন্তঃপুরের মর্যাদারক্ষায় আভিজাত্যাভিমানিনী কুললক্ষ্মীদের সভার অন্তরালে···

তারই মাঝে আসতে হলো স্বয়ং [illegible]কে নারীর লজ্জা নিবারণ করতে!

ভীষ্ম পারলেন না, দ্রোণ পারলেন না, রাজা ধৃতরাষ্ট্র পারলেন না,—

অনাদি ভট্চাযকে বাধা দিয়ে মণিমালা বলে উঠলো, কিন্তু সেই শক্তিশালী অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সেদিন পারতোই বা কে?

বই বন্ধ কোরে রেখে অনাদি ভট্চায বলে, কে পারতো জানো মা! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ কর্ণের চেয়েও যাঁরা দোষী, সেই কৌরব কুল-লক্ষ্মীরা, যারা সেদিন বাতায়ন থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, তারা যদি সেদিন সেইটুকু অন্তরাল ঘুচিয়ে সকলে সভাস্থলে এসে দ্রৌপদীকে আবরণ কোরে দাঁড়াতো, তাহলে শত দুঃশাসন, শত দুর্যোধনেরও সাধ্য ছিল না, দ্রৌপদীর অঙ্গ স্পর্শ করে। দ্রৌপদীর অপমানের আড়ালে আছে [illegible] সেদিনের ভারত-রমণীর সেই নিদারুণ অক্ষমতা...

হঠাৎ বাইরের একটা দমকা হাওয়ায় বাতীটা নিভে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনাদি ভট্চায বলে, তাই আজকের দুঃশাসনদের জব্দ করবার জন্যেই গুজরাটের সেই ছোট্ট মানুষটি ভারতের অন্তঃপুর-চারিণীদেরই ডেকেছেন।

মণিমালা ধীরে উঠে শ্বশুরকে প্রণাম করলো।

কি খেলা

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

গ্রামের একবারে শেষপ্রান্তে অনেককালের পুরোণো জরাজীর্ণ ভাঙ্গা কালীমন্দির। এককালে যথেষ্ট বোলবোলাও ছিল,—আজ সে সবের কিছুই নেই।

কবেকার এক ভূমিকম্পে চূড়োয় ফাট্ ধরেছিল;—আর মেরামত হয় নি। ছোট একটা বটের চারা গজিয়েছিল সেই ফাটলের ফাঁকে। আজ সেটা ডালপালা মেলে বড় হয়ে উঠেছে। তার কচিকচি নরম শেকড়গুলো উঠেছে ঝুনো হয়ে।—তারি চাড়ে ফাটলের ফাঁকে চিড় ধরেছে;—ফাটল গেছে বেড়ে। বালি খসে পড়ছে;—ইটগুলোতে ধরেছে ঘুণ।

চারিদিকে নিবিড় বনজঙ্গল গাঁ করেছে। সুমুখের প্রকাণ্ড দীঘিটা পানা [illegible] কবে তার হাতের-কাজ শেষ করে চলে গেছে,—প্রকৃতি কিন্তু আজও কাজ করে চলেছে সমানে।—কাজের বিরাম নেই তার।

আজ এই ভাঙ্গা-মন্দিরের দিকে চেয়ে মনে হয়, একে কেউ তৈরি করে যায় নি,—মাটি ফুঁড়ে ওযেন আপনা থেকে গজিয়ে উঠেছে,—যেমন করে গজিয়ে উঠেছে চারপাশের ঐ ঘন ঝোপঝাড় আর বনজঙ্গল। বাঁদিকের ঐ বুড়ো বটগাছটা আর রায়েদের ঐ বহুকালের পুরোণো কালীমন্দির যেন একই কারিকরের হাতে গড়া।

কালীমন্দির আজও কোনরকমে টিকে রয়েছে, কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলো যারা, তাদের কেউ আজ আর গ্রামে নেই।

মন্দিরের চূড়োয় ফাট্-ধরবার অনেক আগেই রায়-বংশের কপালে

ফাট্ ধরেছিল। দুই সরিকে বেধেছিলো মামলা,—বড় তরফ্ আর ছোট তরফ্। এককালি উনি দিয়ে বেধেছিল হাঙ্গামা। জমিটার চৌহদ্দি সমানই রয়ে গেল শেষপর্যন্ত, কিন্তু মামলার চৌহদ্দি বাড়তে বাড়তে ক্রমে হাইকোর্টের সীমানায় গিয়ে ঠেকলো। তারপর মামলা যখন শেষ হোলো, তখন দেখা গেল, যে পক্ষ জিতলো আর যে পক্ষ হারলো, দুজনেরই সমান অবস্থা ;—বাড়ী গেছে, জমিদারী গেছে, পুঁজিপাটা সব গেছে। এরপর রায়েদের বড় তরফ আর ছোট তরফ্ গ্রাম ছেড়ে কোথায় যে গা-ঢাকা দিলে তা কেউ জানে না।

রায়েদের সবই গেল, রইলো কেবল কালীমন্দির ;—নেহাত দেবোত্তর সম্পত্তি বলেই টিকে রইলো শেষপর্যন্ত। আর টিকে রইলো বিঘে কয়েক খান-জমি,—সেও দেবোত্তর সম্পত্তি বলেই। যেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যিনি দেবসেবার জন্যে ঐ জমিটুকু তিনিই দেবোত্তর করে গেছলেন। ওরই আয় থেকে দেবালয়ের খরচ চলে আসছে আজও।

প্রথম যিনি কালীমন্দির গড়ে গেছলেন, তাঁর আমলে দেবসেবা নমো-নমো করেই চলতো।—খুব একটা বিরাট কিছু করবার মতলব ছিল না তাঁর। হিসেবী লোক ছিলেন তিনি,—ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করতেন। আড়ম্বরের মোহ ছিল না তাঁর,—না সংসার-যাত্রায়, না ধর্ম্মে কর্ম্মে।

বংশধরেরা হয়ে উঠলো অন্যধরণের। তাঁদের আমলে জমিদারীর আয় বাড়লো না, কিন্তু জমিদারীর চাল গেল বেড়ে,—একবারে হু-হু করে,—বাণের জলের মত।

জমিদার-বাড়ীর চেহারা গেল ফিরে। বাড়ী হয়ে উঠলো প্রাসাদ ; দেউড়ী হয়ে উঠলো সিঙ্-দরজা ; দারোয়ান হয়ে উঠলো সেপাই ; চাকর-বাকর হয়ে উঠলো খান্‌সামা।

ঠিক এই বাড়াবাড়ির মুখেই রায়দের ছোট কালীমন্দির হয়ে

উঠলো বিরাট কালীবাড়ী। এককালে মন্দিরটুকুই ছিল সম্বল, আর সামনের একফালি জমি।

বংশধরদের আমলে দেবায়তন গেল বেড়ে। চারিদিকে উঠলো ইটের পাঁচিল,—মানুষ-ভোর উঁচু। মোটা-গিঁতের প্রকাণ্ড খিলেন-ওয়ালা ফটক খাড়া হলো রাস্তার দিকে। মন্দিরের সামনা-সামনি গড়ে উঠলো নাটমন্দির;—তার গায়েই সানবাঁধানো চওড়া ঘাটের কোলে পেল্লায় এক দীঘি,—নাম হোলো তার কালীসায়র।

ভক্তি যাদের অনেকখানি ছিল, তারা গড়েছিল ছোট কালীমন্দির।—ভক্তি যাদের মোটেই ছিল না, তারা গড়লে বিরাট কালীবাড়ী।—একদিকের অভাব আর এক দিক দিয়ে পূরণ হয়ে গেল।

আড়ম্বরের বহর জমিদারবাড়ীর চৌহদ্দি ছাড়িয়ে দেবায়তন পর্য্যন্ত হয়ত গড়াতো না;—কিন্তু শেষপর্য্যন্ত সত্যিই গড়ালো। এর জন্যে দায়ী চরডাঙ্গার কুণ্ডুরা।

হালের [illegible]—জমিদারী করে নয়, ব্যবসা চালিয়ে,—যার মধ্যে আছে জোয়ার-ভাঁটা; আছে উত্থান-পতন; আছে ফলাফলের অনিশ্চয়তা। দেবতাকে এরা ভক্তি করে না, কিন্তু ভয় করে রীতিমত। ভক্তির কাজ ফুল-বিল্বপত্তোরেও চলে, ভয়ের ক্ষেত্রে চাই আড়ম্বর। পূজোর সরঞ্জাম সামান্য হলেও এসে-যায় না;—ঘুষের সরঞ্জাম সাড়ম্বর হওয়া চাই।

কুণ্ডুদের কালীবাড়ী তাই যেদিন খাড়া হয়ে উঠলো, সেদিন তার দিকে চেয়ে সকলকেই বলতে হোলো—হ্যাঁ—কালীবাড়ী বটে!

রায়েদের বনেদিয়ানায় লাগলো ঘা। আঘাতটা ঠিক মোক্ষম জায়গাতেই পড়েছিল;—কাজেই প্রতিঘাতের পালা সুরু হতে দেরি হোলো না। তারি ফলে দেখতে দেখতে রায়েদের ছোট কালীমন্দির বিরাট কালীবাড়ীর আকার ধারণ করলে।

এ-সব আজকের ইতিহাস নয়—বহুকালের কথা। আজ সে-সব কথা সবাই ভুলে গেছে। রায়েরাই নেই, তাদের আবার ইতিহাস। বর্ত্তমানই নেই যার, তার আবার অতীত কাহিনী। কালীমন্দির গড়েছিলেন যিনি, তাকেও মানুষ ভুলে গেছে, কালীবাড়ী গড়েছিলেন যিনি, তার কথাও মানুষের মন থেকে গেছে মুছে।

রায়েদের কালীবাড়ী আর নেই, আছে কেবল কালীমন্দিরটুকু;—তাও যেন যাই-যাই করছে। নাটমন্দির ভেঙ্গে পড়েছে বহুকাল হলো। চারিদিকের ইটের পাঁচিলের কোন পাত্তাই নেই। কালীসায়র কচুরি-পানায় গেছে ভরে। চারিদিকে গজিয়েছে নিবিড় জঙ্গল আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়।

লোকনাথ ভট্টচায্যি প্রতিদিন দুবেলা পুজো করে যায়। পুরুষানুক্রমে এরা রায়েদের কালীমন্দিরে পূজারীগিরি করে এসেছে।—আজও তার জের চলেছে। মান্ধাতার আমলের সেই ধানজমিটুকুই আজ সম্বল। তাথেকে নিত্যসেবার কাজ চলে যায় কোনরকমে, নিতান্ত নমো-নমো করে;—তার বেশী নয়।

লোকনাথের প্রপিতামহ আশুনাথের আমল থেকেই মন্দির আর দেবোত্তর ধানজমিটুকুর তদারক করে এসেছে ঐ ভট্টচায্যি পরিবার। আজও তারি জের টেনে চলেছে লোকনাথ। রায়েরা নেই, কিন্তু ভট্টচায্যি বংশের লোকনাথ রয়েছে।—তাই মন্দিরের নিত্য সেবার ব্যাঘাত ঘটেনি কোনদিন।

খ্যাপাটে ধরণের মানুষটা। বয়েস হয়েছে চল্লিশের কাছাকাছি; স্বভাবটা কিন্তু কুড়ি বছর আগেও যা ছিল আজও তাই আছে,—অদল-বদল হয় নি একটুও।

লম্বা ছিপছিপে গড়ন। মুখটা এখনও কেমন যেন কচি-কচি

প্রথমেই চোখে পড়ে বড়-বড় ভাসা ভাসা দুটো চোখ,—চঞ্চল অথচ কেমন যেন শ্রান্ত।

সংসারে থাকবার মধ্যে আছে এক বুড়ী পিসীমা ;—নিঃসন্তান বিধবা মানুষ। কুড়ি বছর আগে লোকনাথের বিয়ে হয়েছিল।—পিসীই বিয়ে দিয়েছিলেন। বুড়ী মানুষ ;—চোখ বুজলেই হলো। যাবার আগে ভাইপোকে সংসারী করে যাবেন ;—বাপ-মা-মরা ভাইপো।

কপালে সইলো না।—বছর না ফিরতেই বৌটি গেল মারা ;—সোণার পিত্তিমে বৌটি!

লোকনাথ আর বিয়ে করেনি।—দিব্যি আছে সে।—কোনদিকে কোন ঝামেলা নেই। মন্দিরের সেবায়েত হিসেবে রায়েদের দেওয়া ব্রহ্মোত্তর জমির সত্ব ভোগ করে আসছে তারা পুরুষানুক্রমে। মোটা-ভাত, মোটা-কাপড় চলে যায় তাই থেকে ;—দুটো মানুষ বইতো নয়। শুধু খাও-দাও আর মন্দিরে গিয়ে বোসো। পিসী বলে—হ্যাঁরে সারাদিন মন্দিরে কি করিস বলতো? সে কিছুই বলে না, শুধু হাসে।—[illegible]

সারাদিন মন্দিরে কি যে সে করে তা নিজেই কি সে জানে, যে বলবে? অন্ততঃ অপর কাউকে শোনাবার মত কিছুই করে না সে। হয়ত কোনদিন মাটি-কোপাতে লেগে যায় ;—গাঁদাগাছের চারা লাগাবে। মাটি-কোপানো শেষ হয়, কিন্তু গাঁদাগাছের চারা আর লাগানো হয় না। হয়ত কোনদিন পুকুর থেকে বাল্‌তি বাল্‌তি জল তুলে মন্দিরের কোলের চাতালটাতে ঢালতে থাকে,—ইট বার করা এবড়ো-খেবড়ো চাতাল। কোনদিন বা শুধু চুপচাপ বসে থাকে চাতালটার ওপর।—সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ঝাঁকড়া বটগাছটার ঘনপল্লবের মধ্যে অন্ধকারে বাসা-ফেরা পাখীগুলো কিচমিচ করতে থাকে। মন্দিরের চূড়োর [illegible] ইট কবে খসে পড়ে একটা ছোটখাটো গহ্বরের

সৃষ্টি হয়েছে ; তারি মধ্যে একটা পাঁচা সংসার পেতেছে ;—নিরিবিলি সংসার। সন্ধ্যে হলেই পাঁচাটা বারকতক কোকিয়ে ওঠে ; তারপর পাখা ঝট্-পট করে উড়ে যায় অন্ধকারের মধ্যে ;—ঠিক যেন একটা অশরীরী কালো ছায়া।

নিমাইয়ের-মা এসে বসে মন্দিরের চাতালে।—বলে,—'দুটো ধম্মো কথা শুনতে এলুম বাবাঠাকুর।'

লোকনাথের থ্যাপাটে চোখদুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে।—বলে,—শুনবি, আচ্ছা শোন্ তবে। তারপর মাথামুণ্ডু কি যে বকে যায় তা নিজেই জানে না।

একটা খোঁড়া কুকুর ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এসে চাতালের একপাশে বসে ;—তেঠ্যাঙে জীব। একদিন চারটে ঠ্যাংই ছিল ; কবে রেলের লাইন পার হতে গিয়ে একটা ঠ্যাং কাটা পড়েছে। সারাটা দিন আহারান্বেষণে হেথায়-হোথায় চুঁড়ে বেড়ায়, সন্ধ্যের পর ভাঙ্গা-মন্দিরে এসে জোটে।—রাতটা কাটে এইখানেই।

লোকনাথ ধম্মোকথা বলতে থাকে।—কিছুক্ষণ পর নিমাইয়ের-মা বলে ওঠে—'কেউ কারু নয়—কি বল বাবাঠাকুর ?'

বাবা-ঠাকুর খুব গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়ে।—তারপর হঠাৎ চুপ করে যায়। এসব কথা সে যে ঠিক বুঝে বলে, তা নয়। ধম্মোকথা বলতে গেলে ঐগুলোই বলতে হয়,—তাই বলে।

বলবার সময় কিছুই ভেবে বলেনা বটে, কিন্তু বলে ফেলবার পর মনটা কেমন যেন খাঁ-খাঁ করতে থাকে।

কালীসায়রের জলে চাঁদের ছায়া পড়ে দুলতে থাকে ;—ক্যাকাশে ছায়া। লোকনাথ চুপ করে চেয়ে থাকে। নিমাইয়ের-মা বলে,—'সবই মিথ্যে কি বল ঠাকুর ?'

লোকনাথ চুপ করে থাকে। খোঁড়া-কুকুরটা বারকতক কেঁউ কেঁউ করে ওঠে!—করুণ অসহায় ডাক।

লোকনাথ হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে পড়ে।—আরতির জোগাড় করতে লেগে যায়। নিমাইয়ের-মা আঁচলের খুঁটটি গলায় জড়িয়ে হাতদুটি জোড় করে মন্দিরের সামনে এগিয়ে এসে বসে।

পঞ্চপ্রদীপ কেঁপে কেঁপে মণ্ডলাকারে ঘুরতে থাকে।—প্রতিমার মুখের ওপর বুলিয়ে যায় আলো-ছায়ার বিচিত্র মায়া।

লোকনাথ আরতি করে আর দেখে। কি দেখে জানে না।—তবু দেখে।

প্রতিমার ছায়া পড়ে মন্দিরের দেয়ালে।—পুরোণো ঝরঝরে দেয়াল। বালির কাজ খসে পড়েছে স্থানে-স্থানে। ঐখানে ভাঙ্গা কুলুঙ্গিতে একটা তেলের কুপি জ্বলে সারারাত।—তার ভূষোর ছোপ পড়েছে এবড়ো-খেবড়ো চটাওঠা দেয়ালের গায়ে।

প্রতিমার ছায়া, ভূষোর ছোপ আর বালিখসা দেয়ালের হিজিবিজি বাঁকাচোরা রেখাগুলো পঞ্চপ্রদীপের আলোছায়ায় যেন কেমন-কেমন দেখায়। লোকনাথ আরতি করে আর মাঝে মাঝে সেইদিক পানে তাকায়। কেন তাকায় জানে না।—কি যেন একটা রহস্যের সন্ধান পায় ওখানে;—অজানা রহস্য,—যার কিছুই বোঝেনা সে।

আরতি থেমে যায়। নিমাইয়ের-মা টিপ্ টিপ্ করে মাথা ঠোকে চৌকাঠের ওপর। খোঁড়া কুকুরটা অন্ধকারে আপন মনে গোঙাতে থাকে। লোকনাথ বেরিয়ে আসে মন্দির থেকে। নিমাইয়ের-মা চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ;—তারপর বিড়বিড় করে বকতে সুরু করে আবার।

মন্দিরের কপাট বন্ধ করে লোকনাথ চাতালে এসে বসে।—চেয়ে থাকে দূরের ঘন ঝোপগুলোর দিকে, যেখানে অন্ধকারের আরতি চলেছে জোনাকির পঞ্চপ্রদীপে।

নিমাইয়ের-মা সমানে বকে চলে। কথায় কথায় নিমাইয়ের কথা এসে পড়ে।—বাপমরা নিমাই। কত কষ্টে মানুষ করেছিল তাকে। সাধকরে বিয়ে দিয়েছিল তার।—বাঁটা-বউ নিয়ে সংসার পাতবে নতুন করে।—কপালে সইলো না;—ছেলে গেল পর হয়ে।

বড়মানুষ শ্বশুর;—চাকরী করে দিয়েছে ইছাপুরের কারখানায়। বৌ নিয়ে শ্বশুরের কাছেই থাকে। ঐ একটা মেয়ে শ্বশুরের।—আদুরে মেয়ে।

ন-মাসে-ছ-মাসে বাড়ী আসে নিমাই।—এবেলা আসে ওবেলা চলে যায়,—মস্তবড় কাজের লোক হয়েছে সে।

এসব কথা লোকনাথ বহুবার শুনেছে, তবু শুনে যায়। অন্ধকারে কেউ কারু মুখ দেখতে পায় না।—কথাগুলো অশরীরী হয়ে অন্ধকারে ভাসতে থাকে। লোকনাথ চুপ করে শুনে যায়। মন দিয়ে শোনবার দরকার হয় না,—বহুবার-শোনা পুরোণো কাহিনী।—শুধু কান দিয়ে শুনে যায়। ওর মধ্যে যেন কিসের সুর খুঁজে পায় সে।—অর্থহীন সুর।

দমকা বাতাসে পাশের বাঁশঝাড়গুলোর জীর্ণ পাঁজর ঠেলে একটা চাপা শাঁই-শাঁই শব্দ ওঠে। নিমাইয়ের-মার কাহিনী আর বাঁশঝাড়ের ঐ ফাঁকা শাঁই শাঁই শব্দ যেন একই সুরে বাঁধা।

নিমাইয়ের কথা শেষ করে বুড়ী তার ছেলেবেলাকার গল্প করে।—কতো ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস। ষাটবছরের পুরোণো ধুলোপড়া জীর্ণ যবনিকার একটা প্রান্ত একটু যেন ফাঁক হয়ে যায়।

চারিদিক নিশুতি হয়ে আসে। নিমাইয়ের-মা বাড়ী চলে যায়।—যাবার সময় আর একবার বলে যায়,—'সবই মায়া, কি বল ঠাকুর?'

এমনি করে কত বছর কেটে গেছে। রায়েদের ঠাকুরবাড়ীর কথা সবাই গেছে ভুলে। আজকালকার বৌ-ঝিয়েরা বলে, ভট্‌চায্যিদের পোড়ো-মন্দির।

এই কবছরে পোড়ো-মন্দির আরও পোড়ো হয়ে উঠেছে। চূড়োর কাটলটার শিরা-উপশিরাগুলো আরও বেড়ে গেছে। কালীসায়রের জল কচুরিপানার আড়ালে বেমালুম গা-ঢাকা দিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে জলের তলায় মাছগুলো যখন নড়ে-চড়ে ওঠে, তখন একটা অস্পষ্ট ছল্-ছল্ শব্দ শোনা যায়।—জলের তরল শব্দ।

চারিদিকের বাঁশঝাড় আর ঝোপজঙ্গলগুলো ঘনতর হয়ে উঠেছে। বাইরের জগৎটাকে তারা যেন চারিদিক থেকে আড়াল করে দাঁড়াতে চায়;—চাওয়া-পাওয়ার জগৎ—হাসিকান্নার জগৎ।

ভাঙ্গা কালীমন্দির আর তাকে আশ্রিত তিনটি প্রাণীকে আড়াল করে গড়ে উঠতে চায় একটা আলাদা জগৎ। গোণাগুন্তি তিনটি প্রাণী;—প্রৌঢ় লোকনাথ, বুড়ী নিমাইয়ের-মা আর খোঁড়া কুকুরটা।

* * * * *

তারপর একদিন হঠাৎ সব যায় উল্টে-পাল্টে। রায়েদের বড়-তরফের কে এক বংশধর যুদ্ধের বাজারে কেমন করে কে জানে রাতারাতি লাল হয়ে ওঠে। গ্রামে পড়ে যায় হৈ-চৈ। পুরোণো জমিদার-বাড়ী নতুন হয়ে ওঠে দেখতে দেখতে। গৃহপ্রবেশের আড়ম্বরে গ্রাম হয়ে ওঠে সরগরম।

রায়েদের অজ্ঞাতবাস শেষ হয়েছে।—এইবার কুরুক্ষেত্রের পালা। পুরোণো বনিয়াদি জমিদারী রক্ত।—গরম কেউটেও কাটে না।—আহত বাঘ;—তাজা বাঘের চেয়ে রোখ্ বেশি।

কালীমন্দির দেখতে দেখতে আবার কালীবাড়ী হয়ে ওঠে।—বিরাট কালীবাড়ী। বনজঙ্গল সাফ্ হয়ে যায় দেখতে দেখতে। চারিদিকে

নতুন করে ঠেলে ওঠে ইটের পাঁচিল। নতুন করে নাটমন্দির মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়ায়। পুরোণো ভাঙ্গা-মন্দির ঝক্‌-ঝক্‌ করে ওঠে। লোকজনের ভিড় জমে দুবেলা।—জামাই নেই তার।

লোকনাথ দুবেলা পূজো করে যায় ঘড়ির কলের মতন। মাস গেলে মোটা দক্ষিণের বরাদ্দ হয়েছে—তার পিসীর মন খুসী হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যের সময় আরতি হয় মন্দিরে। আলোয় ফট্‌ফট্‌ করতে থাকে চারিদিক। দেবীর মুখে আর তেমন করে ছায়া পড়ে না। পাশের দেওয়ালটা থেকে ভূষোর ছোপ্‌ অদৃশ্য হয়ে গেছে কবে।—চূণকাম হয়েছে দেয়ালে।—ঝক্‌ঝকে নতুন দেয়াল। আরতি করতে করতে অভ্যাসবশতঃ সেই দিক পানে মাঝে মাঝে তাকায়।—থ্যাপাটে চোখ দুটো কি যেন খুঁজে মরে।—কি যেন ছিল ওখানটায়—কি যেন নেই।

চূড়োর ওপরকার প্যাচার বাসাটা গেছে ভেঙ্গে। সন্ধ্যের সময় তার পাখার ঝটপটানি আর শোনা যায়না। দূরের বাঁশঝাড়গুলো সাফ্‌ হয়ে গেছে।—অন্ধকারের নিরালা মন্দিরে জোনাকির আরতি আর হয় না।

খোঁড়া কুকুরটা মানে মানে সরে পড়েছে। —ছেলেগুলো তাড়া করে, ইট্‌ মারে।

নিমাইয়ের-মা মন্দিরের চাতালে এসে বসে।—ঝক্‌ঝকে নতুন চাতাল। পাড়ার মেয়েরা এসে ভিড় জমায়। লোকের ভিড়ে সে নিজেকে খুঁজে পায় না।—ফ্যাল্‌ ফ্যাল করে তাকায় চারিদিকে।—যেন ভুল করে এসে পড়েছে এখানে।

লোকনাথের ক্লান্ত চোখদুটো চারিদিকে কি যেন হাতড়ে মরে। কি যেন পেয়েছিল, হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছে।

আপনি পড়েছেন কি?

[গল্পভারতীর প্রত্যেক গ্রন্থে, এই বিভাগে এক একখানি বিশিষ্ট বই-এর পরিচয় বা কাহিনী আমরা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করবো। মানুষ বা জীবজন্তু বা দেবতা-উপদেবতাকে নিয়ে কাহিনী রচনা করা সনাতন প্রথা কিন্তু বই-এর গল্প মন্দ কি? তাই গল্প-ভারতীর বিষয়-তালিকার মধ্যে এই নতুন বিষয়টী অন্তর্ভুক্ত করতে কোন দ্বিধা বোধ করি নি। আশা করি রসিক পাঠকবর্গও তা অনুমোদন করবেন]

বইটীর নাম, "The Adventures of a Spy"। লিখেছেন, জগৎ-খ্যাত একজন ইংরেজ-সৈনিক, যিনি পরে সেনাপতি হন, এবং বিশ্ব-ব্যাপ্ত স্কাউট-আন্দোলনের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সেই Sir Robert Baden Powell. এবং তিনি লিখেছেন, তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। একদিন তাঁকে স্পাই-রূপে য়ুরোপ ও আফ্রিকার নানা যুদ্ধক্ষেত্রে ও নানা দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়।

সাধারণত স্পাই কথাটার সঙ্গে একটা বদ-গন্ধ জড়ানো আছে। মানুষের জীব-যাত্রা উপলক্ষে তাকে যত রকম কাজ করতে হয়, তার মধ্যে এই মানুষ-শীকারের কাজটাকে মানুষ মনে মনে একরকম ঘৃণাই

করে। অথচ স্পাই সম্বন্ধে আমাদের সকলের মনে একটা কৌতূহলও আছে। এক একজন বড় স্পাই-এর অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা শুনলে মনে সত্যিই একটা রোমাঞ্চকর বিস্ময় জাগে। আলোচ্য বইটীতে স্যার ব্যাডেন পাওয়েল অবশ্য স্পাই বলতে শুধু তাঁদের বুঝিয়েছেন, যাঁরা সামরিক কাজে সামরিক রহস্য উদ্ধার করবার জন্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে নিযুক্ত হন। সাধারণ ডিটেকটিভদের সঙ্গে তাঁদের যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

স্পাইদের সম্বন্ধে আমাদের এত বেশী কৌতূহল, তার কারণ, এই একটী মাত্র সরকারী বিভাগ, যার কাজ এবং গতিবিধি সম্বন্ধে মাত্র গুটীকয়েক লোক ছাড়া দেশের মধ্যে আর কেউ কিছু জানে না, জানতে পারে না। স্পাইদের কাজের গোড়ার কথাই হলো, গোপনতা, এবং শেষ-কথা হলো, গোপনতা। এবং সে-গোপনতা এমন সুনিয়ন্ত্রিত যে আর একজন স্পাই-ও জানে না তার সহকর্মী কি করছে, অথবা যে স্পাই নিজে কাজ করছে, সে-ও জানে না সে কেন করছে। এই নিবিড় গোপনতার হেতুই সাধারণ লোকের এত বেশী আগ্রহ স্পাইদের গল্প শোনবার জন্যে। এবং স্পাই-রাও খুব ক্বচিৎ কখনো তাদের নিজের কথা বলবার অবকাশ পায়, অবকাশ পেলেও অধিকাংশ সময় তারা যা জানে, তা তারা বলতে পারে না। বল্লে হয়তো, তাদের মৃত্যুদণ্ড হবে। মৃত্যু তাদের সঙ্গে ছায়ার মত ঘোরে ফেরে। বৃত্তি হিসেবে এমন রোমাঞ্চকর বৃত্তি আর দুটী নেই।

সেইজন্য স্যার ব্যাডেন পাওয়ালের এই বইখানা একটু স্বতন্ত্র। যদিও এই বইটীতে তিনি সামরিক বিভাগের স্পাইদের জটীল এবং গোপনীয় কাজের আসল রহস্য বিশেষ ভাবে উদ্ঘাটন করেন নি, তবুও যেটুকু করেছেন, তাতে সাধারণ পাঠকের অনেকখানি কৌতূহল চরিতার্থ হতে পারে।

স্পাইদের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি চমৎকার একটী উপমা দিয়েছেন, স্পাইরা হলো ভূতের মতন। ভূতের কথা আমরা সবাই শুনি, কিন্তু কেউ চাক্ষুষ বড় একটা দেখতে পাই না। তেমনি আমরা শুনি বটে, অমুক স্পাই অমুক কাণ্ডটা করেছে, কিন্তু সাধারণ জীবনে চলতে ফিরতে একটাও জ্যান্ত স্পাই দেখতে পাইনা। অনেক সময় কোন লোককে যদি দেখি, পাগলের মত রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে লোকের মুখের দিকে চেয়ে আছে, তখন হয়ত মনে সন্দেহ জাগে, লোকটা হয়তো স্পাই হতে পারে কিন্তু আসলে লোকটা হয়তো একটা ছিট-গ্রস্ত ব্যক্তি। হয়ত রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে লোক গুণছে, ক'টা লোক উত্তর দিকে যাচ্ছে, ক'টা লোকই বা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। বিশ্বাস হলো না? সত্যি এমনি লোক আমি নিজে দেখেছি। মানুষের বাতিকের কি অন্ত আছে!

সাধারণত ভূতের ভয় যাদের আছে, অধিকাংশ মানুষেরই বা অল্প-বিস্তর আছে, মাঝরাতে যদি হঠাৎ কোন বিচিত্র শব্দ হয়, বা কোন একটা কিছু ঝন্ ঝন্ করে পড়ে যায়, অমনি মনটা একটা অজানা ভয়ে দুলে ওঠে। তেমনি সহজ মানুষ যদি কোন রকমে একটা আভাস্ পেলো যে কাছে-ভিতে স্পাই ঘুরছে, অমনি যেন কি-রকম-একটা ভয় বা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। স্পাইদের সঙ্গে একটা আতঙ্কের, একটা অনির্দ্দিষ্টতার, একটা অপ্রীতির সম্পর্ক যেন মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। এমন কি ঘৃণার।

স্যার পাওয়েল বলছেন, অথচ এক একজন স্পাই-এর জীবনের সাহস এবং ত্যাগ-শক্তির কথা যখন ভাবি, এবং যখন ভাবি যে অতখানি ত্যাগ এবং সাহস পৃথিবীতে কেউ কখনো জানবে না, তার কথা কেউ বলবেও না, তার অন্তে কখনো কোন বাৎসরিক জন্ম বা মৃত্যু উৎসব হবে না, তখন সেই অখ্যাত বীরদের জন্ম সত্যিই মনে দুঃখ হয়।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকাতে তখন স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছে। ক্যানাডাতে বৃটীশ বাহিনীর সেনাপতি তখন জেনারেল স্যার এইচ ক্লিনটন। হাডসন্ নদীর ওপরে ওয়েষ্ট পয়েন্ট শহরে একটা দুর্গ ছিল। সেই দুর্গটা দখল করবার জন্যে স্যার ক্লিনটনের সৈন্যদের সঙ্গে একদল আমেরিকানের যুদ্ধ চলছে। হঠাৎ মাঝামাঝি স্যার ক্লিনটন একটা খবর পেলেন যে দুর্গের আমেরিকান সেনাধ্যক্ষ নাকি আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত আছেন। সে-সম্পর্কে ঠিক ব্যাপার জানবার জন্যে শত্রুর লাইনের মধ্যে একজন বিশ্বাসী লোককে পাঠানো দরকার। সেইসময় মেজর এণ্ড্রি বলে একজন সুইস্ স্যার ক্লিনটনের দেহরক্ষী রূপে কাজ করছিলেন। স্যার ক্লিনটন আসল ব্যাপার জানবার জন্যে এণ্ড্রিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। এণ্ড্রি রাজি হলেন। সাধারণ আমেরিকান নাগরিকদের বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে এণ্ড্রি, জন এণ্ডারসন এই নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় [illegible] ছিল। এণ্ড্রি ধরা পড়লেন। এবং স্পাই বলে তৎক্ষণাৎ কোর্ট মার্শালের বিচারে তাঁর ফাঁসী হয়ে গেল।

ঠিক এ ধরণের লোককে স্পাই বলা ঠিক নয়। কারণ, এণ্ড্রি সত্যি সত্যি শত্রুর কোন গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেন নি বা করতে যান নি। স্যার পাওয়াল বলেন যে, বিশ্বাসঘাতক স্পাইদের কথা বাদ দিয়ে, সাধারণত যুদ্ধের সময় স্পাইকে, যুদ্ধরত সৈনিকের মর্য্যাদাই দেওয়া উচিত। তার কারণ, সাধারণ সৈনিকেরই প্রায়ে কম সাহসের কাজ তাকে করতে হয় না। যুদ্ধের সময় হোক আর শান্তির সময়েই হোক, তাকে সর্ব্বদাই বিপদকে নিয়ে ঘর করতে হয় এবং বিপদ বলে বিপদ···একেবারে যাকে বলে মারাত্মক বিপদ। আর এ-কথা হয়ত অনেকে জানেন না যে, অনেক বড় বড় স্পাই বিনা মাইনেতে

এবং বিনা পারিশ্রমিকে শুধু তাঁর নিজের দেশের কল্যাণের জন্যে, এই ভয়ঙ্কর কাজের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লেফটেনাণ্ট কার্ল লোডী নামে একজন জার্মান স্পাই ইংলণ্ডে ধরা পড়লেন। কোর্ট মার্শালে নিজের ফাঁসীর হুকুম শুনে লোডী তাঁর জবানবন্দীতে বল্লেন, আমি যা করেছি তার জন্যে আপনাদের এতটুকুও করুণা ভিক্ষা করতে চাই না। বলতে চাই না, আপনারা আমাকে দয়া করুন। আর আমি যা করেছি, তার জন্যেও আমি এতটুকু ক্ষুব্ধ বা অনুতপ্ত নই। এই কাজে যারা আমাকে লাগিয়েছে বা সাহায্য করেছে, আমার কাজের ধর্ম্ম অনুযায়ী তার একজনেরও নাম আমি উল্লেখ করবো না। এই কাজের জন্যে কারুর কাছ থেকে আমি একটী পয়সা পাই নি বা নিই নি। আমার দেশকে আমি ভালবাসি বলে আমি এই কাজের ভার নিয়েছিলাম এবং যখন এই কাজের ভার আমি নিয়েছিলাম, তখন আমি জানতাম যে আমি মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করতেই চলেছি। একথাও আমি জানি, ঠিক আমারই মতন, অনেক ইংরেজ আজ এই মুহূর্ত্তে জার্মানীতে জার্মানসৈন্যদের পেছনে, আমি এখানে যা করেছি, তারাও সেখানে তাই করছে।"

লোডীর ফাঁসী হয় বটে কিন্তু পার্লামেণ্টে লোডীর কথা উল্লেখ করে একথাও বলা হয়েছিল, যে "তিনি যে কোন স্বদেশপ্রেমিকের মতনই নিজের দেশের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন—এবং যুদ্ধে যেসব সৈনিক দেশের জন্যে প্রাণ দেয়, তাদের চেয়ে তাঁর গৌরব কোন অংশে কম নয়।"

এইভাবে স্পাইদের সম্পর্কে সাধারণের মনোভাব আলোচনা করার পর, তার পাওয়েল আসল স্পাইদের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, সামরিক বিধান অনুসারে স্পাইদের তিন পর্য্যায়ে ভাগ করা হয়, প্রথম, Strategical and

Diplomatic agent, দ্বিতীয়, Tactical, Military or Naval agent' তৃতীয় হলো Field Spy. সামরিক পরিভাষায় স্পাইদের অনেকসময় এজেণ্ট বলা হয়।

প্রথম পর্য্যায়ের স্পাইদের কাজ হলো, যুদ্ধের আগে, যে-দেশের সঙ্গে তার নিজের দেশের যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা, সেখানে গিয়ে সেই দেশের রাজনৈতিক এবং সামরিক খবরাখবর সব সংগ্রহ করা। এবং নিরাপদে তা নিজের দেশে যথাযোগ্য স্থানে পৌঁছে দেওয়া। এই জাতীয় স্পাইদের দ্বিতীয় কাজ হলো, শত্রুর দেশে গিয়ে, সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে মিশে, জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের এবং রাজনৈতিক হাঙ্গামার এবং সম্ভব হলে বিপ্লবের সৃষ্টি করা। উদাহরণ স্বরূপ স্যার পাওলেট দেখিয়েছেন যেমন, মিশরে গিয়ে মিশরীয়দের নিয়ে রাজদ্রোহ প্রচার করা, ভারতবর্ষে গিয়ে ভারতবর্ষের "নেটীভ"-(!) দের মধ্যে রাজনৈতিক বিপ্লব জাগিয়ে তোলা। উদ্দেশ্য, এই সব দেশে কোন রাজনৈতিক বিপ্লব বা গণ্ডগোল সত্যি সত্যি যদি সৃষ্টি করতে পারা যায়, তাহলে অনেকখানি সৈন্য আসল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে এই সব দেশে রাজনৈতিক হাঙ্গামা দমনের জন্যে আটকা পড়ে থাকবে।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের স্পাইদেরও কাজ যুদ্ধের আগে শান্তির সময়। তারা শত্রুর দেশে গিয়ে সেখানকার জমির নিখুঁত মাপ-জোক তৈরি করে এবং শত্রুর কোথায় কি ভাবে কত অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হচ্ছে বা জমা হচ্ছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তৈরি করা। জমির মাপ-জোক নেবার সময় তাদের কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হয়, যেমন রাস্তা, নতুন সাঁকো কোথায় তাড়াতাড়ি তৈরি করা যেতে পারে, বড় বড় গান্ রাখবার এবং ছোঁড়বার জায়গা ঠিক করে রাখা এবং এমন কি সম্ভব হলে সে-সব জায়গা আগে থাকতে কন্‌ক্রীট

ইত্যাদি দিয়ে মজবুত করে তৈরি করে রাখা, যাতে করে আক্রমণ বিভাগের সৈন্যরা এসেই বিনা বাধায় সেখানে কামান বসাতে পারে। এই পর্য্যায়ের স্পাইদের তৃতীয় কাজ হলো, শত্রুর দেশের সংবাদ-চলাচলের যন্ত্রের এবং ব্যবস্থার একটা যতদূর সম্ভব নিখুঁত বিবরণ সংগ্রহ করা, যাতে করে আক্রমণের সময়ে ঠিক আসল জায়গাগুলিতে ঘা দিয়ে সংবাদ চলাচল অচল করে দিতে পারা যায়।

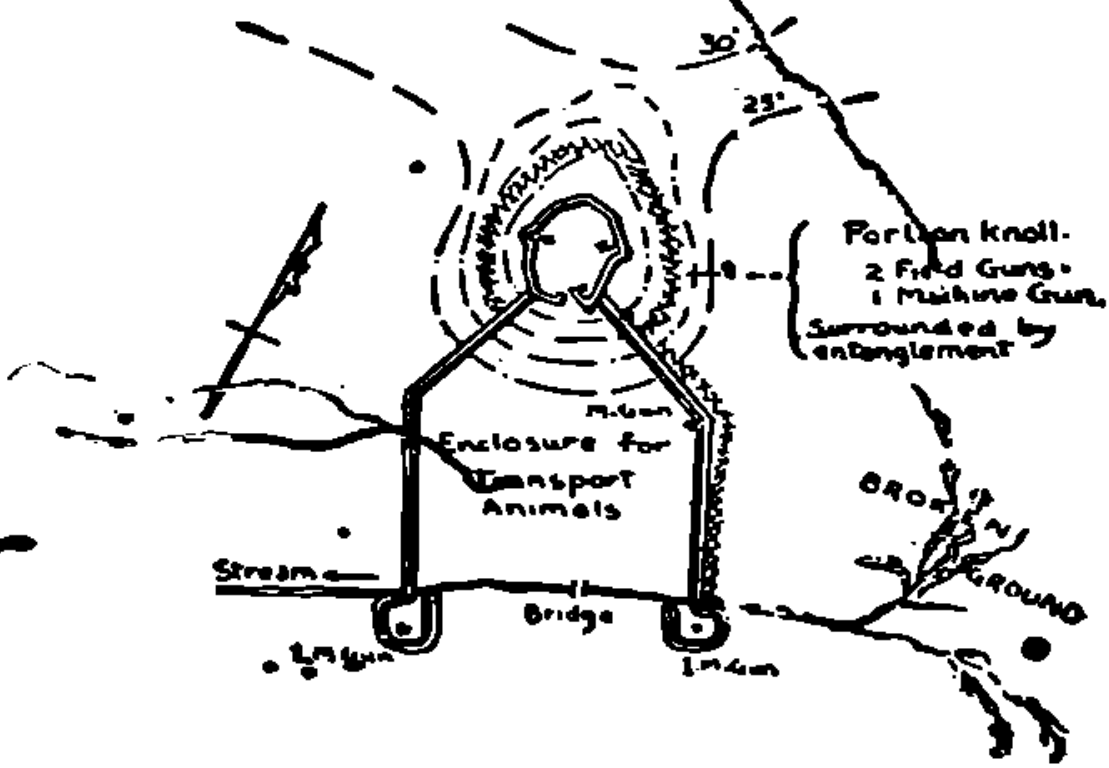

১৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য—ফড়িঙের মাথায় দুর্গের নকল

তৃতীয় পর্য্যায়ের স্পাইদের কাজ হলো আসল যুদ্ধের সময় যুদ্ধ-ক্ষেত্রে, তাই তাদের নাম ফিল্ড্ স্পাই। এদের ছদ্মবেশে আগিয়ে চলে যেতে হয় শত্রুর লাইনের মধ্যে, সেখানে পর্য্যবেক্ষণ করে শত্রু-সংস্থানের খবর আনতে হয় এবং নিজেদের বাহিনী যদি আগিয়ে আক্রমণ করে তাহলে কোন্ পথ দিয়ে যাওয়া সুবিধার হবে, কোন-

খান দিয়ে অতর্কিতে এগিয়ে যেতে পারা যাবে, সেইসব পথ-ঘাটের নির্ভুল সংবাদসংগ্রহ করে আনা।

এই থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে একটা যুদ্ধের ফলাফল কতখানি এই স্পাইদের ওপর নির্ভর করে এবং বর্তমান যুদ্ধ-নীতিতে জার্মাণরাই এই ব্যাপারটীকে বৈজ্ঞানিক কায়দা-কানুনের ভিত্তিতে একটা অতি-প্রয়োজনীয় বিরাট ও স্বতন্ত্র সামরিক বিভাগে পরিণত করে।

প্রথম মহাযুদ্ধ যেদিন ঘোষিত হয়, তার বহু আগে থাকতেই জার্মাণরা ইংলণ্ডকে আক্রমণ করবার সমস্ত আয়োজন খাতায়-পত্রে নিখুঁতভাবে সাজাতে থাকে। সেই যুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে তাঁরা নতুন ধরণের এক রকম ভারী কামান তৈরী করে। সেই জাতের কামানের নাম পরে দেওয়া হয়, ব্ল্যাক মেরিয়া অথবা জ্যাক জন্‌সন্। এই নতুন কামানের বিশেষত্ব হলো যে, কোন কঠিন জায়গায় তাকে দাঁড় করাতে না পারলে, সে-যন্ত্র মাটীতে বসে যাবে। তাই তার রাখবার জায়গা বেশ মজবুত কন্‌ক্রীট দিয়ে গড়তে হতো। জার্মাণ সেনাপতিরা ঠিক করেছিলেন যে, সেই ব্ল্যাক ম্যারিয়া কামান নিয়ে তাঁরা বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের ভেতর দিয়ে ইংলণ্ড যাবেন। কিন্তু আক্রমণের সময় হঠাৎ যেখানে-সেখানে তো এই কামান বসানো চলতে পারে না। সেইজন্যে যুদ্ধের বহু আগে থাকতেই তাঁরা রীতিমত একদল শিক্ষিত স্পাইকে ছদ্মবেশে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে পাঠিয়েছিলেন। এইসব স্পাই নিরীহ ব্যবসাদার রূপে প্রথমে বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে, জায়গা বুঝে বুঝে নতুন সব অফিস তৈরী করে। পাছে কোন রকমে লোকের মনে সন্দেহ জাগে, সেই জন্যে তাঁরা এই সব অফিস-বাড়ী তৈরী করার ফাঁদ পাতেন এবং এইভাবে লোকদের চোখে ধুলো দিতে তাঁরা কৃতকার্য্যও হন। এইসব অফিস-বাড়ীর ভেতরে, সামরিক এঞ্জিনীয়ারদের পরামর্শে কামান রাখবার সব জায়গা মজবুত করে

কনক্রীট দিয়ে গড়ে তোলা হয়। এইভাবে কল, কারখানা, অফিস-বাড়ী, দোকান, হোটেল ইত্যাদির আড়ালে সারা দেশময় জার্মাণরা যুদ্ধের আগে থাকতেই সব ঘাঁটি তৈরী করে রাখে। সেইজন্যে প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়াতে আমরা দেখতে পাই, ফ্রান্স আর বেলজিয়ামের মধ্যে এত দ্রুত জার্মাণবাহিনী এগিয়ে যেতে পেরেছিল। তাদের সেই বৈদ্যুতিক অগ্রগতির পেছনে ছিল বহুদিনের বহু স্পাই-এর অগ্রিম আয়োজন।

এই সব ব্যাপার থেকে, আজ স্পষ্ট বোঝা যায় যে, জার্মাণ-রাজনীতি কতদিন আগে থাকতে মহাযুদ্ধের জন্যে সমস্ত আয়োজন করে রেখেছিল এবং জার্মাণ-জাতির সমস্ত প্রতিভা ছিল এই আয়োজনের পেছনে। জার্মাণ-জাতির বৈজ্ঞানিক প্রতিভা জগৎ-খ্যাত। তাদের জাতি-গত শিক্ষা-রীতি এত সম্পূর্ণ এবং এত সূক্ষ্ম যে, সামান্যতম জিনিসও তার মধ্যে বাদ পড়ে না। বৎসরের পর বৎসর, সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জার্মাণী যুদ্ধের প্রত্যেকটী দিক কাগজে-কলমে এঁকে নিয়ে, তবে যুদ্ধে নামে। সুতরাং যুদ্ধ-ঘটানোর অপরাধ থেকে জার্মাণ-জাতি অব্যাহতি পেতে পারে না।

এই স্পাই-তন্ত্রকে জার্মাণরা তাদের যুদ্ধ-নীতির একরকম মূল-ভিত্তি রূপে গ্রহণ করেছিল এবং অতি নিখুঁতভাবে এই জাল তারা নানান্ দেশে বিস্তার করে। একদল লোক তারজন্যে এক রকম চিরকালের মতন নিজের দেশ ছেড়ে ইংলণ্ডে এসে বসবাস স্থাপন করে। তারা হলো মূল ঘাঁটি। সামরিক পরিভাষায় তাদের বলা হতো, পোষ্ট-বক্স্। অর্থাৎ তাদের মারফৎ সংবাদ যাওয়া-আসা করতো। আর একদল ছিল ভ্রাম্যমাণ, তারা এই সব পোষ্ট-বক্সের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ঘুরে বেড়াতো। বহুদিন ধরে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতভাবে তাদের সংবাদ-চলাচলের কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে চলেছিল, হঠাৎ একদিন একজনের একটি ভুল ঠিকানা লিখার দরুণ এই বিরাট ষড়যন্ত্র ধরা

পড়ে গেল। স্পাইদের কাজে সামান্য একটা ছোট ভুল যে কিরকম মারাত্মক হতে পারে, তা এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়।

ডাঃ কার্ল গ্রেভস্ ছিলেন ইংলণ্ডে এই জার্ম্মাণ পোষ্ট-বক্স্‌দের পরিচালক। তিনি ডাক্তারের ছদ্ম-আবরণে স্পাই-এর কাজ করতেন। ইংলণ্ড থেকে তিনি যে-সব চিঠি জার্ম্মাণীতে পাঠাতেন, সেগুলো সোজা জার্ম্মাণীতে যেতো না। কারণ, জার্ম্মাণীর ঠিকানা থাকলে তো, পথেই ধরা পড়বে। সেসব চিঠি যেতো, বেলজিয়ামে এক হোটেল-ওয়ালার নামে এবং কতক চিঠি যেতো প্যারিসে এক সেলুন-পরিচালকের নামে। তাঁরা সেখান থেকে সে-সব চিঠি আবার জার্ম্মাণীতে পাঠাতেন। পাছে ইংলণ্ডের পোষ্ট-অফিস খাম দেখে কোন সন্দেহ করে, সেই জন্যে গ্রেভস্ ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাসায়নি-কোম্পানী Messrs Burroughs and Wellcome এর খাম গোপনে ছাপিয়ে নেয় এবং সব সময় সেই খামই ব্যবহার করতো। প্রতিদিন ব্যারোজ ওয়েলকামের শত শত খাম বেলজিয়াম্ এবং ফ্রান্সে যাচ্ছে। তার মধ্যে যে জার্ম্মাণ স্পাইদের চিঠি যাচ্ছে, তা সন্দেহ করবার কোন কারণই ছিল না। হঠাৎ একদিন একটা খামের ওপর ঠিকানাটা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুণ পোষ্ট-অফিস থেকে সাধারণ সৌজন্য হিসেবে সেই খামখানি ব্যারোজ ওয়েলকমে ফেরৎ দেওয়া হয়। সেখানে কর্ম্মচারী খামটা খুলে দেখে, জার্ম্মাণ ভাষার সঙ্কেতলিপিতে কি সব লেখা। তৎক্ষণাৎ সে চিঠিখানি কোম্পানীর কর্ত্তার কাছে নিয়ে হাজির করলো। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে খবর চলে গেল। সেদিন থেকে পোষ্ট-অফিসে ব্যারোজ ওয়েলকমের সব খাম খোলা হতে লাগলো এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত ষড়যন্ত্র ধরা পড়লো।

স্পাইদের সর্বদাই আত্মগোপন করে থাকবার চেষ্টায়, এত মানসিক পরিশ্রম করতে হয় যে, তা অবর্ণনীয়। আর সর্বদাই তাঁদের ভোল্ বদলাতে

হয়, কারণ, স্পাইদের এমনি দুর্ভাগ্য যে, তারা যদি শত্রুর হাতে ধরা পড়ে, তাহলে তার দেশ বা গভর্ণমেণ্ট তাকে কোনভাবেই সাহায্য করবেনা এবং স্বীকার পর্য্যন্ত করবে না। এই সর্ত্তেই স্পাইকে কাজে নামতে হয়। এবং সেইসঙ্গে তাকে শপথ গ্রহণ করতে হয় যে, তার সঙ্গে সে কোন কাগজ-পত্র, নোট, ডায়েরী বা ঠিকানা রাখতে পারবে না।

এই আলোচনা থেকে স্যার পাওয়েল স্পাইদের ছদ্মবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সাধারণ থিয়েটারের মেক-আপ থেকে স্পাইদের মেক-আপের একটা প্রধান তফাৎ হচ্ছে যে, থিয়েটারের মেক-আপে সাজ-সজ্জা, পোষাক এবং দাড়ি গোঁফের সাহায্যে মুখের পরিবর্ত্তনটাই প্রধান কিন্তু স্পাইদের মেক-আপে এ-সব দরকার হলেও, আসল দরকার হচ্ছে, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এক মানুষ থেকে আর এক মানুষে নিজেকে বদলে ফেলা। অর্থাৎ যে-সব জিনিষে মানুষের বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে, সেইসব গুলির পরিবর্ত্তন। যেমন কণ্ঠস্বর, কথা বলার ধরণ, চলার ভঙ্গী, এবং নানারকমের দৈহিক মুদ্রা। বিশেষ করে, যারা ভাল স্পাই, তাদের রীতিমত অভ্যাস করে শিখতে হয়, কি করে, নিমেষের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতি বদলে পেছন থেকে নিজের চেহারার আউট-লাইন বদলে ফেলতে পারা যায়। সামনের চেহারায় মুখের পরিবর্ত্তনের চেয়ে পেছনদিক থেকে দেখলে যাতে চেহারার আউট-লাইন বদলে যায়, সেই পরিবর্ত্তনের কায়দাই হলো স্পাইদের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। পেছন থেকে যাকে দেখলে মনে হয়, একজন বলশালী সৈনিক বা একজন বলশালী যুবক, হঠাৎ দেখলুম, সেই লোকটীর চেহারা এমন দুমড়ে গেল যে, মনে হচ্ছে যেন একজন বেঁটে দুর্বল বেতো রুগী চলেছে। অনেক স্পাই এইভাবে চেহারায় আউট-লাইন বদলে ভিড়ের মধ্যে দেখতে দেখতে সরে পড়ে।

য়ুরোপের স্পাইদের পোষাকের পরিবর্ত্তনে দুটী জিনিস খুব বেশী সাহায্য করে; টুপি আর টাই। সাধারণত ও-দেশে মানুষকে টুপি আর টাই-এর রঙে চেনা যায়। তাড়াতাড়ি কোন লোকের বর্ণনা দেবার সময় প্রায়ই বলা হয়, ঐ যে লোকটা ছাই-রঙের ফেল্ট্ হ্যাট পরে আর ডোরা-কাটা নেকটাই গলায় দেখছো···

নিমেষের মধ্যে দেহের আউট-লাইন বদলিয়ে···

সেইজন্যে ও দুটী জিনিস বদলালে অনেক সময় নির্দ্দর্শন-চিহ্নই বদল হয়ে যায়। সেইজন্যে পাকা স্পাইরা সব সময়ে কোটের পকেটে দু'তিন রকমের টাই আর টুপি লুকিয়ে রাখে। পরচুলার দ্বারা অবশ্য মুখের চেহারা বদলানো অতি সাধারণ রীতি কিন্তু স্যার প্যাট্রিক্ওয়েল নতুন স্পাইদের এই সম্পর্কে একটা উপদেশ দিয়েছেন যে, দাড়ি গোঁফ বদলানোর আগে দরকার বদলানো চোখের ভ্রূর গঠন। চোখের ভ্রূর গড়নের বদলানোর সঙ্গে মুখের চেহারা বিশেষ বদলে যায়।

তারপরের অধ্যায়ে স্যার পাওয়েল ফিল্ড্ স্পাইদের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এইসব স্পাইদের গোপন অনুসন্ধানের ফল, যুদ্ধের ফলাফল নির্দ্ধারণে রীতিমত সাহায্য করে থাকে। গত রুশো-জাপান যুদ্ধের সময়, জাপান যে রাশিয়াকে পরাজিত করে পোর্ট আর্থার দখল করে নেয়, তার মূলে জাপানী স্পাইদের কার্য্যতৎপরতা বিশেষ ভাবে দায়ী ছিল। পোর্ট আর্থারের দিকে জাপানী কামানের মুখ ঘুরিয়ে রাখবার বহু আগে থাকতেই, জাপান পোর্ট আর্থারের ভেতরকারের সব প্রয়োজনীয় খবরাখবর সংগ্রহ করে রেখেছিল।

যুদ্ধে স্পাইদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জগৎ-খ্যাত ফ্রেডারিক দি গ্রেট একবার বলেছিলেন, মার্শাল সুবাইস্ যখন যুদ্ধে যান, তখন তিনি সঙ্গে একশো জন রাঁধুনী নেন্, কিন্তু আমি যখন যুদ্ধে যাই, তখন আমার সঙ্গে থাকে, একশো জন স্পাই।

গত প্রথম মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণ ফিল্ড্ স্পাইরা নানাভাবে তাদের অগ্রগামী সৈন্যদের সাহায্য করেছিল। অনেকসময় তারা সাধারণ চাষীর বেশে জনসাধারণের মধ্যে লুকিয়ে থেকে, ল্যাম্পটার্ণের আলোর সঙ্কেতে সৈন্যদের খবরাখবর জানিয়েছে। আলো ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়ে গেলে, তারা ধোঁয়ার সাহায্যে একরকম সাঙ্কেতিক কোড্ ব্যবহার করে। অনেক সময় গ্রামের পাশে চিমনী থেকে যে নিরীহ কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠতো, সেই ধোঁয়া লক্ষ্য করেই জার্ম্মাণ-কামানের গোলা এসে পড়তো, ঠিক জায়গার ওপর। অনেক জায়গায় এমনও দেখা গিয়েছে যে, গাঁয়ের গির্জ্জের বড় ঘড়ির কাঁটাকে পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ ফিল্ড্ স্পাইরা সঙ্কেতের কাজে লাগিয়েছে।

জার্ম্মাণ সৈন্যদের বহু আগে থাকতেই জার্ম্মাণ স্পাইরা শত্রুর দেশে গিয়ে বসবাস স্থাপন করতো। জার্ম্মাণ সৈন্যরা এসে পড়লে

তারা তাদের বাড়ীর দরজায় শাদা খড়ি দিয়ে, নানা সাঙ্কেতিক চিহ্ন লিখে রাখতো। অনেক সময় যাতে লোকে না সন্দেহ করে, তার জন্যে আলিবাবার মজ্জিনার মত, আশ-পাশের কোন কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতেও সেই সব সাঙ্কেতিক দাগ দিয়ে রাখতো। এইভাবে অনেক বাড়ীতে লেখা থাকতো, Not to be destroyed, Good people live here. এখানে Good people মানে জার্ম্মাণ লোক। সে সময় জার্ম্মাণ স্পাইরা এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, একটু বে-কায়দায় কাউকে নড়তে চড়তে দেখলেই ইংলণ্ডের লোকেরা মনে করতো, বুঝিবা জার্ম্মাণ স্পাই হবে! সত্যি সত্যি নানা বিচিত্র অবস্থাতে জার্ম্মাণ স্পাইরা একে একে ধরা পড়তে লাগলো। একজন লোক, রাস্তা তৈরী-করা কুলী, রাস্তার ধারে বসে আপনার মনে পাথর ভাঙ্গছে, কিন্তু তার জামা খুলে দেখা গেল, তার সর্ব্ব-অঙ্গে ইলেক্‌ট্রিক্ তারে জড়ানো···তার পকেটে ফিল্‌ড টেলিফোন, সে পাথর-ভাঙ্গার অবসরে, দূরস্থ তার জার্ম্মাণ বাহিনীর সঙ্গে ফোনে কথা-বলছে। ভোর না হতেই এক জায়গায় দেখা গেল, সমুদ্রের ধারে, মেষ-পালকের দল, এমন ভাবে লণ্ঠন দুলিয়ে তাদের হারিয়ে যাওয়া ভেড়া খুঁজছে যে, নিতান্ত ভেড়া-খোঁজার জন্যে সে-ভাবে লণ্ঠন দোলানোর কোন তাৎপর্য্য হয় না। এসব স্পাই, যে-দেশে আগে থাকতে গিয়ে বসবাস করতো, সেখানকার মানচিত্র তৈরী করে তারা আগে থাকতেই পাঠিয়ে দিতো। এইসব মানচিত্র ছোট ছোট চতুষ্কোণে ভাগ করা থাকতো, এক একটা চতুষ্কোণের সঙ্কেত স্বরূপ এক একটা অক্ষর ব্যবহার করা হতো। যেমন ধরুন, একটা গ্রামের মানচিত্র আঁকা হলো। তার স্কুল বাড়ী যে-চতুষ্কোণের মধ্যে পড়লো, সেটা হলো A···যদি সেই স্কুল বাড়ীতে সৈন্যরা এসে উঠে থাকে, জার্ম্মাণ স্পাইরা আলোর সঙ্কেতে শুধু "A" এই অক্ষরটী জানিয়ে দেয় দূরের জার্ম্মাণ-বাহিনীকে···তার

কিছুক্ষণ পরেই ঠিক দেখা গেল, সেই স্কুল বাড়ীর ওপর দূর থেকে জার্মাণ শেল ভেঙে পড়ছে। এইভাবে গত প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে, জার্মাণ স্পাইরা প্রভূতভাবে তাদের অগ্রগামী সেনাবাহিনীকে সাহায্য করে, যার ফলে, জার্মাণরা এত দ্রুত এগিয়ে আসতে পারে।

এবং এ-কথা আপনারা অনেকেই হয়ত জানেন না যে, জার্মাণ স্পাইদের অনুসন্ধানের ফলেই, জার্মাণী এত তাড়াতাড়ি সে-বার বেলজিয়মের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। বেলজিয়ামকে অত দ্রুত আক্রমণ করার মধ্যে জার্মাণীর মস্ত বড় এক স্বার্থ ছিল। যুদ্ধের অস্ত্রের জন্যে নাইট্রোজেনের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু যুদ্ধের গোড়ার দিকে জার্মানীর নাইট্রোজেন পাওয়ার কোন স্বাভাবিক পন্থা ছিল না। তখন জগতের অধিকাংশ "নাইট্রেট" স্বাভাবিক অবস্থায় আসতো দক্ষিণ আমেরিকার চিলি থেকে। মিত্রশক্তিরা গোড়া থেকেই চিলির সেই নাইট্রেট সমস্ত নিজেদের দখল-ভুক্ত করে নেয়। তাই জার্মাণরা যুদ্ধে নামবার বহু আগে থাকতেই, কি করে এই নাইট্রেট-সমস্যা দূর করা যায়, তার জন্যে তার বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের গবেষণায় লাগিয়েছিল। অবশ্য পরে বিখ্যাত জার্মাণ বৈজ্ঞানিক হেবার্ জার্মাণ জাতির এই অভাব রাসায়নিক উপায়ে দূর করে দেন, কিন্তু ১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে বেলজিয়ামে অবস্থিত জার্মান স্পাইরা খবর পেলো

এ্যান্ট্ওয়ার্প শহরে বেলজিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট, ৫০হাজার টন নাইট্রেট সঞ্চয় করে রেখেছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই, জার্মাণ হাই কমাণ্ড ঠিক করলো যে, যেমন করেই হোক্ এ্যান্ট্ওয়ার্পের সেই চিলিয়ান্ নাইট্রেটের ভাণ্ডার তাড়াতাড়ি দখল করতেই হবে। সেই জন্যেই প্রথম যুদ্ধের সময় জার্মাণরা অত তাড়াতাড়িতাদের সব শক্তি সংহত করে এ্যান্ট্ওয়ার্পের ওপর গিয়ে পড়ে।

আলোচ্য বইটীতে স্যার পাওয়েল একদল জার্মাণ স্পাই-এর কাজের

বিবরণ দেওয়ার প্রসঙ্গে বলছেন, এই দলের উপর ভার ছিল, স্থানীয় রেল-পথের বিবরণ সংগ্রহ করা। কোন কোন স্টেশনে স্টেশন-মাষ্টার থেকে কুলী পর্য্যন্ত সকলেই ছিল ছদ্মবেশী জার্মাণ। এইদল ধরা পড়বার পর, তাদের খাতা-পত্র থেকে পাওয়া যায়, কি সাঙ্কেতিক ভাষায় তারা খবরাখবর দিতো নিতো। তাদের পরিভাষায়,

Beam মানে ছিল Brigade

Teeder	Battery
Log	Gun
Planks	Company ইত্যাদি

এই সাঙ্কেতিক ভাষার আলোচনায়, স্যার পাওয়েল তাঁর বইতে কতক-গুলি সত্যি সঙ্কেতের উদাহরণ এবং ছবি দিয়েছেন, তা থেকে বুঝতে পারা যায়, স্পাইরা কি ভাবে, নিজের দেহকে ছদ্মরূপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাকেও ছদ্মরূপ দিতে হয়। কোন সংবাদ তারা সহজ অক্ষরে বা সহজ ভাষায় লেখে না। প্রত্যেক দলের একটা করে স্বতন্ত্র সঙ্কেত-পদ্ধতি থাকে। সেই পদ্ধতি জানা না থাকলে সংবাদের উদ্ধার সম্ভব হয় না। শুধু দুটো দাঁড়ির বিভিন্ন অব-স্থানের সাহায্যে নীচের এই সাঙ্কেতিক সংবাদটা লেখা হয়েছে···পাঠক একটু

NINE COME WHERE YOU EXPECTED THEM

চেষ্টা করলে অক্ষরগুলি ধরতে পারবেন। বুয়ার যুদ্ধের সময়, স্যার পাওয়েলের স্পাইরা বনের মধ্যে পরস্পরের নির্দ্দেশের জন্যে যে-সব সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেছিল, এখানে তার কয়েকটীর ছবি দেওয়া হলো ; এই নিরীহ ছবিগুলি প্রত্যেকটি এক একটী প্রয়োজনীয় সংবাদ বহন করছে। (১) মাটিতে বা গাছের গায়ে, এই ধরণের সংকেত থেকে স্পাইরা বুঝতে পারতো, তার দলের কোন লোক সেখান থেকে চার-পা দূরে তীর-চিহ্নিত দিকে মাটীতে কোন চিঠি পুঁতে রেখেছে। (২) দ্বিতীয় চিহ্নের অর্থ, এ-পথ নয়, ভুলপথে চলেছ, (৩) তৃতীয় চিহ্নের অর্থ, আমি তাঁবুতে ফিরে গিয়েছি। এই ধরণের সব সঙ্কেতের সাহায্যে তারা বনের মধ্যে বা পাহাড়ে-দেশে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতো।

(১) IV

(২)

(৩)

অনেক সময় স্পাইদের মাথা খাটিয়ে নানারকমের অদ্ভুত সঙ্কেত সব উদ্ভাবন করতে হয়। একবার, স্যার পাওয়েল একটা [illegible] তার

ওপর শত্রুর দুর্গের ভেতরকার সমস্ত ম্যাপ লিখে নিয়ে আসেন। নীচের চিত্রটী তারই নকল। অনেক সময় কোন সাঙ্কেতিক চিত্র এঁকে, তাকে আবার এমন কায়দা করে চিত্র-বিচিত্র করে ঢেকে দেওয়া

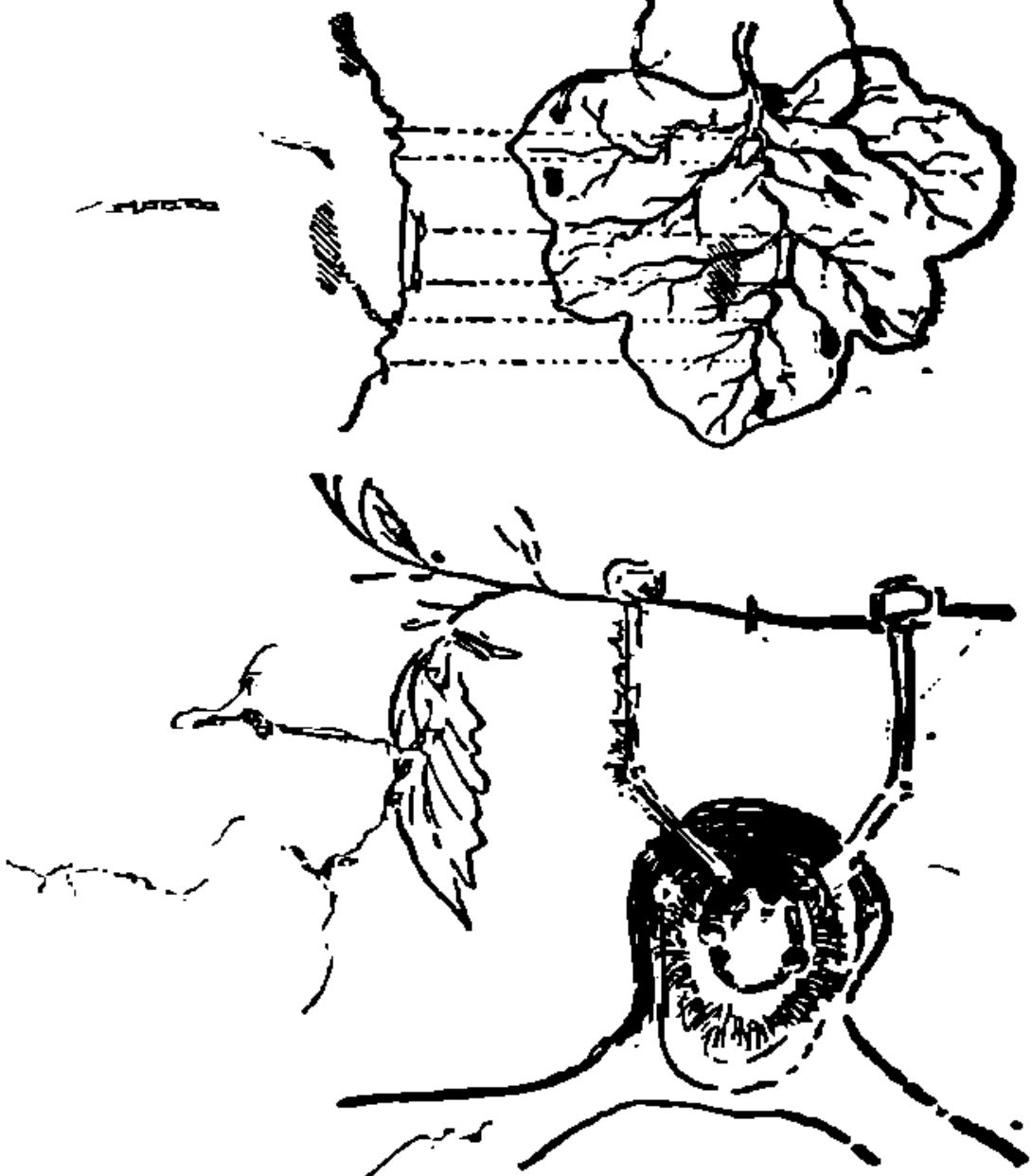

১৮৫ পৃষ্ঠা ও ১৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—ফড়িঙের মাথার নকল নক্সা লুকোনো হয়েছে।

[illegible] নকসাটী সহজে কেউ ধরতে না পারে। (ক) নং [illegible] দুর্গের ভেতরকার সব সৈন্য ও কামান সংস্থান A, B, C

[illegible] বাদটী

ইংরাজি অক্ষরের সঙ্কেতে টুকে নেওয়া হয়েছে, তারপর (খ) নং নকসায় সেই ব্যাপারটীকেই চিত্র-বিচিত্র করে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। (খ) নং নক্সায় এক একটা অক্ষরের বদলে এক একটা জিনিসের সঙ্কেত ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন (ক) নং নকসায় যেখানে D ছিল, (খ) নং নকসায় সেখানে ঘোড়ার ক্ষুরের নাল বসানো হয়েছে,—আসলে সেটা D-ও নয়, ক্ষুরের নাল-ও নয়, এ-সব জায়গায় মেসিন গান বসানো আছে, তার সঙ্কেত। স্যার পাওয়েল একবার একটা কড়িঙের মাথার ছবি এঁকে শত্রুর একটা দুর্গের বাইরের সমস্ত অবস্থান টুকে নিয়ে আসেন। আসল নক্সা এবং তাকে কি ভাবে লুকোনো হয়েছে, দুটোই পাশাপাশি এখানে দেওয়া হলো।

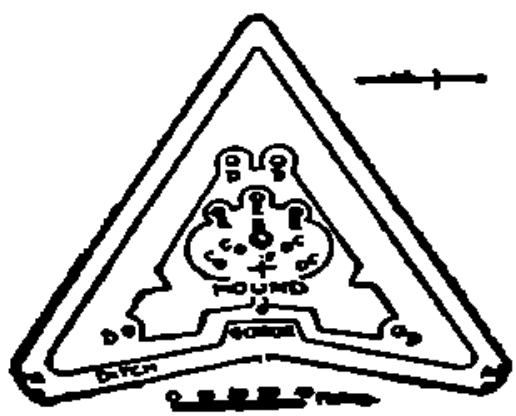

(ক)

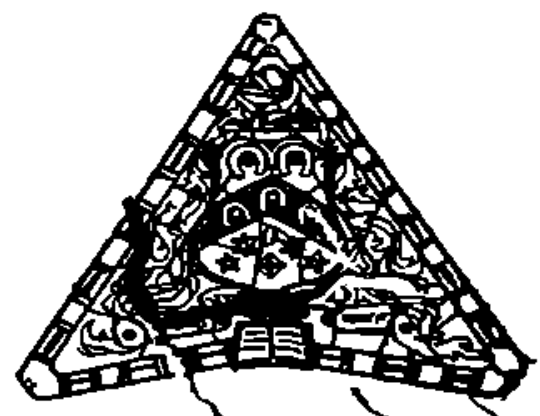

(খ)

এইভাবে স্যার পাওয়েলের বইটীতে সামরিক স্পাইদের রোমাঞ্চকর জীবনের অনেক খবর আমরা পাই, যা থেকে, বেশ বুঝতে পারা যায় যে, যুদ্ধের জয়-পরাজয় কতখানি এই অস্ত্রহীন সৈনিকদের উপর নির্ভর করে। একটা যুদ্ধ জয় করতে হলে, শুধু গোলা বারুদই লাগে তা নয়, কাগজ-কলম আর মানুষের মাথা গোলা-বারুদের মতই অপরিহার্য্য।

[কোন পাঠক যদি এইভাবে কোন interesting বই-এর বিষয় জানান, তা সাদরে গৃহীত হবে। —সম্পাদক]

নিতান্ত ছোট গল্প

[বনফুল নয়]

সুরেশ কোন রকমে টলতে টলতে বাড়ীর দরজার ওপরে এসে পড়লো। রাত কত গভীর, তার কোন আন্দাজ তার নেই।

একবার চেষ্টা করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে ডাকলো, মাধুরী!

তারপর হাতদিয়ে ঠেলতেই দরজা খুলে গেল, কোন রকমে পড়ে না গিয়ে সে রেলিঙ ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো।

আজ অফিসে বেরুবার সময় সে মাধুরীর গা ছুয়ে শপথ করে বেরিয়েছিল, আর নয়···কাজ সেরে সে সন্ধ্যের মধ্যে ফিরবেই··· মাধুরীকে আর সে কোন কষ্টই দেবে না···

কিন্তু কি-যে হয়ে গেল···এক পাত্র থেকে দু'পাত্র···তা থেকে আবার এই রাত্রি দশীথ···ছেঁড়া জামা, শূন্য পকেট, এক-পায়ে শুধু একটা জুতো···

টলতে টলতে ঘরে ঢুকে দেখে, মেজেতে প্রদীপ জ্বলছে···প্রদীপের সামনে তার জন্যে আসন পাতা···আসনের সামনে তার রাত্রির খাবার ঢাকা দেওয়া··

মাধুরী অভিমান করে আজ আর জেগে বসে নেই···সে শুয়ে পড়েছে···তার দোষ কি?

সুরেশ জানে, শুয়ে থাকলেও, সে ঘুমোয়নি। সুরেশ বাড়ী না এলে মাধুরী যে ঘুমোতে পারে না।

আজ রাত্রান্তে মাধুরীর মাথার শিয়রে গিয়ে সুরেশ বলে, মাধুরী, ক্ষমা···র বাদটা···প্রজকের মত ক্ষমা কর···

মাধুরী কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না···বঞ্চিত জীবনের বহু দীর্ঘ রাত্রি ধরে সে শুনে এসেছে, এই একই কথা··· প্রাণ-হীন প্রণয়ের নিশীথ-প্রলাপ।

সুরেশের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে, বলে, তুমি চুপ করে থেকোনা··· তুমি যা খুশী তাই আমাকে বল···

তবু মাধুরী কথা বলেনা।

সুরেশ মাধুরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, বলে, ঠাকুর সাক্ষী, মাধুরী···আজ এই শেষ রাত্রি···শেষবারের মত আমাকে ক্ষমা কর!

প্রদীপে তেল ছিল না বেশী। নিভে গেল।

দুঘণ্টা হলো মাধুরীর জীবন-প্রদীপও নিভে গিয়েছিল।

গঙ্গার ঘাটে সেদিন কি যোগ ছিল।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্নান করছেন। সেই সময় এক প্রৌঢ়া তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে স্নানে নেমেছেন।

শিশু জলে নেমে কাঁদতে আরম্ভ করলো।

প্রৌঢ়া কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত হয়ে শিশুর পীঠে জোরে একটা চড় মারলেন। শিশু তারস্বরে কেঁদে উঠলো।

সেই সঙ্গে ঠাকুরও চমকে চীৎকার করে উঠলেন। যেন কে তাঁর অঙ্গেও প্রহার করলো।

স্নান সেরে যখন উঠলেন, শিষ্যেরা দেখে, ঠাকুরের পিঠে পাঁচটা আঙুলের চড়ের দাগ···

গল্প-প্রতিযোগিতা

অত্যন্ত দুঃখের সহিত গল্প-ভারতীর পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে, আমরা যে গল্প-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান ঘোষণা করিয়াছিলাম তাহা বাধ্য হইয়া প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইতেছে। প্রতিযোগিতার দরুণ যে-সব গল্প আসে, বিচারকগণের মতে, তাহার অধিকাংশই এমন স্তরের নহে যাহাকে বাংলা ভাষার কোন শ্রেষ্ঠ গল্পের সঙ্গে তুলনায় উল্লেখ করিতে পারা যায়। সেইজন্য বিচারকগণের পরামর্শ অনুসারেই এই প্রতিযোগিতা প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইল।

এই সম্পর্কে যাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদের সহযোগিতা করিয়াছেন এবং যাঁহারা এই প্রতিযোগিতাকে সফল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই প্রসঙ্গে, বাংলা দেশের তরুণ লেখকদিগকে গল্প-ভারতী বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানাইতেছে, গল্প-ভারতী সগর্ব্বে এবং সানন্দে তাঁহাদের সহযোগিতা কামনা করে। ইতি।

বিনীত

সম্পাদক—গল্প-ভারতী